নারায়ণ দেবনাথ

কমিকসসমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ
কমিক্‌সসমগ্র

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

দেবাশীষ দেব

শান্তনু ঘোষ

লালমাটি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীমতী নমিতা মজুমদার (দেবনাথ)
শ্রীতাপস দেবনাথ শ্রীমতী কাকলী বাগচী শ্রীবিশ্বপ্রিয় প্রধান
শ্রীবিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীসৌম্যেন পাল শ্রীদেবাশিস সেন শ্রীপ্রদীপকান্তি পাল
শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ঘোষ শ্রীসায়ন ব্যানার্জি শ্রীসৌরভ ব্যানার্জি অধ্যাপক শ্রীঅরিজিৎ ঘোষ
এবং
দেবসাহিত্য কুটির, পত্রভারতী
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি ও দমদম লাইব্রেরি (গোরাবাজার)

ভূমিকা

আজ থেকে পঞ্চাশ বা তদূর্দ্ধ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমার আঁকা নানা গল্পের ছবি এবং ছবিতে গল্প বেরিয়েছে। তবে অনেকগুলিই বর্তমান প্রজন্ম দেখতে পায় না।

তাই আমার অনেক দিনের ইচ্ছা বহু পরিশ্রমে সেই সকল চিত্রময় গল্প নিয়ে একটি পরিপূর্ণ ভালো বই হয় তো বেশ হয়।

শ্রীমান শান্তনু ঘোষের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি সংগ্রহ করে 'কমিকসসমগ্র' বইটি লালমাটি প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য আমি লালমাটির তরুণ প্রকাশক শ্রীমান নিমাই গরাইকে ও শান্তনুকে আমার অন্তরের স্নেহ ভালোবাসা জানাচ্ছি।

আরও একটা কথা, আমার আঁকা নানা ধরনের ছবি যাঁরা পঞ্চাশ বছর বা আরও আগে দেখেছেন তাঁরা আবার নতুন করে সেগুলি দেখতে পাবেন বলে আমার খুবই ভালো লাগছে।

শুভেচ্ছা-সহ
নারায়ণ দেবনাথ

হাওড়া
৭.৮.২০১০

NARAYAN
DEBNATH

অতীত ও বর্তমানে সই

মুখবন্ধ

'নারায়ণ দেবনাথ'— এই নামটার সঙ্গে যেন গোটা ছোটোবেলাটাই জড়িয়ে আছে আমাদের। মনে পড়ে ১৯৫০ বা ৬০-এর দশকে দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত ছোটোদের সমস্ত বই কিংবা 'শুকতারা'র মতো মাসিক পত্রিকার একটা বড়ো আকর্ষণ ছিল অসাধারণ সব ইলাস্ট্রেশন— লেখার পাশাপাশি যেগুলো না-দেখতে পেলে আমাদের ঠিক মন ভরত না। আর কত-না বাঘা বাঘা আর্টিস্ট ছিলেন তখন— প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইবন্ধু রায়, শৈল চক্রবর্তী এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই নারায়ণ দেবনাথ। এই নারায়ণবাবুর আঁকায় যেটা প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম সেটা হল দারুণ ভার্সেটাইলিটি। একইসঙ্গে সিরিয়াস এবং নির্ভেজাল সমস্ত হাসির গল্পের ইলাস্ট্রেশন করে যেতে পারতেন সমান তালে। আর তেমনি ছিল তাঁর ড্রয়িং-এর জোর— মানুষ থেকে নিয়ে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের অ্যানাটমি প্রায় গুলে খেয়েছিলেন, যার ফলে লেখায় বর্ণিত যেকোনো চরিত্র, যেকোনো সিচুয়েশনকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারতেন অনায়াসেই। নিজের মুখেই স্বীকার করেন, একেবারে হাতে-কলমে না হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে থেকে ইলাস্ট্রেশনের ভাবনা আর প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন। গোড়ার দিকে নারায়ণবাবুর কাজের মধ্যে এই প্রতুলবাবুর কিছুটা প্রভাব থাকলেও সেটা কাটিয়ে উঠতেও তাঁর বেশি সময় লাগেনি। প্রতুলবাবুর বাড়িতেই বিদেশি কিছু শিল্পীর ইলাস্ট্রেশন দেখে ধীরে ধীরে আঁকার একটা নিজস্ব ধারা তিনি গড়ে নিয়েছিলেন।

ছোটোদের জন্য সব দিক থেকে একেবারে আদর্শ ইলাস্ট্রেটর বলা যায় নারায়ণবাবুকে। দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের লেখার সঙ্গে অজস্র ছবি এঁকেছেন অক্লান্তভাবে। খুব যত্ন নিয়ে ধীরে ধীরে ফিনিশ করা কাজ ছিল তাঁর, সঠিক ডিটেলসগুলো বোঝানোর জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। মানুষের জামা-কাপড়-অলংকার কিংবা পশু-পাখির ড্রয়িংকে যতটা সম্ভব নিখুঁত করে তোলার জন্য প্রচুর বিদেশি বইপত্র ঘাঁটতেন বলে শুনেছি। একবার কোনো একটা গল্পে আফ্রিকার বিশেষ একটা প্রজাতির হরিণ 'কুডু'-র উল্লেখ ছিল যার সঠিক reference খুঁজে বের করতে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে শুরু করে একেবারে ন্যাশনাল লাইব্রেরি পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছিলেন। আমার মতে নারায়ণবাবুর সেরা ইলাস্ট্রেশনগুলো দেখা যায় প্রধানত রোমাঞ্চকর সমস্ত শিকার কাহিনির সঙ্গে (যেমন 'বনে জঙ্গলে', 'পৃথিবীর রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনি')। বাঘ-হাতির লড়াই, ছুটন্ত জেব্রার ওপর সিংহের আক্রমণ, কুমিরের পিঠে মাসাই যোদ্ধা, প্যান্থার আর অজগরের কুস্তি, জলের মধ্যে বিরাট হাঁ করে-থাকা জলহস্তী, এই ধরনের ঝুড়ি ঝুড়ি দৃশ্য তাঁর তুলিতে যতখানি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে সেটা ভারতবর্ষের আর কোনো ইলাস্ট্রেটরের কাজে সেভাবে চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। প্রতিটি ছবিতে আলো-ছায়ার স্পষ্ট একটা ডিস্ট্রিবিউশন করে নিয়ে দারুণ একটা নাটকীয়তা আনতেন নারায়ণবাবু। জায়গায় জায়গায় জমাট কালো রং ভরে দেওয়ার জন্য যে ধরনের জোরালো dimension তৈরি হত সেটা নারায়ণবাবুর ইলাস্ট্রেশনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তবে সময়ের সঙ্গেসঙ্গে নারায়ণবাবুর আঁকায়-ভরা বহু ম্যাগাজিন বা বই আজকের দিনে এতটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা সেগুলির স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ভাবতে সত্যিই বেশ অবাক লাগে, শিল্পী হিসেবে এতখানি দক্ষতা অর্জন করার পরেও নারায়ণবাবুকে কিন্তু সমানে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ছোটোদের ইলাস্ট্রেটরদের সঙ্গে। সিরিয়াস ছবির ক্ষেত্রে যদিও পরের দিকে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জায়গাটা অনেকখানি দখল করে নিয়েছিলেন তিনি, কমিক ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজটা মোটেই সহজ হয়নি— আগে কাজ শুরু করে ছিলেন শৈল চক্রবর্তী আর রেবতীভূষণ ঘোষ— পাশাপাশি উঠে আসছিলেন বিমল দাস, হাফ টোন কাজে বিশেষভাবে দক্ষ, ১৯৭০ বা আশির দশকে যিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় ছোটোদের ইলাস্ট্রেশনে প্রায় ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন বলা যায়। শেষ অবধি নারায়ণবাবু এঁদের সবাইকে কতটা ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন সেটা অবশ্য অন্য কথা, তবে ইলাস্ট্রেশন ছাড়াও ছোটোদের জন্য তিনি আরও একটা দারুণ জিনিস নিয়ে মেতে উঠেছিলেন— 'কমিক স্ট্রিপ'। শিল্পী হিসেবে যা নারায়ণবাবুকে এনে দিয়েছিল প্রায় তুলনাহীন জনপ্রিয়তা। ১৯৬০-দশকের গোড়ার দিকে শুকতারার সম্পাদক তাঁকে পত্রিকাটির জন্য নিয়মিতভাবে একটা কমিক স্ট্রিপ করার প্রস্তাব দেন। এ ব্যাপারে নারায়ণবাবুর যে বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছিল এমন নয়, নিজেই স্বীকার করেন তখনও কমিক্স বলতে দেখেছিলেন কেবল টার্জান আর টম অ্যান্ড জেরি অ্যানিমেশন। তা সত্ত্বেও কিন্তু পিছিয়ে আসেননি। তিনি সম্পাদকের কথামতো কিশোর বয়সি দু-জন ছেলে হাঁদা আর ভোঁদাকে নিয়ে শুরু করে দিলেন প্রতি সংখ্যায় নতুন, আর মজাদার কাণ্ডকারখানায় ভরা কমিক স্ট্রিপ। অনেকেই হয়তো এই রাম বিচ্ছু ছেলে দুটির মধ্যে জার্মান কমিকস ম্যাক্স অ্যান্ড মরিটজ্, কিংবা লরেল-হার্ডির ছায়া দেখতে পান— তবে নারায়ণবাবু নিজে কিন্তু বিদেশি কমিক্স নিয়ে সেভাবে কোনোদিন মাথা ঘামাননি। শিবপুর অঞ্চলে যেখানে তাঁর বাড়ি— ছোটোবেলা থেকেই তাঁর রোয়াকে বসে পাড়ার ছেলে ছোকরাদের কতরকম ঠাট্টাতামাশা করতে দেখেছেন— সেগুলো দিয়েই একে একে তৈরি হতে লাগল হাঁদা ভোঁদার সব গল্প আর সিরিজটাও বেশ জমে উঠল। এর কয়েক বছরের মধ্যেই কমিক্স-এর দুনিয়ায় আবির্ভাব ঘটে গেল বাঁটুল দি গ্রেট-এর। ব্যায়ামবীর মার্কা চেহারা নিয়ে পাড়ার পাড়ায় দুষ্টের দমন করে বেড়ানো এই সুপার হিরো যে প্রথম থেকেই খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে কতখানি সাড়া ফেলে দিয়েছিল সেটা বোধ হয় লিখে বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে হাঁদা ভোঁদা আর বাঁটুলকে নিয়ে একনাগাড়ে কমিক স্ট্রিপ এঁকে চলেছেন নারায়ণবাবু— সারা পৃথিবীর কমিক্‌সের ইতিহাসে যা সত্যিই এক বিরল ঘটনা।

বাঙালিমাত্রই এই চরিত্রগুলিকে বহুদিন থেকে তাঁদের নিজস্ব 'আইকন' বানিয়ে ফেলেছে। অন্য যেকোনো দেশ হলে হয়তো নারায়ণবাবুকে নিয়ে দারুণ হইচই বাধিয়ে দেওয়া হত— আমাদের এখানে তো সে বালাই নেই ফলে প্রচারবিমুখ এই মানুষটিকে আমরা আজ অবধি তাঁর যোগ্য মর্যাদাটুকু দিয়ে উঠতে পারিনি। অন্যদিকে একজন কমিক্‌স শিল্পী হিসেবে এই বিরাট সাফল্য তাঁকে আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছে কি না সেটাও বলা শক্ত। তবে এসব নিয়ে অকারণ মাথা ঘামাবার মতো মানুষ নন নারায়ণবাবু— জাত-শিল্পী তিনি— শুধুমাত্র নিজের কাজটিকে ঠিক মতো করে যাওয়ার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পান। তাঁর কমিক্‌স–এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা ভেবে একের-পর-এক ক্যারেকটার বানিয়ে চালু করে গিয়েছেন নতুন নতুন সিরিজ। ১৯৬০-এর দশকেই আমরা পেয়েছিলাম শুঁটকি আর মুটকি, পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান, আর নন্টে-ফন্টেদের। পরে এদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় আরও অনেকে যেমন গোয়েন্দা কৌশিক রায়, বাহাদুর বেড়াল কিংবা ডানপিটে খাঁদু এবং তার কেমিক্যাল দাদু। সবাইকে নিয়ে যেন নারায়ণবাবু গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কমিক্‌সের এক যৌথ পরিবার। বিভিন্ন কারণে এঁদের অনেককে পরে বাদ দিয়ে দেওয়া হলেও পরিবারের বাকি সদস্যদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটা কিন্তু বছরের-পর-বছর ধরে পালন করে আসছেন তিনি। কমিক্‌স-এর এই নিদারুণ ব্যস্ততা একটা সময়ে নারায়ণবাবুকে বাধ্য করেছে ইলাস্ট্রেশনের কাজ থেকে পুরোপুরি সরে আসতে। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৬০-দশকে শুকতারার পাতায় 'অমর বীর কাহিনী' নামের ইতিহাসনির্ভর একটা সিরিজের জন্য তিনি এঁকেছিলেন তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো—এরপর ১৯৭০-এর দশক থেকে বলতে গেলে ডুবে গেলেন শুধুই কমিক্‌সে। কিন্তু এই যে বললাম— সেরকম কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছিটেফোঁটাও ছিল না নারায়ণবাবুর মধ্যে। তাই বৃহৎ বাণিজ্যিক কাগজের আকর্ষণীয় হাতছানি পেয়েও, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক তৈরি হওয়া দেব সাহিত্য কুটির বা পত্রভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানকে ছেড়ে আসতে মন চায়নি তাঁর। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে সেই সময়ে কিন্তু যথেষ্ট প্রশ্ন উঠেছিল— তবু নারায়ণবাবু কিন্তু বরাবর অবিচল থেকেছেন তাঁর ভালোবাসার জায়গাটিতে। অথচ তাঁর কমিক্‌স শিল্পের দুই 'FLAGSHIP' বাঁটুল আর হাঁদা ভোঁদা ছাপা হচ্ছে যে পত্রিকায়, সেই শুকতারা যে ক্রমশ তার কৌলীন্য হারিয়ে ফেলছে, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যথাসম্ভব আধুনিক হয়ে উঠতে না-পারায় তার বিক্রি কমে যাচ্ছে— এটা কি তিনি একেবারেই খেয়াল করেননি? ফলে যথারীতি কমিক্‌সের বাজার কিন্তু দিনে দিনে ছোটো হয়ে এসেছে— নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাঁটুল বা হাঁদা ভোঁদার নাম শুনে থাকলেও এদের টাটকা গল্পগুলো নিয়মিতভাবে পড়ে উঠতে পারেনি; শুধুমাত্র কমিক্‌স-এর টানে অনেকে শুকতারা কিনছে এটা বহুবার চোখে পড়েছে বটে তবে সংখ্যায় তারা আর কজনই-বা!

সমস্যা হয়েছে অন্য জায়গাতেও— নারায়ণবাবুর যাবতীয় কমিক্‌সগুলোকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখার কোনো সুপরিকল্পিত প্রয়াস আজ পর্যন্ত কোথাও হয়নি— সন্দেহ নেই যে কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু একইসঙ্গে জরুরিও বটে এবং এটা না হলে আমরা হয়তো অচিরেই হারিয়ে ফেলব নারায়ণবাবুর এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে— বাংলা ভাষায় অবশ্যই যার কোনো দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

আমাদের খুবই সৌভাগ্য যে এই কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে করার কথা বেশ কিছু দিন ধরে ভেবে আসছেন লালমাটি প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার নিমাই গরাই মহাশয়— সেইসঙ্গে নিরলসভাবে সংগ্রহ করে চলেছেন কমিক্‌স-সমেত নারায়ণবাবুর সব ধরনের আঁকা— তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন শান্তনু ঘোষ। যাঁকে এক কথায় নারায়ণ দেবনাথ-বিশেষজ্ঞ বলা চলে। অশীতিপর এই মহান শিল্পীর আঁকা নিয়ে যে বৃহৎ আকারে বইটি এখন পাঠকের কাছে পৌঁছোনোর অপেক্ষায়, সেটা এঁদের দু-জনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এই বইকে সে অর্থে Complete Work বলা না-গেলেও নারায়ণবাবুর করা কমিক্‌স-এর ক্ষেত্রটি কিন্তু এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে। বিশেষ করে আজ থেকে প্রায় পঁতাল্লিশ বছর আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি হওয়া বাঁটুল দি গ্রেটের গল্পের মতো এমন বেশ কিছু লুপ্তপ্রায় কমিকস পড়ার দুর্লভ সুযোগ পাঠক অবশ্যই পেয়ে যাবেন। সংগ্রহটি মূল্যবান আরও একটি কারণে— এখানে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে ছাপা-হওয়া প্রতিটি কাজের প্রকাশকাল-সহ নানা আনুষঙ্গিক তথ্যকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নথিভুক্ত করার, ইতিহাসের খাতিরে যার আবশ্যিকতা অনিবার্য। বর্তমান প্রজন্মের কাছে নারায়ণ দেবনাথের আঁকা ছবির নতুনভাবে মূল্যায়ন শুরু হলে এই বই প্রকাশ করা পুরোপুরি সার্থক হবে।

নভেম্বর ২০১০ দেবাশীষ দেব

সূচিপত্র

২০১০ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কার প্রদান করছেন
রাজ্যপাল শ্রীএম. কে. নারায়ণন

নারায়ণ দেবনাথের পরিবারের সঙ্গে প্রকাশক ও সম্পাদক

আলোকচিত্র - শান্তনু ঘোষ

শিশু সাহিত্যিক

শ্রী নারায়ণ দেবনাথ

জন্ম-১৯২৫

আলোকচিত্র- শান্তনু ঘোষ

কালুয়া
ভজা
বাঁটুল ১৯৬৫
গজা
ভেদো
লম্বকর্ণ ১৯৭৫
উটো
ভজা-গজা ১৯৬৫
বাঁটুল ১৯৭৫
পিসিমা
বাঁটুল ১৯৬৭
লম্বকর্ণ ১৯৬৫
বাঁটুল ১৯৮০
বাঁটুল ১৯৮৭
বাঁটুল ২০০৫
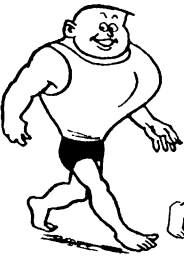
বাঁটুল দি গ্রেট

১৯৬৫ সালে (১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ) দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় গোলাপি রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি; সঙ্গে কালো রঙের টাইট হাফপ্যান্টে সর্বদা খালি পায়ে আত্মপ্রকাশ করে— বাঁটুল দি গ্রেট। যার বুকের ছাতি ৪০ ইঞ্চি আর পা দুটো লিকলিকে সরু। নারায়ণবাবুর ভাষায় তাঁর 'ফেভারিট সন্তান'। দুর্ধর্ষ শক্তিমান বাঁটুলের সঙ্গে থাকে তার দুই বিচ্ছু ভাগনে ভজা ও গজা। পরবর্তীকালে তাঁরা বাঁটুলকে 'দাদা' হিসাবে সম্বোধন করা শুরু করে। অন্যান্য সঙ্গী হিসাবে দেখা গেছে উচ্চ শ্রবণ-ক্ষমতা সম্পন্ন কিশোর 'লম্বকর্ণ', পোষা উট পাখি 'উটো', পোষা কুকুর 'ভেদো' আর বুড়ি পিসিমাকে। এই দু-রঙা (বাইকালার) কমিক্সটি শুকতারার দ্বিতীয় পাতায় ঠাঁই পেলেও প্রথম প্রথম বাঁটুলকে নিয়ে তেমন সাড়া জাগেনি।

তারপর ষাটের দশকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বাঁটুলকে কমিক্সে যুদ্ধের কাজে লাগানো হল দেবসাহিত্য কুটীরের অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদবাবুর উৎসাহে। ছবিতে গল্পে দেশপ্রেমিক বলশালী বাঁটুল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশের) শত্রুসেনার প্লেন, প্যাটন ট্যাঙ্ক সব ধ্বংস করতে লাগল। এই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উপর বাঁটুলের জনপ্রিয় গল্পগুলি প্রকাশিত হয় ১৩৭২ সালের কার্তিক, পৌষ, মাঘ এবং ১৩৭৩ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়। সারল্য ও বীরত্বের সংমিশ্রণে বাঁটুলের এই গল্পগুলি তৎকালীন পাঠক সমাজে খুব সাড়া জাগায় এবং বাঁটুলের জনপ্রিয়তার সেই শুরু যা আজও অম্লান। বাঁটুলের প্রথম দিককার এই দুর্লভ গল্পগুলি বই আকারে অগ্রন্থিত। প্রায় ৪৫ বছর ধরে চলতে থাকা বাঁটুলের চেহারাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পরিবর্তন। বর্তমানে বাঁটুলের কোমর আর পা আরও সরু হয়েছে; বেড়েছে বুকের ছাতি।

নারায়ণবাবু চিরকাল দু-রঙে বাঁটুলের গল্প করে এসেছেন। যদিও এখন বাঁটুলের কমিক্স কমপিউটার দিয়ে, চাররঙে সম্পূর্ণ রঙিন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বয়ং নারায়ণবাবু একবারমাত্র সম্পূর্ণ রঙিন (চার রং দিয়ে) বাঁটুল কমিক্স আঁকেন দেবসাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী 'পূরবী'তে (১৩৭৯)। এটিও বই আকারে গ্রন্থিত হয়নি।

বাঁটুল দি গ্রেট
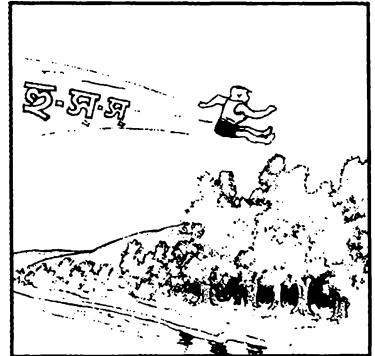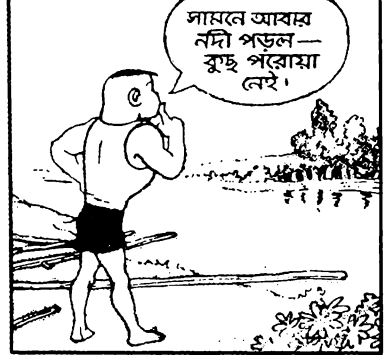
১৩৭২ কার্তিক ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের ভারত-পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি এই বিরল গল্পটি পাঠকসমাজে প্রথমবার বাঁটুলের বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় যুদ্ধের উপর গল্প তৈরি হয়। এই দুর্লভ গল্পগুলি কমিক্‌সের বই আকারে গ্রন্থিত হয়নি।

১৩৭২ কার্তিক ১৯৬৫

বাঁটুল দি গ্রেট

১৩৭২ পৌষ ১৯৬৬

এবার তুইও
কাবার !
অ্যাঃ!

সাঁই-ই-ই !
চাঁদ, আর
হানাদারি করতে
আসবে?

ওঃ! দুষমণটা
সর্দারকে আশমানে
পাঠালো— কোতল
কর ওটাকে !
ভুই-ই-ই !

হুম্‌!
করাচ্ছি
কোতল !

আহ্‌

জওয়ানদের
কাছে এই আমার
উপহার !

১৩৭২ পৌষ ১৯৬৬

বাঁটুল দি গ্রেট

চু লম্বকর্ণ! ছিপ দিয়ে খাল থেকে মাছ ধরে আনি।
চল বাঁটুলদা

কিন্তু খালের ওপারেই যে অন্য এলাকা!
তাতে ভয় কি?
ঘোৎ!

ওরে বাবারে ব্যাটা ষাড় এদিকেই তেড়ে আসছে যে!

দমাস্!

ওঃ! ষাড়টা, আমি ভেবেছিলুম তুই পিঠে হাত বুলুচ্ছিস!

নাঃ একটাও মাছ উঠছে না। তার চেয়ে চানটা সেরে ফেলি।
বলকি বাঁটুলদা ওপারেই যে

থাকনা, দেখ কেমন একখানা ডাইভ দিচ্ছি!

ঝপাং!

ওদিকে অন্য পাড়ে
ভাইসব! আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে ওপার দখল করে নেবো। কামান রেডি-

আরে বাপ!
গাল্‌গ

ওই যে সেই দুষমণ! ও জলে ঝাপিয়ে পড়াতেই জল উঠে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম। কামান দেগে ওটাকে উড়িয়ে দাও!

দুড়ুম!

ফুর-র-র!

১৩৭২ মাঘ ১৯৬৬

বাঁটুল দি গ্রেট

সামনের শত্রু ঘাঁটিটা দখল করতে পারলে আমাদের পক্ষে খুব সুবিধে হয় — কি করা যায় বলত বাঁটুল?
কিচ্ছু ভাববেন না স্যার! সব ঠিক করে দিচ্ছি!

সাঁজোয়া গাড়িটা নিয়ে যাই। সাঁজোয়ায় দিয়েই ওদের সাজা দেবো।

শত্রু ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছি। দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে!

ওরে, এ দুষমণ এখানে সেঁধুলো কি করে?

পাকড়ো - পাকড়ো, দুষমণটাকে পাকড়ো!

গেট বন্ধ? কুছপরোয়া নেই!

গেটের দরজা দিয়েই----

১৩৭৩ ভাদ্র ১৯৬৬

বাঁটুল দি গ্রেট

হানাদারদের একটা ট্যাঙ্ক দখল করেছি। এটাকে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাই— আরে, আবার বোধ হয় লরি ভর্তি হানাদার নিয়ে এসেছে!

কি ব্যাপার? লরিটাকে দিয়ে ওরা আমার রাস্তা আটকাতে চায় নাকি? হাঃ-হাঃ! বাঁটুলকে তাহলে ওরা চেনেনা।

ওরে তাড়াতাড়ি পাইলে আয়!

আরে, ওরা গাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। কি ব্যাপার দেখতে হচ্ছেতো!

কি সর্বনাশ! এযে পেট্রোল ট্যাঙ্কার—সঙ্গে টাইম বোমা! ফাটলেই চারদিকে আগুন লেগে যাবে—ওঃ, কি শয়তানি মতলব!

দেখাচ্ছি মজা! ওদের জিনিস দিয়ে ওদেরই ধ্বংস করব!

বাছাধনদের এবার আমার ভেলকির খেলা দেখাবো।

১৩৭৩ আশ্বিন ১৯৬৬

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটুল! দমকল এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে! তোমাকেই সেখানে খবর পৌঁছতে হবে।
কোন চিন্তা নেই!

স্পীডটা কিঞ্চিৎ বাড়াতে হল!

খেয়া নৌকো নেই! এখন নদী পেরোই কি করে?

পোল জাম্প করে পেরোতে হবে!
দমাস!

হু-উ-স!

নামলুম একেবারে বাঘের মুখে! ইস, খানিকটা সময় বাজে খরচ হবে।
পাস!
গরর

হালুম!

একটু মৃদু পদাঘাত করতেই হল!
ঘ্যাঁক!
গদাম!

১৩৭৩ শ্রাবণ ১৯৬৬

বাঁটুল দি গ্রেট

বাগান পাহারা দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা! এ্যাই! ওখানে তুই কি করছিস? খবদ্দার নিচে নামবি না!
না, না, শুধু আমার বলটা চাইছি!

ঐখানে থাক। আমি তোর বল তুলে দিচ্ছি।
বাঃ! আমাদের ঠিক প্ল্যান মাফিক কাজ হচ্ছে। আমি এই পাশ দিয়ে নেমে পড়ি, বাঁটুল দেখতে পাবেনা।
আরে! এপাশে আর একটা। ভেবেছে আমি ওকে দেখতে পাইনি।

ঠিক এই বরাবর তাক্ করে বলটা ছুড়ে দি!

এইরে! বাঁটলো দেখে ফেলেছে।
কেমন মজা! এবার কেটে পড়!

এবারে অন্য কোন প্ল্যান চিন্তা করতে হবে।
এইবার দ্যাখ, কি করি!

এসো বাঁটুলদা! তুমি তক্তার ও মাথায় উঠে নিচে নামাও দেখি?
নিশ্চয়! এতো তুচ্ছ কথা!

আমি যখন ও মাথায় যাব— দ্যাখ তখন কি অবস্থা হয়!

একি! মামলনা! পুঁচকে ছোঁড়াগুলো আমার চেয়েও ভারী হল!
বাঁটুলদা! তুমি নিশ্চয় দুর্বল হয়ে গেছ! নাহলে ও মাথা তুমি নামাতে পারলেনা!

কি, ঠাট্টা! আমি দুর্বল! দেখাচ্ছি! আমি এই পাঁচিল থেকে তক্তার ওপর লাফাব!

দেখলি কি কায়দা!
এঃ! খুব বোকা বানিয়েছে! গোটা দলকে বাগানে পাচার করে দিলুম!

ইস্! বড্ড বোকা বনেছি! আর বাগান পাহারা দিয়ে কি হবে। তার চেয়ে আমগুলিকেও যথাস্থানে পাচার করি।

বাঁটুল দি গ্রেট

১৩৭৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৬৭

এটা আবার ভয়ে যুদ্ধ করতে চায় না! ব্যাটার মুখে এক চড় লাগাই!

সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিন
এই আর একজন!

পরদিন সকালে
যোগ দিন
কোন প্রমাণ নেই — কিন্তু এ নিশ্চয়ই তোর কীর্তি বাঁটুল!
আমি! কি বলছেন সার! আমি কাল সারারাত ঘুমিয়েছি! মোটেই বেরুইনি!

সেদিন রাত্রে
যা ভেবেছি তাই! আজও বেরুচ্ছে! একটা ধাপ্পা দিয়ে মজা করি! বাঁটুল! এখানে পাহারা বসেছে— ওপরের জানলা নামো!

এইবারে মজা হবে!

ধড়াম!
ওরে বাবা! ভূমিকম্প নাকি?

ঘুমিয়ে হাঁটা! বাঃ! যা ঘটেছে সে সব তবে আমিই ঘুমের ঘোরে করেছি!

ওঃ! শুয়ে আর কখনো বই পড়ছি না!
না

বাঁটুল দি গ্রেট

বোধ হয় আর
এবার একটু নিশ্চিন্তে
করে বসা যাবে—
লম্বকর্ণ ?
না বাঁটুলদা!

ছাতে একটা চড়াই পাখি বসার শব্দ পেলাম, কিন্তু পাখিটা বসেই আবার যেন ভয় পেয়ে পালাতে চাইছে!
আরে! ছাতে এবার যে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বাঁটুলদা!
গিয়ে দেখতে হচ্ছে।

দাঁড়াও! কেউ চিমনির কাছে আছে। সে চেষ্টা করছে যাতে শব্দ না হয় কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি। এবারে দেশলাই জ্বালানোর শব্দ হলো, আর একটা হিস হিস শব্দ, বোধ হয় বোমা বা ঐরকম কিছু ধরানো হয়েছে। ওটা ভেতরে ফেলার সময়ে তোমাকে জানাবো।

এইবার ফুঁ ঝাড়ো!

গেছিরে!

দুড়ুম!

তুই বোমাটা ভেতরে ফেলার ঠিক আগেই বাঁটলো ফুঁ ঝেড়ে আমাদের শূন্যে উড়িয়ে দিলো। কি করে বলতো?

সেদিন রাত্রে
তুই আমার ঘরে শুয়ে থাক লম্বু! রাতে যদি ওরা কোন ঝামেলা করে, তুই আমাকে সাবধান করবি!

বাঁটুলদার নাসিকা গর্জনের চোটে ঘুমের দফা গয়া! কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে!
ফোৎ-ফররর!
ফোৎ-ফররর!

১৩৭৭ আশ্বিন ১৯৭০

বাঁটুল দি গ্রেট

দেখি এই কাজটা যদি করতে পারা যায়!
পশুপালনে অভিজ্ঞ কর্মী চাই।

কাজটা আমি ভালোভাবেই করতে পারবো!
বাপ্‌রে গেছি!
হুম! এই ব্যাটাই ঘুস নেওয়ার জন্যে আমাকে একবার জেল খাটিয়েছিল আজ দেখাচ্ছি মজা!

ঠিক আছে, তবে দক্ষতা হিসেবে তোমাকে এই ছাগলটার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে। ভারী ভালো মেজাজের এটা! 'মুনিয়া' বলে ডাকলেই কাছে আসে।
বাঃ, এ তো খুব ভালো ছাগল! আয় রে মুনিয়া আয়!

হাঃ হাঃ! মুনিয়া বলে ডাকাতে এর আগে পাঁচজনকে গুঁতিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে!
আবার মুনিয়া! দাঁড়াও, দিচ্ছি তুলো ধুনিয়া!

মনে হচ্ছে ও আমার সঙ্গে মিতালি করতে রাজী নয়!
দড়াম!

এটা খুব একটা ভুল হয়ে গেছে বাঁটুল! তুমি বরঞ্চ ওই গরুটা দুয়ে নিয়ে এসো!
ঠিক আছে, এখনি দুয়ে নিয়ে আসছি!

হোঃ হোঃ! ওটা মোটেই গরু নয়, একটা ষাঁড়! ছাগলটা যা পারে নি এটা তা পারবে!

১৩৭৯ চৈত্র ১৯৭৩

তাহলে এখুনি যা। আমি লাইব্রেরীতে একটা বই আনতে যাচ্ছি, ফিরে তোর সঙ্গে দেখা হবে!

পরে
একটা কিনে ফেলেছিস দেখছি!
এবার আর হাঁটার পাল্লাতে আমাকে ধুঁকতে হবে না! আমার বদলে আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা ধুঁকবে!

গাড়ি তো কিনলি লম্বু! কিন্তু রাখবি কোথায়? আমাদের তো কোন গ্যারেজ নেই। খালি একটা মুরগীর ঘর আছে!
বাঁটুলদা, দেখো বোধহয় বৃষ্টি আসছে!

দেখেছি! যতক্ষণ না তোর একটা গ্যারেজের ব্যবস্থা হয়, ততক্ষণ তোর গাড়ি এই মুরগীর ঘরটা দিয়ে চাপা দি!

আরো পরে
বাঁটুলদা! মুরগীগুলো আমার নতুন গাড়িটাকে একেবারে আস্তাকুড় বানিয়ে ছাড়বে! দেখো, এরি মধ্যে হর্ণের ওপর চড়েছে!
ওসব যেতে দে তো লম্বু! লাইব্রেরী থেকে আনা বইটা দারুন ইন্টারেস্টিং! গোলমাল করিস না!

গুপ্ত পথ, ফাঁদ পাতা দরজা আর ফাঁপা দেওয়ালে বাড়ি ঘর ভর্তি!
কিন্তু আমি এখনই এই দেয়ালের ঠিক পেছনে কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি!
তাই নাকি রে লম্বু! আমার বাড়িতেও গুপ্তপথ আছে বোধহয়! গুঁতো মেরে ফাটিয়ে দেখতে হবে দেয়ালের মধ্যে ফাঁক আছে নাকি!

১৩৮০ বৈশাখ ১৯৭৩

বাঁটুল দি গ্রেট

আরে শাবাস! ভেদো দেখছি সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো দড়িতে হাঁটছে!

বাঁটলোর কুকুর ভেদো আমাদের ধরবার জন্যে দড়িতে হাঁটা প্র্যাকটিস করছে রে মাইরি! কিন্তু সে গুড়ে বালি!

নে চটপট চল। ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে আজ খেলতে যেতে হবে!

খুব খারাপ ভেদো!

গররর!

দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে গিয়ে মই দিয়ে নেমে পালাবো!

ওরে বাবা! ভেদোটা আসছে যে রে!

শীগগির আবার ঘরে ফিরে চল!

দাঁড়া! দড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে ফেলতে পারি কি না দেখি!

পারবো মনে হচ্ছে!

হেলপ! ব্যাটা দাঁতে দড়ি কামড়ে ঝুলছে মাইরি!

হতচ্ছাড়াটা আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছে!

গররর!

শীগগির আলমারির ওপরে উঠে আয়, আর লাথি মেরে চেয়ারটা ফেলে দে। তাহলে হতচ্ছাড়া ভেদোটা আর আমাদের নাগাল পাবে না!
গরররর!
মরেছে! আলমারিতে উঠে আমাদের ধরার জন্যে ড্রেসিং টেবিল ঠেলে নিয়ে আসছে!
ড্রেসিং টেবিলটাকে সিঁড়ি করে ওপরে উঠে পড়ছে মাইরি!
চটপট জানলায় লাফিয়ে পড়!
জানলাটা শয়তানটার ঘাড়ে আটকে দিয়ে খুব খাসা করেছিস!
গরররর!
গেছি রে! ভেদোটা দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে দিয়েছে! বাঁটুলদা বাঁচাও!
বাঁচালে তুমি বাঁটুলদা!
খুব হলো! বাঁটলো তো ফুঁ মেরে চালে তুলে দিলো, এখন নামবি কি করে?
বেশ ভালো হয়েছে! এবারে নিশ্চিন্তে বসে ও কস্তারাম আমার নতুন কাণ্ডকারখানা কি বেরিয়েছে দেখি!

১৩৮০ পৌষ ১৯৭৪

বাঁটুল দি গ্রেট

কি হচ্ছে এসব? শিগগির থাম!

এটা অপমানজনক। আমার পোষা উটপাখীর সঙ্গে মারপিট করে তোরা ঘরের সব ভেঙ্গে তছনছ করলি। এজন্যে তোদের পাঁচশো লাইন লিখতে হবে — আমি আর ঘরের জিনিস ভাঙিব না!

পরে
বিচ্ছুদুটোকে আটকে বাড়িটা ঠাণ্ডা হয়েছে।
কিন্তু একটা মাছি আমার চারদিকে ঘুরে উৎপাত সুরু করেছে।

আমার নাকে বসেছে। এটাকে চাপড়ে দি।

ফস্কে গেলো!

এইবার পেয়েছি! ব্যাটা ঠিক ঘড়ির পাশেই বসেছে।

বাঃ! এ দেখছি আমার চেয়ে বেশী চটপটে!

এবারে ঠিক এটাকে বাগে পেয়েছি। টেবিলের একেবারে ধারেই বসেছে।

যাঃ! হতভাগা আমাকে আসতে দেখেছে।

ক্ষুদে শয়তানটাকে এবার দেখাচ্ছি মজা!
নাঃ! এবারও ছুটকে পালালো!
বেচারা উটপাখী
আচ্ছা, এই যে এবার দেয়ালে! ঠিক আছে এই —
— দ্যাখ্!
ঠিক তালমতো পাজিটাকে তুই গিলেছিস!
খপাৎ
বাঁটুলদা, তুমি যে পাঁচশো লাইন— 'আমি আর ঘরের জিনিস ভাঙিব না' লিখতে দিয়েছিলে তা লিখেছি!
আমাকে পাঁচ হাজার লাইন 'আমি আর ঘরের জিনিস ভাঙিব না লিখে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বাঁটুল দি গ্রেট

ক্ষীরের নাড়ু করবার জন্যে পিসি ক্ষীর তৈরি করছে।
ওর থেকে অগ্রিম একটু ক্ষীর চেখে দেখতে হবে।

দরজায় টোকা দিয়ে পিসিকে ডাকা দি!

কে? কে দরজায় টোকা দিলে? কেউ আছে?
চটপট কর্ম ক্লীয়ার করতে হবে!

এই জগে করে খানিকটা ক্ষীর তুলে নি!

ক্ষীর দেখছি অনেকটা কমে গেছে—নির্ঘাত বাঁটুলের কর্ম!
তোর ভাগ তুই খেয়েছিস বাঁটুল, নাড়ু আর তুই পাবি না!

পরে
নাড়ু তৈরি হয়ে গেছে, আর তার বেশির ভাগটাই পিসি ঐ ছোঁড়া দুটোকে দিয়ে দিয়েছে। এটা মোটেই ঠিক হয়নি। আমাকে ওদের কাছ থেকে ভাগ নিতে হবে!

আগে আমি হাতে কালি লাগিয়ে নি! যাতে বুঝতে না পারে

ঐ যে ওরা আসছে!

ওরে বাবারে! এযে কালো ডাকাত!

চাকুম-চুকুম!
ওঃ, সিপাইজী! মস্ত কালো একটা ডাকাত এইমাত্র আমাদের ক্ষীরের নাড়ু কেড়ে নিলো

একটু পরে
দ্যাখ, বাঁটুলদা আগেই খেয়েছিলো বলে পিসি ওর ভাগ থেকে আবার আমাদের নাড়ু দিয়েছে!

আহ! এতো ক্ষীরের নাড়ু নয়! এতো দেখছি আস্ত একখানা ইঁট!
হাঃ হাঃ! তুমি ধরা পড়ে গেছো। যে নাড়ু তুলে নিতো সে তুমি!

কিছুক্ষণ পরে
আর একবাটি ক্ষীর তুই খেয়েছিস বাঁটুল! শেষে এমন চেটেছিস যে, বাটির তলা শুদ্ধু উড়িয়ে দিয়েছিস!
ইঃ! আজ আমার প্রেসটিজ একেবারে ঝাঝরা হয়ে গেলো! তবু ভাগ্যিস চ্যাংড়াদুটো এখন এখানে নেই!

১৩৮২ আষাঢ় ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

এইরে! অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যাবো অথচ রেলের ভাড়া আনতেই ভুলে মেরে দিয়েছি।

তুমি বিনা টিকিটে যেতে চাও? তাহলে আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো কি করে যাবে!

এবার ট্রেনটা যখন আস্তে পুলের নীচে দিয়ে যাবে তখন ওর ছাদে লাফিয়ে পড়বে!

লাফিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি থাকো!

মরেচে! এযে সোজা ভেতরে সেঁধিয়ে গেলো!

সেরেছে! গার্ড ভ্যানের ভেতরে একেবারে গার্ডের গর্দানে এসে পড়েছি!
ডাক
দমাস!

ব্যা-ব্যাপারটা কি ঘটলো?
গার্ড সাহেবের ঘোর কাটার আগেই আমি একটা বস্তার মধ্যে লুকিয়ে পাড়ি!
ডাক
ডাক

একি! এখানে গর্ত গজালো কি করে?

১৩৮২ কার্তিক ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

ওরা ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে। মনে করলে আমিও খেলতে পারি।
ক্রিকেট বল অনুশীলনের স্থান
কি গো বাঁটুলদা!

কোনদিকে মারতে কোনদিকে মারছিস!
আহ্! এইতো কোত্থেকে একটা ক্রিকেট বল এলো!

হুমম! ভালোই হয়েছে। এটা দিয়ে আমি বল করা প্র্যাকটিস করি!

থামো! থামো! ওটা আমার বল!
সামনের গাছটা যেন উইকেট! ওটাকে লক্ষ্য করে বল করি!

ওঃ হয়ে গেলো!
দুঃখিত, বলটা সোজা গাছ ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেলো!

হুঃ! গাছের মধ্যিখানটা নির্ঘাত পচা ছিলো!
আমার কিন্তু তা মনে হয় না! বলটা আমার চেপ্টা হয়ে গেছে!

আপনার বলটা নষ্ট হলো, খুবই খারাপ। কিন্তু এটা প্রমাণ হলো যে, আমি ক্রিকেটে খুবই ভালো। আমি একটা ম্যাচ খেলবো!

মাঠে
বিপক্ষের ব্যাটধারী ছক্কার মার হাঁকড়েছে! আমি ওকে সাহায্য না করলে ও এ বল ধরতেই পারবে না!

ওপরে উঠে যা! এবার ধর!
উয়োফ! এ কি ঘটছে!

খপাৎ!
ধ্যাৎ! আমি এটা ফস্কালুম!
বাঃ! বলটা ওর আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেলো!
দুটোই ধরেছি!
আউট!
বাঁটুলদা! আমাদের দলে একজন কম! সেই জায়গায় এখন তুমি ব্যাট করতে পারো। কিন্তু সাবধান— ও কিন্তু সাংঘাতিক ফাস্টবোলার!
কোন চিন্তা নেই! ওর ফাস্টবল আমি মাঠের একেবারে লাস্টে পাঠিয়ে দেবো!
এই যে ফাস্টবোলার আসছে—
আর আমিও ছক্কা হাঁকালাম!
বাঁটুলদা! এই ভাবে মিস করে তুমি আমাদের ডোবালে?
কিন্তু এটা তো মিস নয়! বলটা আমি প্রচণ্ড জোরে হাঁকিয়েছিলাম!
—এই দ্যাখ তার প্রমাণ!
আমার ব্যাট!
বাঁটলো হতচ্ছাড়া জেতা গেম ডুবিয়ে দিলে রে মাইরি!
বুঝতে পারলাম যে আমি ক্রিকেটে এখনো বেশ ভালোই— কিন্তু আমার উপযুক্ত কোন ব্যাট আর বল তৈরি নেই বলে আমি আর খেলতে পারবো না!
নং

১৩৮২ পৌষ ১৯৭৫

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার প্রতিবেশী এতো জোরে নাক ডাকাচ্ছে যে, আমি একটুও ঘুমোতে পারছি না!
ফরাৎ ফোঁরর!
ফরাৎ ফোঁরর!
নাক-ডেঁপুটা একটু বন্ধ করুন দাদা!
দুম! দুম!
ফরাৎ ফোঁরর!
নাক ডাকা বন্ধ করার একটা পথ আছে তা হলো ওকে বিছানা থেকে ফেলে দেওয়া।
এতে কাজ না হলে অন্য ব্যবস্থা।
ফরাৎ ফোঁরর
অ্যাই! এ কী ব্যাপার ঘটছে?
ধপাস!
কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এ ছাড়া আপনার নাকের আওয়াজ বন্ধ করার উপায় ছিলো না।
ওঃ, জ্বালালে! এখন আবার এক হতচ্ছাড়া বেড়াল শুরু করলো!
মিয়াওঁ!
দূর হ হতভাগা!
বাঁটুলের নিক্ষিপ্ত ইঁট বেড়ালকে না লেগে টাউন হলের উপরে রাখা সাইরেনে গিয়ে লাগলো।
উই

১৩৮৪ অগ্রহায়ণ ১৯৭৭

আমাকে ডেকেছিলেন?
হ্যাঁ, ইনি নিষ্কর্মাপুরের রাজাবাহাদুর। উনি কিছু ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরছেন। তোমাকে পাহারা দিয়ে পৌঁছে দিতে হবে।

বেশ তাই হবে।
জলপথে আমার নিজস্ব জাহাজে করে যাবো!

পাশের ঘরে
কি স্যাঙাত! আড়ি পেতে কি শুনছিস?

দারুণ খবর মাইরি! নিষ্কর্মাপুরের মহারাজা দেদার ধনরত্ন নিয়ে জাহাজে করে যাবে সঙ্গে কোন এক ব্যাটা পাহারাদার। আমরাও এবার সাবমেরিনে করে গিয়ে ঐ ধনরত্ন অতি যত্ন সহকারে লোপাট করে দেবো!

হিঃ!

চলুন, মাল নিয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে ভেসে পড়ি।

পরিস্থিতি বেশ নির্ঝঞ্ঝাট আর শান্তিপূর্ণ!

ওটা কি জল ফুঁড়ে বেরুচ্ছে, বাঁটুল?
বোধ হচ্ছে ঝঞ্ঝাট!

একিরে বাবা! সেই মিচকে দুটো সাবমেরিন নিয়ে হানা দিয়েছে!

ঐ জাহাজে যারা রয়েছো তারা শোনো! তোমরা যদি এক্ষুণি তোমাদের নিয়ে আসা সমস্ত সোনা-দানা, ধনরত্ন আমাদের হাতে এনে ও ভরে কামান দেগে তোমাদের ডুবিয়ে দেবো!

আমার জাহাজে তো টর্পেডো নেই. তবে এলো কোত্থেকে!
ফটাং!

ওব্বাবা! ওরা আচমকা আমাদের দিকে টর্পেডো ছুড়েছে রে! ওরে মা! এ তার চেয়েও সাংঘাতিক — বাঁটলো! ডুবো, শিগগির ডুবো জাহাজকে ডুবো

এই যে পেয়ে গেছি!

ফুঃওওও!

হুসস!

হেলপ!
তাজ্জব! জলের নীচের সাবমেরিন ফুঁয়ের চোটে সাব-বেলুন হয়ে মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে!

বাঁটুল দি গ্রেট

স্যার, আমি এই কাজ ভালোবাসি!
চিড়িয়াখানার পরিচারক আবশ্যক
আমি জন্তু জানোয়ার খুবই ভালোবাসি আর তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করি!
চমৎকার! কাজটা তুমিই করো!
সিংহ থেকেই খেতে দেওয়া শুরু করি। এই যে, সিঙ্গিমশাই! মজার কাণ্ড! আমাকে দেখে খুশিতে ও হাঁক ছাড়ছে!
গাঁ-আঁক!

খুশিতে ডগমগ ছোট্ট বেচারা! ও আমার ঠ্যাংটা চিবিয়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের চেষ্টা করছে!
কড়াক!

এই যে, তোমার জন্যে চমৎকার রসালো একখানা ঠ্যাং এনেছি বাছা!

লুফে নে, সিঙ্গু!
দমাস!

ওহে, ধুমসো গরিলা! আমি তোমার জন্যে দারুণ সব ফল এনেছি!

হোঃ হোঃ! বাছা খুব হুল্লোড়ে! আমার সঙ্গে কুস্তি লড়তে চাইছে
গররর!

যথেষ্ট হয়েছে ধুমসো! আমার কাজ রয়েছে!
ধমাস!

এবার গণ্ডারের পালা!
গণ্ডার

ঐ যে খাবারের জন্যে ও আসছে।
ঘোঁক!

অ্যাই! আদর করে আর গোত্তা মারতে হবে না!
ধড়াম!

হোঃ হোঃ! বেবুনগুলো আমার উপস্থিতির উত্তেজনায় ওপরে নীচে লাফালাফি আরম্ভ করে দিয়েছে!
ক্রিইইইচ!

হাঃ হাঃ! আমিও তোদের সঙ্গে ওপরে নীচে লাফাবো!
ঠকাস!
ঠকাস!

দেখুন! যা দেখছে
সবই মমতার বশ
হয়েছে!
!!!

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার একটা দাঁতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, দাঁতের ডাক্তারবাবু! আপনি কি এটা তুলে দেবেন?
দন্ত চিকিৎসক
আমি এখুনি পুরোনো মোটর গাড়ির রেসে যোগ দিতে শহরে যাচ্ছি। ফিরে এসে তুলে দেবো!
আমার আর এক টিন পেট্রোলের দরকার!

হিঃ হিঃ! আমি আমার দাঁতটা ওর গাড়ির পিছনের চাকার ডাণ্ডার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছি! এবার গাড়ির হ্যাঁচকা টানে উনি আমার দাঁত তুলে দেবেন এবং সেই সঙ্গে পারিশ্রমিক দেওয়া থেকেও বাঁচিয়ে দেবেন!

ইয়ো! আমার পেছনের চাকার ডাণ্ডা তুমি ছিঁড়ে ফেললে!

আমি আর একটা জায়গা জানি যেখান থেকে বিনা খরচে আমার দাঁত উপড়ে ফেলতে পারবো!

বাঃ! ওরা আরো একটা রকেট ছাড়ার ব্যবস্থা করছে!
রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র
কাছে আসিবেন না

এটা আমার দাঁত উপড়ে ফেলতে পারবে! হোঃ হোঃ!

হুউসস!

১৩৯১ ফাল্গুন ১৯৮৫

* নারায়ণ দেবনাথের সৃষ্ট একমাত্র সম্পূর্ণ রঙিন বাঁটুল যা দেব সাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী পূরবীতে ১৩৭৯ (১৯৭২) সালে প্রকাশিত হয়।

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২

বাহাদুর বেড়াল

১৯৮২ সালে (১৩৮৯ ফাল্গুন) শুকতারায় প্রচ্ছদে প্রকাশ পায় অন্য মাত্রার রঙিন কমিক্‌স বাহাদুর বেড়াল। ১৯৮২ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানে লেবার স্ট্রাইকে বেশ কিছুদিন শুকতারা বন্ধ থাকে। সেই সময় শুকতারার মলাটে চলছিল কৌশিক রায়ের কাহিনি 'ভয়ঙ্করের মুখোমুখি'। তখন পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে দিল্লি থেকে পত্রিকা এবং মলাট ছাপিয়ে আনা হয়। সেই সময় কৌশিকের কাহিনির মাঝপথে শুরু হয় 'বাহাদুর বেড়াল'। বছরখানেক পর লক-আউট উঠে গেলে পত্রিকার মলাটে আবার ফিরে এল কৌশিকের কাহিনি এবং বাহাদুর বেড়াল স্থান পেল শুকতারার ভেতরের পাতায়। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

বাহাদুর বেড়াল

ওয়াফ্!

ট্যাঁই

হাঃ হাঃ! নিজের রসিকতা নিজেই পরখ করো বেল্লিক!

বাহাদুর বেড়াল

১৩৯০, বৈশাখ ১৯৮৩

বাহাদুর বেড়াল

এইদিকে বাহাদুর! তোমাকে দেখতে ঠিক লাফানো কচ্ছপের মতো লাগছে—তাই তুমি এসে কি করে করতে হয় আমার কচ্ছপকে শিখিয়ে যাও!

বাঁচা আ আও! বাজনদার ধরে ফেলার আগে আমাকে এটা থেকে জলদি বের করো!

বাহাদুর বেড়াল

আম গাছের মালিক গাছ পাহারার জন্যে ছাগল ছেড়ে রেখেছে! আমাকে ঐ হতচ্ছাড়াটাকে তাড়াতে হবে!
ফ্যাঁচ!

আয় হতচ্ছাড়া ছাগল!

পাকড়েছি!
ঝপাৎ!

হাঃ হাঃ! এর পরের কাম হলো আম পাড়ো আর খাও!
কিন্তু

আম পাড়লে তোর নাম ভুলিয়ে দেবো! বালতিটা খুলে দে!
মরেছে! গাছের মালিক!

এদিকে আয় ভালো করে তাকা!
ওকে গোত্তা মার ছাগলু!

গদাম!
একেবারে সঠিক লক্ষ্যে!
আমি পেটুক নই! মাত্র এক বালতি নিয়েছি!

বাহাদুর বেড়াল

গোঁদুবাবুর বাগানে কি সুন্দর আম! কি করে কিছু আম আমি বাগাবো?

অ্যাই, ট্যাঁপা! ওটা কি পরেছিস?
এটা আমার বাবার। তিনি খনি কর্মী! এরকম আরো দুটো বাড়িতে আছে।
বেশ, তাহলে ওটা আমাকে দে আর অন্যগুলি রাত্রে আনবি।

এই যে, গোঁদুবাবু! আমার শিরস্ত্রাণটা কেমন লাগছে?
ওর মতলবটা কি?

সেদিন সন্ধ্যায়
ঠিক আছে—এবারে শিরস্ত্রাণ পরো তারপর গাছে চড়ো।

অ্যাই, কি হচ্ছে?
আলো নিবিয়ে দে! নাহলে আমাদের দেখে ফেলবে!

হিঃহিঃ! অন্ধকারে আমাদের ধরতেই পারবে না!
তাই ভেবেছিস বুঝি!

তুমি আর তোমার দুর্দান্ত ফন্দির জন্যে উল্টে এবার হন্যে হয়ে পালাতে হচ্ছে, বাহাদুর!

বাহাদুর বেড়াল

চলো, বাহাদুর! আমরা একটা পাক দিয়ে আসি।
হবেনা রে, টেকো। চাকা পাংচার। তার চেয়ে চল এর বদলে নৌকা চালাই।

ধুস! পাংচার কিছুই না! আমি খুব শিগগিরই ওটা মেরামত করে দিচ্ছি।

তারপর—

ইস্!
গেছি রে!
ধ্যাড়াস!

ব্যস, সাইকেল ভ্রমণ এখানেই খতম, টেকো—কিন্তু আমার একটা চমৎকার মতলব এসেছে!

তুমি ওটা কি বানাচ্ছো, বাহাদুর?
একটু পরেই দেখতে পাবে।

একসঙ্গে নৌকা এবং সাইকেল চড়া তার সঙ্গে মৎস ধরা কেমন চলছে, দেখো!

বাহাদুর বেড়াল

আমার এই উটপাখিকে আমি পোষ্য দৌড়ে নামাচ্ছি। আপনার এই বড় মাঠটায় ওকে তালিম দিতে পারি কি ?
নিশ্চয় পারো, বাহাদুর!

চল, দৌড়ো — ব্যাটা কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার !

গেছিরে !
দমাক !

অ্যাই ! এই ধাড়িটা আমার খামার ঘর বানাবার সব পেরেক খেয়ে মেরে দিলো ! এটাকে এখান থেকে বের করে দাও !

দৌড়ের সময় —
প্রতিযোগী পোষ্যদের লাইনে দাঁড় করাও...
ওর পেট পেরেক ভর্তি, কিন্তু কি করে ওকে দৌড় করাতে হবে তা আমি জানি !

রেডি — এবার দৌড়োও !
শুধু এটা লক্ষ্য করো !

এটা কেমন মনে হচ্ছে ? চুম্বকটা ওর ভেতরের পেরেককে টান দিচ্ছে, আর তাই ওকে জান কবুল করে ছুটতে হচ্ছে !

বাহাদুর বেড়াল

১৩৯৫ মাঘ ১৯৮৭

বাহাদুর বেড়াল

রাতের বেলায় চুপি চুপি মাছ ধরার জন্যে যাচ্ছি!

ওরে বাবারে! কি ভয়ঙ্কর পশু!

আরে! এটা আমাকে তাড়া করছে না! কিছু মজার ব্যাপার আছে এখানে!

বাহ্, এটা শুধু ভাঁওতা! ডাণ্ডার ওপর উজ্জ্বল রং করা একটা মুখোশ!

পরদিন
থিয়েট্রিক্যাল স্টো
অর্ডার মতো মুখোশ তৈরি করা হয়
পুকুর মালিকের কায়দাতেই এবার আমি ওকে খেল দেখাবো!

পরে
এটা পুকুরের মালিককে বোকা বানাবে!

মরেচে! কোনটা আসল বাহাদুর!
মাছ ধরা নিষেধ
ওদের কেউ না! হেঃহেঃ! আমি গাছের ওপর থেকে দেদার মাছ ধরছি!

বাহাদুর বেড়াল

হাঃ হাঃ! কি একখানা পুরোনো হাড় ঝাঁকানীয়া!
প্রাচীন সাইকেল রেস
খ্যাড়াং
খ্যাড়াং

এর ওপর দিয়ে খড়খড়িয়ে যাওয়া বাহাদুর কেমন পছন্দ করে দেখি।
খ্যাড়াং
খ্যাড়াং

হাঃ হাঃ!
এটা তোর হাড্ডিগুলি নাড়া দিয়ে ঠিকঠাক খাড়া রেখে দেবে!

বজ্জাত! এই সংঘর্ষ আমার হ্যাণ্ডেলবার বেঁকিয়ে দিয়েছে!

হতভাগাটা ঘুমোনো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। এবার আমার সুযোগ!

অ্যাই, গোঁদো, ওঠ! আমি আর একটা হাড় ঝাঁকানীয়া পেয়েছি!
অ্যাঃ? সেটা আবার কি? আমাকে দ্যাখা!

এই যে সেটা!
ঢকাস

হাঃ হাঃ! কেমন ঠকিয়েছি! এটা তোমারই খাওয়া পুরোনো হাড়! আর এটাকে আমি আমার হাড় ঝাঁকানীয়ার হ্যাণ্ডেলবার বানিয়ে নিয়েছি!
খ্যাড়াং
খ্যাড়াং

বাহাদুর বেড়াল

বাহাদুর! হোলির দিনে তোমাকে রংএ চোবাতে আসছি, তৈরি থেকো।
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, ভেটকু! দেখি কে কাকে চোবায়।

আমি রং খেলার জন্যে তৈরি!

এসে গেছে – আর এই ওর মুখে কালি ছুঁড়ে অভ্যর্থনা শুরু!
ক্রীং
ক্রীং

দমাস
দমাস
খুব ক্ষেপে গেছে–

–তাই আমি নীচের দিকে ওর পায়ে ঘা মারি!

ছলাস!
এবার ঠাণ্ডা করার জন্যে রং গোলা ঠাণ্ডা জল দিয়ে স্নান!

এবার দেখি আমায় রংএ চোবাতে আসা বাবু কি রকম কাবু হলেন!

রংএ চোবানোর ভয়ে তুমি পুলিশের হেপাজতে বসে আছো, বাহাদুর ?

হতচ্ছাড়া!

হাঁদা ভোঁদা
১৯৬২
১৯৬৩
১৯৭১
পিসেমশাই
১৯৮৩
বচা
২০০৩
১৯৫০ দশকের শেষের দিকের হাঁদা ভোঁদা

হাঁদা ও ভোঁদা

১৯৬২ সাল (১৩৬৯ আষাঢ়) থেকে নারায়ণ দেবনাথ দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় শুরু করেন স্কুলপড়ুয়া বিচ্ছু মানিকজোড় হাঁদা-ভোঁদার কাণ্ডকারখানা। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বাংলা কমিক্স জগতে এক নব অধ্যায় সূচিত করে। লরেল-হার্ডির খুদে সংস্করণ হিসাবে এঁকেছিলেন রোগা হাঁদা ও মোটা ভোঁদা চরিত্র দু-টি। নিজের ছোটোবেলার বিভিন্ন ঘটনা, পাড়ার ছেলেদের বিভিন্ন দুষ্টুমির টুকরো স্মৃতি থেকে তৈরি করেছিলেন 'হাঁদা-ভোঁদা'র গল্প। হাঁদার অ্যালবোট স্টাইলের চুলটি খুব মজার দেখতে। হাঁদার পুরো নাম হাঁদারাম গড়গড়ি আর ভোঁদার পুরো নাম ভোঁদা পাকড়াশী। সঙ্গে থাকেন পিসেমশাই বেচারাম বকশি। প্রথম গল্পের নাম 'হাঁদা-ভোঁদার জয়' যা এক পাতা করে তিনটি মাস ধরে (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৬৯) তিন পাতায় সম্পূর্ণ হয়। বিষয়বস্তু ছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ। গল্পটি কমিক্স-এর বই আকারে অগ্রন্থিত। প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি হাঁদা-ভোঁদার গল্প একপাতার; যা বই আকারে অগ্রন্থিত। এ ছাড়াও হয়েছে তিন পাতার দুর্লভ হাঁদা-ভোঁদা (১৩৬৯ আষাঢ়–ভাদ্র এবং ১৩৭১ ফাল্গুন)। প্রায় ৫০ বছর ধরে চলতে থাকা এই কমিক্সে... হাঁদা-ভোঁদার এখন যে-চেহারা দেখি প্রথম দিকে তা অনেকটাই আলাদা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৫০-এর দশকে হাঁদা ও ভোঁদা নাম দিয়ে অনিয়মিতভাবে কিছু ছবিতে গল্প প্রকাশিত হয় শুকতারায় যার চরিত্রের চেহারা ছিল সিরিয়াস। চারটি ছবি নিয়ে একপাতার সেই সিরিয়াস হাঁদা-ভোঁদার 'ছবি ও কথা'র স্থানে ছিল বোলতার ছবি । নারায়ণ দেবনাথ জানান সেই 'সিরিয়াস' চেহারার হাঁদা ভোঁদার রচয়িতা 'বোলতা' প্রকৃতপক্ষে তখনকার প্রখ্যাত শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশনার কর্ণধার সুবোধচন্দ্র মজুমদারের ভাই ক্ষীরোদবাবুই নারায়ণ দেবনাথকে উৎসাহিত করেন হাঁদা-ভোঁদা নাম দিয়ে এই মজার কমিক্স তৈরি করতে। শুকতারা পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং গ্রাহক সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নারায়ণ দেবনাথের 'হাঁদা ও ভোঁদা'র হাত ধরে। একসময় হাঁদা ও ভোঁদা পৌঁছে যেত প্রায় দু-লক্ষ পাঠক-পাঠিকার কাছে!

হাঁদা ভোঁদার জয়!

এমন জব্বর খেলাটা দেখতেই হবে।
গেট মানি।

চল ঠিক
করে নেব।

আর্তের সেবায় দান করুণ।
আর্তের সেবায় মুক্ত হস্তে দান করুণ।

দেখ ভোঁদা, ম্যানেজ করে ঢুকতে হবে।
কি করে?

ক্যায়া হুয়া, রোতা হ্যায় কাহে ?
ছোট্টা মেরা চিজ লেকে আভি ইসকা অন্দর ঘুসা।

ভোঁদা কেটে পড়।

১৩৬৯ আষাঢ় ১৯৬২

১৩৭৭ আষাঢ় ১৯৭০

হাঁদা-ভোঁদার কালীপূজা

১৩৬৯ কার্তিক ১৯৬২

হাঁদা-ভোঁদার লেখাপড়া

সারা বছরতো বই এর পাতাই উল্টোইনিরে হাঁদা....
তাতে আর কি হয়েছে।

পাশটা কি আমাদের হয়ে ভূতে করবে!
ঘাবড়াও মৎ, বন্ধু!

রেডিওর দোকানে
এক মাইলের মধ্যে বেতার-বার্তা পাঠানো ও শোনা যায় এমন যন্ত্র আছে?
আছে। এই নিন।

স্কুল বাড়ির লাগোয়া একটা বাড়ির ছেলের কাছে গেল দুজনে।
ওটা রেখে দে, পরে আরো দেবো।
যা বললুম ঠিক ঠিক সেই মত করবি, বুঝলি।
হ্যাঁ। বুঝেছি!

স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা। হাঁদা-ভোঁদার কানে যন্ত্র লাগিয়ে বসে আছে। পরীক্ষক ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।
তোমরা পড়ে এসেছ?
কি বলছেন!
আঁজ্ঞে!

তোমাদের কানে কি হয়েছে?
অ্যাঁ কি বলছেন।
আঁজ্ঞে কালা হয়ে গেছি।

১৩৬৯ অগ্রহায়ণ ১৯৬২

হাঁদা-ভোঁদার
বিটলেমি

অনেক হয়েছে, বন্ধুকে এবারে যেতে দাও
কি করে যাবে। দেখছো না কি বৃষ্টি পড়ছে!

বৃষ্টি এখনও থামছে না বাবা! ভোঁদাকে সারাটা রাস্তা ভিজেই বাড়ি যেতে হবে।
কোন দরকা নেই। আমি গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

হতচ্ছাড়া গাড়ি আবার স্টার্ট নেয়না যে!
ও গাড়ি ঘন্টাখানেকের আগে ঠিক হবেনা। চল ততক্ষণ আমরা রেডিওর গান শুনিগে।

ঘন্টাখানেক পরে।
ধুত্তোরি! নিকুচি করেছে হতভাগা গাড়ির।
বাবা, এবার আমরা এক গে কেরাম খেলে নেবো

ই কি গেরো রে বাবা! এ যে কিছুতেই ঠিক হতে চায় না।

আরো ঘন্টাখানেক পরে।
ওঃ! এতক্ষণে ঠিক হলো। যাও গাড়িতে ওঠো। ওর বাড়ি কদ্দুর?

এইযে বাবা! আমাদের পাশের বাড়িটাই ওদের।

১৩৭১ ফাল্গুন ১৯৬৫

নে ভোঁদা: এবারে হেঁইয়ো বলে জোরে ঠেলা মার:

ওঃ! কী সব সাংঘাতিক ছাত্র জুটেছে আমার।

বাবুজী, জোরে যান শিগগির! হামারা বিচালিকা গাড়িমে আগ লাগিয়ে গিয়েসে।

?
জয় হনুমানজী! আপ বহুত ভালোমান হায় বাবুজী, আপকা পিছুসে পানি আসিয়ে আগ বুতাইয়ে দিলো - পাম্পু কল বেলাইতে হোলোনা।

দ্যাখ ভোঁদা - এবার কি করি। এই পাম্প দিয়ে জল ছিটোবো। এবার আর নিশ্চয়ই ফসকাবে না।

এবারে হাঁদা ভোঁদা ফস্কালো না -
সু-স-স-স

১৩৭১ ফাল্গুন ১৯৬৫

১৩৭১ চৈত্র ১৯৬৫

হাঁদা-ভোঁদার
মৎস্য পর্ব
হিঃ-হিঃ! তোর বঁড়শিতে মাছের বদলে যত ভাঙাচোরা লোহালক্কড় উঠছে যে রে ভোঁদা!

এবারে কি উঠল? পুরানো সাইকেলের অংশ! বাঃ! একটা প্রকাণ্ড মাছ পাব মনে হচ্ছে!

হিঃ-হিঃ! ভোঁদা— তুই ঠেলা গাড়ি করে বড় মাছ নিয়ে যাচ্ছিস নাকিরে?

ভাঙা জিনিস বিক্রির দোকান
পুরানো ভাঙা লোহালক্কড়ের বদলে কিছু টাকা পেলাম!

মাছের বাজার
ট্যারা হয়ে গেলি যে! দ্যাখ— ঠিক বলেছিলুম কিনা যে প্রকাণ্ড মাছ পাব!

১৩৭৪ মাঘ ১৯৬৮

হাঁদা-ভোঁদার
রকেট বাজি
এবারে আমি যা রকেট বানিয়েছি না হাঁদা — দেখবি, সবার তাক লেগে যাবে!
আরে যা-যাঃ! আমার রকেট দেখলে তোদের চোখ চড়ক ডাঙ্গায় উঠে যাবে! যাকে বলে এ্যাপোলো এগারো। বুঝলি ভোঁদুরাম!
দ্যাখনা, ভোঁদার রকেটকে কি রকম লেঙ্গি মারি! তুই আমাকে হেল্প করবি গদা — বুঝলি?
বুঝেছি গুরু!
আমাদের সব ছোট রকেট ও অন্য সব বাজীর বারুদ গুলো এর মধ্যে ঢেলে এই রাম রকেট তৈরি করবো!
আর এই বাঁশ দিয়ে ঐ রকেটের ডাণ্ডা তৈরি হবে গুরু!
একে তো বোতলে বসিয়ে ছাড়া যাবে না গুরু!
না, এটাকে ধোঁয়া বেরোবার চিমনিতে বসিয়ে ছাড়বো!
ঠ্যালা মার গদা! আমি দড়ি ধরে টেনে তুলছি!
এদিকে রান্নাঘরে
চিমনিটা বড্ড নোংরা হয়েছে! একটু পরিষ্কার করা দরকার — কি ব্যাপার ভেতরে খচমচ শব্দ কিসের?

১৩৭৭ আষাঢ় ১৯৭০

হাঁদা-ভোঁদার
শিল্পকলা
ভোঁদাটার দেখছি পাত্তা নেই। নির্ঘাত বাড়িতে বসে গ্যাঁজাচ্ছে।

এদিকে ভোঁদা
যা ভেবেছি। আমি বসে আছি ওর জন্যে, আর ও বাড়ি বসে শুকতারা পড়ছে

কি ব্যাপার রে? পরশু ম্যাচ আর তুই প্র্যাকটিস বন্ধ করে শুকতারা পড়ছিস!
স্নাইরি, একেবারে মজে গিয়েছিলাম। চল্ এবারে।

ভোঁদা! ও পাড়ার নিষ্কর্মা সমিতিকে হারাতেই হবে। কাল তুই আমাকে ডাকবি।
বেশ। শুধু কালকের দিনটাই আছে। তাই কাল একটু বেশী করে প্র্যাকটিস করতে হবে।

আগামী বুধবার টাউন হলে নতুন আর্টগ্যালারীর উদ্বোধন হইবে।
কিসের পোস্টার রে ভোঁদা? টাউন হলে আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধন হচ্ছে! ইউরেকা, এ্যাদ্দিনে একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

পরদিন
কিরে, প্র্যাকটিস করতে যাবিনা হাঁদা? কালকেই তো ম্যাচ।
ফুঃ! ওরে আমার সুপ্ত শিল্প প্রতিভা জেগে উঠেছে। ব্যাডমিন্টন খেলে অপচয় করবার সময় এখন নেই রে বুদ্ধু!

১৩৭৭ ফাল্গুন ১৯৭১

হাঁদা-ভোঁদার
চাকরি করা
পেট্রোলপাম্পে লোক চাইছে! দেখি যদি কাজটা বাগাতে পারি!
তুই বাগাবি? বাগালে এই শর্মা! তুই পেট্রোলের কি জানিস?
একবার কাজে লাগিয়ে দেখুন না, নিখুঁত কাজ করে দিয়ে আপনার কাস্টমারদের কি রকম খুশি করি! ভোঁদা অবশ্য আমার সহকারী থাকবে।
ঠিক আছে! এই যে একজন কাস্টমার এসেছেন! এর গাড়ির সামনের কাঁচ ধুয়ে দাও!
নিশ্চয়ই স্যর! এই যে, এই মুহূর্তে!
মরেচে! বালতি শুদ্ধু হাত থেকে বেরিয়ে গেলো!
খদ্দের ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পালাবার পর
হতচ্ছাড়া গাড়োল! যে কাঁচটা লাগিয়ে দিতে হলো, তার দাম তোর মাইনে থেকে কাটা যাবে বুঝেছিস?
হ্যাঁ স্যর!
পাঁচমিনিট পরে
তিন লিটার লাগাও হে ছোকরা!
এক্ষুনি ভরে দিচ্ছি স্যর!

১৩৮০ শ্রাবণ ১৯৭৩

হাঁদা-ভোঁদার
নয়া কর্ম

কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে নির্ঘাত পিসেমশাই আমাকে কোন কাজে জুতে দেবার তালে আছে—কিন্তু করাতে পারবে না।
হাঁদা, শুনে যা।

তোর পক্ষে একটা চমৎকার কাজ হাঁদা! একজন দুগ্ধ ব্যবসায়ী বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে আসার জন্যে লোক চায়।
কিন্তু আমি কি পারবো পিসেমশাই?

ঠিক আছে। পারতে পারি বোধ হয়।

দুধ দিতে যাবি না হাঁদা?
এইবার যাবো।

পরে
এই আমার প্রথম আর শেষ দুধ দেওয়া।

পরে
দুধওয়ালা একদিনেই আমাকে বরখাস্ত করে দিলো পিসেমশাই!
আশ্চর্য! যাক, আরো ভালো একটা কাজ আছে আড়ত থেকে মাছ বাজারে পৌঁছে দেওয়া।

১৩৮৪ কার্তিক ১৯৭৭

হাঁদা-ভোঁদার
জাদু প্রদর্শনী
ওহ্! জাদুকর ফালতুকুমার এখনো এসে পৌঁছোলো না কি যে হবে!
যদি বলেন তো আমি কিছু জাদু দেখাতে পারি!
বুড়োদের ক্লাব
বুড়োদের ক্লাবের উন্নতিকল্পে জাদুপ্রদর্শনী অদ্য পাঁচ
তুই কি ম্যাজিক দেখাবি রে হাঁদা?
দ্যাখনা, আগে এই লম্বা বাক্সটা তৈরি করি।
প্রদর্শনী শুরু হলো
এবার আমি ভোঁদাকে করাত চালিয়ে দু'টুকরো করে ফেলবো।
অ্যাই! দুজনে একদম চুপচাপ নট নড়ন চড়ন হয়ে থাক!
ধাপ্পাবাজী! আর ছোঁড়া আমাদের ক্লাবের টেবিলটাকে শুদ্ধু দুখণ্ড করে ফেলেছে!
আমি পরে আপনাদের টেবিল মেরামত করে দেবো আগে আপনাদের দড়ির খেলা দেখাই।

ইগলি-মিগলি-গুগলি থা,
ওপর পানে উঠে যা—

হাঁদা-ভোঁদার
বশীকরণ
তোমার নামে একটা পার্শেল আছে হাঁদা!
পার্শেল? কই দেখি কিসের পার্শেল।
মনে হচ্ছে এটা কাকা পাঠিয়েছে। দেখি কি আছে।

ওঃ, দারুন বই! এবার মনে পড়েছে আমিই কাকাকে লিখেছিলাম এরকম একখানা বই আমাকে পাঠাতে।

বইটাকে আগাগোড়া বেশ করে পড়ে নিয়ে তারপর কাজে লাগাতে হবে।

কয়েকদিন পর
এইবার – এইবার সকলকে আমার বশ করে ওঠাবো আর বসাবো।

ভোঁদাটা কোথায় গেলো। আগে ওর ওপরে প্রয়োগ করি।

ভোঁদা, তোদের আমি বশীভূত করেছি। এবার আমি যা বলবো তাই করবি।
ও মনে করেছে যে, ও আমাদের বশীভূত করে ফেলেছে। এখন ও যা বলে তাই কর

তোরা এখন আমার বশীকরণ ক্ষমতার অধীন। এবারে আমার অনুসরন কর্।

আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা হাঁদার বশীকরণে বশীভূত। ওর ইচ্ছাতেই যা কিছু করছি।

হতভাগা মর্কট! বশীকরণে বশীভূত করে নানা কুকাজ করানোর মজা দেখাচ্ছি।

আমিও তোকে বশ করছি হতচ্ছাড়া!

মনে হচ্ছে বশীকরণের গুঁতো খেয়ে ও নিজেই এখন বশীভূত। হাঁদা, আমাদের আইসক্রীম কিনে দে।

বাঃ, চমৎকার! এবারে আমাদের একটা সিনেমা দেখা।

দেখেছিস, হাঁদাটা কি দারুণভাবে বশ হয়েছে! যা বলছি তাই করছে মাইরি!

১৩৮৯ পৌষ ১৯৮২

নন্টে আর ফন্টের
নানান কীর্তি
নারায়ণ দেবনাথ
প্রথম পর্ব
নন্টে আর ফন্টের
নানান কীর্তি
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি
নারায়ণ দেবনাথ

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথের তিনটি জনপ্রিয় সিরিজের অন্যতম নন্টে আর ফন্টে। কিশোর ভারতীর তৎকালীন সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধেই নারায়ণ দেবনাথের হাতে জন্ম নন্টে আর ফন্টের। কিশোর ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে তৃতীয় সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ / ডিসেম্বর ১৯৬৯) নন্টে আর ফন্টের প্রথম কমিক্স প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কিস্তিতেই বাজিমাত। বাঁটুল দি গ্রেট আর হাঁদা ভোঁদার মতোই বাংলার কিশোর কিশোরীরা আপন করে নিয়েছিল এই দুই ডানপিটেকে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিক্রম করেও এখনও প্রতি মাসে কিশোর ভারতীর পাতায় হাজিরা দেয় এই দুই বন্ধু। এই সিরিজে আরও দুই নিয়মিত চরিত্র কেল্টুরাম ওরফে কেল্টুদা এবং হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট পাতিরাম হাতি। এরা অবশ্য গল্পে এসেছে পরবর্তী সময়ে। প্রথম ছ-টি গল্পের হাঁদা আর ভোঁদার মতো নন্টে আর ফন্টেও গল্প শেষ করত নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায়। কেল্টুর আবির্ভাব হয়েছিল কিশোর ভারতীর পঞ্চম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (পৌষ ১৩৭৯, জানুয়ারি ১৯৭৩)। ধারাবাহিক এই গল্পটি চলেছিল পত্রিকার সেই বছরেরই অষ্টম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৮০, মে ১৯৭৩) পর্যন্ত। কিশোর ভারতীর চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৭৮, নভেম্বর ১৯৭১) প্রথম জানা যায় নন্টে আর ফন্টে থাকে হোস্টেলে। সেই গল্পেই প্রথম একজন সুপারেরও দেখা মেলে। তবে পাতিরাম হাতির সঙ্গে চেহারায় কিছুটা অমিল রয়েছে। পরবর্তী একটি সংখ্যায় এজন্য একজন সুপারকেও এঁকেছিলেন শ্রীদেবনাথ। কিশোরভারতীর চতুর্থ বর্ষের সপ্তম সংখ্যায় আবির্ভাব সুপারের। বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন চরিত্র এলেও এই চারটি চরিত্রই রয়েছে ধারাবাহিকভাবে।

নন্টে
আর
ফন্টে
কালকের ঝগড়ার কথা ভুলে যা ভাই ফন্টে! এক জায়গায় শশা গাছে যা শশা ধরেছে না — কি বলবো মাইরি!

সেদিন রাত্রে
দেখেছিস ফন্টে? নে বেড়া টপকে ঢুকে পড়, আমি এখানে থাকি।
তুই ঢোক আমি এখানে থাকি।

আরে যার গাছ সে তো নাক ডাকাচ্ছে, তোর আর ভয়টা কিসের!
তোরই বা যেতে তবে আপত্তি কিসের।

আমাকে ভেতরে পাঠিয়ে ধোলাই খাওয়াবার ধান্দা। মতলববাজ কোথাকার!
মুখ সামলে ফন্টে!

কে র‍্যা? শশা চুরির মতলব বুঝি? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা!
উঃ, বাপরে! সাপে কামড়েছে রে!
সেরেচে
কী হবে নন্টে?

চ' এবারে দু' নক্কেলেই ঢুকে পড়ি। সব জেনেশুনে তো আর পালানো যায়না, কি বলিস ফন্টে?
যা বলেছিস! সত্যি যদি লোকটাকে সাপে কামড়ে থাকে, তবে ফেলে চলে গেলে তো পটল ডাঙ্গায় পৌঁছে যাবে!

সাপে কামড়েছে বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে, কোথায় কামড়েছে?
এই পায়ে। আমি আর বাঁচবো না, ওহো হো!
চটপট একটা বাঁধন দিতে হবেরে নন্টে!

আমি বাঁধন দিয়ে দিচ্ছি, তুই ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়। কুইক্‌!

বাঁধন দিয়েছ দেখেছি। গুড!

দুটো শশা খাবে বলে ওদের আমি মারতে গেনু, আর ওরা আমার জন্যে কত কি করতেছে। আমি বাঁচবো তো
কোন ভয় নেই! এবার হাসপাতাল গেলেই ভাল হয়ে যাবে। তবে এই ছেলে দুটোর জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলে!

আমার শশা সব এবার লুটপাট হয়ে যাবে! আমি বড় গরীব, ঐ শশা বেচেই আমার চলে গো বাবু!
সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, তোমার শশার যাতে ক্ষতি না হয় সে আমরা দেখবো।

নন্টে এণ্ড ফন্টে! এবার আর তোমাদের শশা খাওয়া হলো না। আমি ফন্টের কাছে সব শুনেছি।

আবার যদি তোর মতলবে কোথাও যাই তো আমার নাম ফন্টে নয়।
বয়ে গেছে আমার আর তোকে বলতে, অপয়া কোথাকার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

আজ তো নতুন সুপারিটেণ্ডেন্ট আসছে রে! আগের স্যার তো খুবই ভালো ছিলেন! এই স্যার কেমন ব্যবহার করবেন কে জানে! খারাপ করলেই টাইট! কি বলিস নন্টে!
হুবহু! কিন্তু কে যেন এদিকেই আসছে! আমাদের নতুন স্যার নয় তো রে!

সেই রকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু কি কলেবর রে মাইরি!

স্কুল বোর্ডিংটা কোন দিকে, এ ছোঁড়া দুটোকে জিজ্ঞেস করি

এ্যাই ছোঁড়া! স্কুল বোর্ডিং কোন দিকে রে?
ঐ দিকে!

স্কুল বোর্ডিংএ যাবার খাসা রাস্তা বাৎলেছিস ফন্টে! হিঃ হিঃ হিঃ!
হ্যাঁ, একেবারে সর্টকাট! চল্ এবার ফিরি।

ওদিকে
প্রায় আধমাইল চলে এসেছি কিন্তু কোথায় বোর্ডিং! ছোড়াদুটো তো আচ্ছা ছুঁচো!

ঝপাস্!
গ্ল —প!

টোকে পেলে

আধঘন্টা পরে
আসুন,আসুন! এ কী! এ অবস্থা হলো কি করে?
তাদেরই

এই যে, তুইই তো ভুল পথ দেখিয়েছিলি,– যার জন্যে আমাকে পানা পুকুরে পড়তে হয়েছে!
ভুল রাস্তা দেখাইনি তো!

আবার মিথ্যেকথা!
না স্যার আমি ঠিকই দেখিয়েছিলাম, আপনি দিকভুল করে ফেলেছেন!

দিক ভুল করেছি? বটে! ঠিক আছে,আমার ঘরে দেখা কর্–ভুলের মূল সমেত উপড়ে দিচ্ছি!

তোর জন্যেই তো ঠেঙানি খেতে হবে! তখন ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলেই হোতো!
আরে তখন ছোঁড়া বলে ডাকাতেই তো মেজাজ খিঁচড়ে উল্টো রাস্তা দেখিয়ে দিলুম!
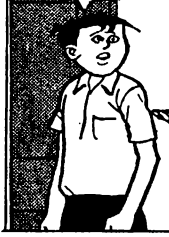
বলে কি না দিকভুল! আসুক আগে হতচ্ছাড়ারা!
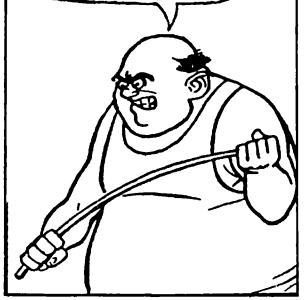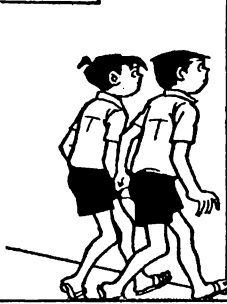
স্যারের ঘরে ঢোকবার আগে
সে রকম হয়তো কিছু বলবে না। দুটো ধমক ধামক দিয়েই ছেড়ে দেবে, কি বলিস নন্টে!

দশ মিনিট পরে
উ-ফ্!
আফ!

আজ শুধু একটু বুলিয়ে ছেড়ে দিলাম, মনে থাকে যেন!

কয়েকদিন পরে
নতুন স্যার তো বন-জঙ্গল খাইয়ে খাইয়ে পেটে সুন্দরবন বানিয়ে ফেললো মাইরি! বলে ওসব ভিটামিনেতে নাকি একেবারে ঠাসা। আর নিজে মাছ মাংস ওড়াচ্ছে! এর একটা বিহিত করতেই হবে!
সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কি করে কি করবি?

যাতে নিজেই এখান থেকে কেটে পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে। মাথায় একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে! তোকে কি করতে হবে ভালো করে শোন্—

রাত্রে
এতো চেঁচামেচি কিসের?
স্যার, নন্টে এ ঘরে থাকতে চাইছে না! জানলায় কি দেখেছে বলছে! শুনে আমারও গা ছম ছম করছে!

বটে, কি দেখেছিস শুনি?
ভূত! নিশ্চয় ভূত স্যার! জানলা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল! আমি চাইতেই সাঁৎ করে সরে গেল!

গাঁজা টাঁজা খাচ্ছিস না কি? কি দেখতে কি দেখে, বলে কিনা ভূত দেখেছি! কাল তোদের বুঝিয়ে দেবো যে, ওসব হচ্ছে মনের আর চোখের ভুল! এবার আর ঝামেলা না বাড়িয়ে চটপট শুয়ে পড়!

পরদিন ভূত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশের পর
এবার সবকিছু বুঝলি তো? মনকে দৃঢ় আর সাহসী রাখতে হয়। আর গুরুপাক দ্রব্য বর্জনীয়! কারণ পেট গরম হলেও ঐরকম সব অলীক দৃশ্য দেখা যায়!

সেদিন বিকেলে
ওটা কি পিস্তল না কি রে— আপস!
ইয়েস, এটা পিস্তল তবে গুলির বদলে এই বেরোয়— হাঃ হাঃ হাঃ!

সেদিন রাত্রে
ভোজনটা আজ একটু গুরু হয়ে গেছে! জল খেয়ে শুয়ে পড়া যাক।

আরে! গায়ে জল পড়ছে। এর মধ্যে আবার বৃষ্টি এসে গেলো নাকি!

কৈ, আকাশ তো দেখছি পরিষ্কার! আর বৃষ্টি পড়লেও অত দূরে যাবে কি করে! ছাদ ফুটো নয় যে সেখান দিয়ে পড়বে।

আজব কাণ্ড! জানলাটার আবার ছিটকিনি নেই। যাক, এবার শুয়ে পড়ি। যত সব ইয়ে ঝামেলা!

কিছু পরে
ফোঁৎ ফররর!
ফোঁৎ ফররর!

হঠাৎ
খড়াৎ

ওরে বাবা, এসব আবার কি সুরু হলো!
উঁ উঁ উঁ উঁ

অ্যাঁক্!

আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-

স্যার স্যার!

একটু পরে
কি হয়েছে ?
আপনি গোঙাচ্ছিলেন কেন স্যার?
ভাবলাম আপনি ভয় পেয়েছেন !

ওসব তোরা বোধহয় ভুল শুনেছিস। আমি ভয় পাবো—কি যে বলিস্! মনে হচ্ছে তোরাই খুব ভয় পেয়েছিস? ভয় কি, তোরা দুজনে আমার ঘরেই থাক্।
আচ্ছা স্যার !

তোরা জেগে থাক। বেশী আহারের মতো বেশী ঘুমও ক্ষতিকারক ! আমি একটু শুধু চোখ বুজে পড়ে থাকি, বুঝলি ? তোরা ভয় পাসনা যেন, আমি তো রয়েছি !
হ্যাঁ স্যার !

একটু পরেই

আরো একটু পরে

বাঃ! মাথায় বুলিয়ে দিচ্ছিস! দে ভালো করে দে। তোদের যতোটা খারাপ ভেবেছিলাম ততো খারাপ তোরা নস দেখছি!

কি রে! আবার থামলি কেন? বেশতো হাত বুলোচ্ছিলি আর কিছুক্ষণ বুলো, তারপর —

তারপর —

আঁ-আঁ-ভূ-উ উ ত! বাইরে থেকে এবার ঘরে এসেছে!

বাবারে! ভূতে বুঝি ঘাড় মটকে দিলে রে!
স্যার, মনকে সাহসী আর—
দৃঢ় করুন!

কেল্লা—
ফতে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আর কয়েকদিন পরেই তো কেল্টুদার সঙ্গে আমাদের রেস হবে।
আজ কেল্টুদাকে দেখছি না তো রে, নন্টে?

কেল্টোর কি হলো বল দেখি?
কি জানি। ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলো না কি? চল একবার খোঁজ করি গিয়ে।

রেসে হেরে যাবার ভয়ে পিছিয়ে গেলে না কি কেল্টুদা?
সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!

শুধু জেনে রাখ্ প্রতিযোগিতার ঐ কাপ আমি পাচ্ছি। তোরা অযথা পণ্ডশ্রম করে মরছিস!

চলি রে নন্টে আর ফন্টে! টা-টা!
কি রকম গ্যাস দিয়ে গেলো দেখলি?

রেসের আগের দিন
কি রে, দৌড়ের আগেই গাড়ির কি হাঁড়ির হাল হয়ে গেলো নাকি রে?

দ্যাখ্ এখনো সময় আছে। কেন হেরে গিয়ে অপদস্থ হবি?
ওর ঐ জ্যাক ফাঁক করতেই হবে।

রেসের দিন
আমাদের নতুন জীপ গাড়ি তৈরির প্রতিষ্ঠান হোঁদল এন্টারপ্রাইজ-এর তরফ থেকে কেল্টুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস সুরুর সময় হয়ে গেছে।

সুরুর আগে আর একবার ভালো করে কোন্ পথ দিয়ে যেতে আসতে হবে ভালো করে বুঝিয়ে একটা করে চার্ট দিয়ে দিন।
হ্যাঁ, আমি ওদের ভালো করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর
উদ্যোগে
জীপ রেস প্রতিযোগিতা

হোঁদল এন্টারপ্রাইজ এর কেল্টুকুমার বনাম নন্টে আর ফন্টের জীপ রেস শুরু হলো।

কেল্টোর ভড়পানি সব ঝিমিয়ে গেলো না কি রে ফন্টে?
কি গো কেল্টুদা, তোমার জীপ যে টিপ টিপ করে ছুটছে?

ওদের কাছ থেকে প্রাইজ জিততে হলে আমার এর চেয়ে বেশী জোরে যাবার দরকার নেই, বুঝেছিস?

বেচারা নন্টে আর ফন্টে! ওরা জানে না যে আমি ইচ্ছে করে পেছিয়ে পড়ছি। আর সেই সঙ্গে পুরস্কার জেতার দিকে এগোচ্ছি।

রাস্তা ছেড়ে এবারে বে-রাস্তা ধরলেই মনে হয় ঠিক জায়গায় পৌঁছোবো।

বাঃ! একেবারে ঠিক জায়গামতো পৌঁছে গেছি!

একটা কথা-ইয়ে-মানে এই মাছের ঝুড়ি আপনারা কোথায় পৌঁছুন দাদা?
শহরের কাছাকাছি।

১৩৮৩ পূজাবার্ষিকী কিশোর ভারতী ১৯৭৬

ঘোঁয়াৎ!

গেল্লুম রে!

মল্লুম রে!

ধমাস!

উঃ, কেল্টোর সঙ্গে জীপ রেসে শেষে কিনা ষাঁড়ের গুঁতোয় ফেঁসে গেলুম!

একে নিড্রয়ম বিঘ্ন ঘটিয়েছি, তার ওপর গাড়িটার রং আবার লাল। ষ্যাটা ক্ষেপে গিয়েছিলো।

এই মরেছে! দাঁড়াতে গিয়ে যে হাঁটু অব্দি ঢুকে গেলো রে!

রেস আমাদের এখানেই বোধ হয় শেষ হয়ে গেলো। কেল্টোটাই শেষ পর্যন্ত প্রাইজ বগলদাবা করবে।

তুলবো তো লিচ্চয়। আমি ম্যাখন ইখানে হাজির রইচি ত্যাখন আর ডর নাই। কিন্তক আপুনাদের কে উখানে কাদাতে স্যাঁদায়ে দিলো ইটা তো বুঝতে লারচি!
ইকি ফ্যাঁসাদ রে? আগে তোল, তা নয় কাদায় আটকে রেখে জেরা শুরু করেছে।
আগে আমাদের তোলার ব্যবস্থা করো তো মোড়লদাদু, পরে সব বুঝিয়ে বলবোখন।
ঠিক আচে। আমি নোক আর দড়ি নিয়ে এসতেচি।

কিছুক্ষণ পরে
ভাগে, বাবুদিগে কাদার থিকে তুলে দে।
দিখো না কেনে, এক হেঁচকায় দুটোকেই তুইলে নে আসচি।

হেঁইও — ওহ্‌পড়!
ইটা কি হল ভাগে? ক্ষ্যামতায় কুলুবে নি, তবু এক সাতে দুজনকে তুলতে নেগেচে। যত্তো সব আনাড়ির কম্মো।
মরেচে।
ঝপাং!

আবো কিছু পরে
উঃ, মোড়লদাদু এসে না পড়লে আমাদের কি দুরবস্থাই না হতো! এবারে গাড়িটা একটু ঠেলে তুলে দিলেই উপকারটা পুরোপুরি হয়ে যায়।

এই দ্যাখ ভাগে, তুইলে মারচি! কাদার ভেতর ক্যামনে পুঁইতে গেছলো তা তো জানা হলো নি!
ও লিচ্চয় তেনারা পুঁইতেছেলেন। তুল কইরে ভাগ্যি পায়ের দিগে পুঁইতেছেলেন মাথার দিগে হলে আর দ্যাখতে হত নি!

নন্টে ! কেল্টো কতো আস্তে আসছেরে ? এত্তোক্ষণ হয়ে গেলো তবু ওর পাত্তা নেই ! কি ব্যাপার বলতো ?
আমাদের কাছ থেকে পুরস্কার জেতার আর আশা নেই বুঝে রাস্তায় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে !

এদিকে !
আমার যথেষ্ট উপকার করলেন — এই নিন আপনার টাকাটা !
আপনার উপকারে লেগে আমিও খুশী ! ধন্যবাদ !

ওরা যতক্ষণে ঘুরে এসে পৌঁছোবে তার অনেক আগেই পুরস্কার আমার হস্তগত হয়েগেছে। নিজেই নিজেকে বলতে ইচ্ছে করছে-কেল্টুকুমার যুগ যুগ জীও !

একটা গাড়ি আসছে। একজন যখন, নিশ্চয়ই কেল্টু !
হ্যাঁ, কেল্টুকুমারই বটে। কাপটা তাহলে ওই জিতলো !

জীপ রেসে পুরস্কার বিজয়ী এবং চ্যাম্পিয়ান !
ক্লিক !
ক্লিক !

এই নাও কেল্টুকুমার, তোমার বিজয়ীর পুরস্কার !
ধন্যবাদ স্যার !

১৩৮৩ পূজাবার্ষিকী কিশোর ভারতী ১৯৭৬

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঘাটশিলায়
বুঝলি ফন্টে! এ জায়গাটা সত্যিই চমৎকার!
ঠিকই বলেছিস! চল্ ঐ দিকটাও একটু ঘুরে দেখে আসি।

সহসা
এই ফন্টে! অসিতবরণ হীরা!
কি যা তা বকছিস! ইন্দ্রজিৎ রায় তো কবেই ওকে ফাটকে পুরেছে!

ওই দ্যাখ, পাথরের ওপর বসে আছে!
তাই তো রে নন্টে! এযে সেই খুনী দস্যু ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!

নির্ঘাত জেল ভেঙে পালিয়ে কোন মতলব নিয়ে আবার এই ঘাটশিলায় এসেছে!
তুই শীগগির পুলিশ ডেকে নিয়ে আয়, আমি ওকে আটকে রাখছি।

আপনার সেতার সঙ্গে আনেন নি?
এই ছোঁড়া বলে কি।

কে তুমি? কি নাম, কোথায় থাকো? সেত্তারের কথা বলছো কেন? তোমাকে চোরাই চালান দলের ছেলে বলে মনে হচ্ছে?
মরেছে! এ যে উল্টে জেরা করে আমাকেই ফ্যাসাদে ফেলতে চাইছে!

ওদিকে নন্টে
সাংঘাতিক খুনী! জেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে! আমার বন্ধু ফন্টে তাকে আটকে রেখেছে!
বটে! আচ্ছা চলতো দেখি!
শীগগির চলুন স্যার!

এ কী স্যার! আপনি এখানে!
না না, স্যার-টর নন— উনি ভয়ঙ্কর খুনী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! এখানেই তো খুন করে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিলেন!
শীগগির ওকে আটক করুন!

তোমরা ভুল করেছো। ইনি ব্ল্যাক, রেড কোন ডায়মণ্ডই নন।

ত-তবে ইনি কে?
ইনি হলেন গোয়েন্দা বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার নিধুরাম বসাক! একটা চোরাই চালানদার দলের সন্ধানে এখানে এসেছেন!

হাঃ হাঃ হাঃ!
অ্যাঁ!

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

চল ফন্টে, এবারে যাওয়া যাক।
হ্যাঁ, চল। নেনো আমাদের সেই পিকনিকের জায়গাতেই থাকবে।

কেল্টোর শকুনিমার্কা চোখকে খুব ফাঁকি দেওয়া গেছে।
যা বলেছিস মাইরি! ও থাকলে একাই সব সাবড়ে দিতো।

এই দড়ি আর হুক দিয়ে টুক করে কার্জ হাসিল করা যাবে।

হেঃ হেঃ! এই ঝুড়ির খাবার এবার আমার ভুঁড়িতে ঢুকবে।
কেল্টুদা আমাদের খাবারের ঝুড়ি ছিনতাই করে নিচ্ছে রে নন্টে!

অ্যাই কেল্টুদা! আমাদের খাবারের ঝুড়ি ফিরিয়ে দাও বলছি!

ওরা রাস্তার মোড় ঘুরে আসার আগেই আমি চোখের আড়ালে চলে যাবো।

হোঁক্স্!

কোথায় যাচ্ছিস তা না জেনেই অন্ধের মতো ছুটছিস যে রে, অ্যাঁ! উঠে দাঁড়া সব, পিটিয়ে চোখ সারিয়ে দি!
কি-কিন্তু, স্যার...

সহসা
দেখুন, স্যার; ঐ যে সেই চোরটা যাকে আমরা তাড়া করেছিলাম— এখন কালো চাদ্দর ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছে!
কি সর্বনাশ! শিগগির পাজিটাকে তোরা পাকড়াও কর!

এই যে, স্যার, এক্ষুনি পাকড়াও করছি! ফন্টে, নেনো, ধর্ ছুঁচোটাকে!

ধরেছি!... না ছিঁচকেটা চাদ্দর ফেলে পালালো — কিন্তু আমাদের খাবারের ঝুড়িটা ফেলে গেছে!
ধরে রাখতে পারলাম না স্যার, চাদ্দর ফেলে পালালো
ঠিক আছে, তোরা যথেষ্ট করেছিস। তোদের আর মারবো না।
ঝুড়িটা ভালো করে ঢেকে রাখিস নন্টে!

বরাত জোরে ট্যাঙানির হাত থেকে রেহাই আর এটা ফেরত পেয়েছি ম্যাইরি!
ছিঁচকেটাকে আচ্ছা করে একদিন ঝাড়পোঁছ করতে হবে।

ওদিকে কেল্টু
স্যারকে দেখে চাদর খুইয়ে সরে পড়তে হলো। না হলে ফাইট দিয়ে ওদের টাইট করে ছেড়ে দিতাম! মাঝখান থেকে খাটুনিটাই মাঠে মারা গেলো।

আঁধার মণি? সে আবার কি জিনিস চাঁদুদা?
সে কি! স্বনামধন্য এই চীজটিকে চিনতে পারলে না? ইনি হলেন সেই দুর্ধর্ষ কীর্তিমান ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
অ্যাঃ!
এই যে ভায়া, তুমিও এসে গেছো।

ভায়া—তার মানে ইন্দ্রজিৎ—মানে বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়—ইঁফ্!
হ্যাঁ, আমিই সেই। কিন্তু ওটা কি হলো?

ওটা উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ! উফ্! এখুনি গিয়ে ওদের এসব বলতে হবে, না হলে পেট ফুলে ঢোল, না না, ঢাক হয়ে যাবে!

ঢাকঢোল বাজাবার দরকার নেই। ও একটা ডাকাতির ফন্দি এঁটেছে। তোমাকে তো চালাক চতুর মনে হচ্ছে, একটু নজর রেখো!
নিশ্চয়! রাখবো ইন্দ্রদা!
আরে আমি তো প্রায় কব্জা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এই ছোকরার জন্যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেলো।

ঠিক আছে চাঁদুদা! আমার জন্যেই যখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড পালিয়েছে, তখন ওকে আমিই খুঁজে বের করবো।
বেশ, খোঁজ পেলেই থানায় খবর দেবে।

একটু পরে
কেল্টোটা আবার কি মতলব নিয়ে আসছে রে ফন্টে!
আসুক! এবার শুধু খালি ঝুড়িটা পাবে!

এই যে কেল্টুদা! আর কিচ্ছু নেই, সব শেষ।
আরে রেখে দে তোদের এঁদো পিকনিকের ছেঁদো খাওয়া! এদিকে যা হয়েছে না, ওঃ! চাঁদুদার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ দিয়ে শুরু। তারপর—

চাঁদুদাই বা কে? আর তোমার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষই বা হলো কেন?
আরে সে কথা বলতে আর তোদের সঙ্গে নিয়ে আঁধার মণির অনুসন্ধান করবো বলেই তো এসেছি।

এই রে! কেল্টুদা হেঁয়ালি দিয়ে কথা কইছে। চাঁদুদা, আঁধার মণি, খোলতাই করে বলো দিকিনি, এরা কে?
হেঁয়ালি নয় বৎস। চাঁদুদা হলেন চন্দ্রকালী দাস সাহিত্যশ্রী, আঁধার মণি হচ্ছেন শয়তানের শিরোমণি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
বলো কি কেল্টুদা! তুমি ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে দেখেছো?

দেখেছি, মানে? একগাল দাড়ি উড়িয়ে আমার নাকের ডগা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো। অবশ্য তখন ওর পরিচয় জানি না। ওকে তাড়া করে ছুটে আসছিলেন চাঁদুদা। তার পেছনেই ইন্দ্রজিৎ রায়। সেই সময় বাঁকের মাথায় এগিয়ে আসা আমার সঙ্গে লাগলো চাঁদুদার মুখোমুখি ঠক্কর, ব্যস, দুজনেই চিৎপাৎ! সেই ফাঁকে দাড়িওয়ালা পগার পার। পরে জেনেছি, ওই হচ্ছে ছদ্মবেশী ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাকাতির মতলব নিয়ে এসেছে। আমার জন্যে পালাবার সুযোগ পেলো বলে ইন্দ্রদাকে কথা দিয়েছি, আমিই ওকে খুঁজে বের করবো।

এসব কাজে সহকারী চাই, তাই তোদের সঙ্গে নিচ্ছি। এতে তোদেরই প্রেস্টিজ বাড়বে।
নিশ্চয়! সব সময় আমরা তোমার সঙ্গে আছি কেল্টুদা!

একটু পরে
নন্টে, একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে!
চল তো শুনি তোর আইডিয়া ফন্টে!

পরদিন
ইস্! ভেবেছিলুম কিছু করার আগেই ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো।
তুমি অনুসন্ধান করার আগেই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড কম্ম হাসিল করে ফেলেছে কেল্টুদা।

এবার কিন্তু ওকে পাকড়াও করতে তোমার আরো সুবিধে হবে, কেল্টুদা!
কি রকম?

লুঠ করা সোনা এখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আর কাছছাড়া করতে পারবে না, তার কাছে রাখতে গেলে সুটকেস জাতীয় কিছু চাই। কাজেই এখন তোমাকে, মানে আমাদের সুটকেস হাতে দাড়িওয়ালা লোকের সন্ধান করতে হবে। তারপর সেই দাড়ি আসল না নকল পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
কারেক্ট! হেঃ হেঃ! কাজের শুরুতেই আমার সঙ্গগুণে নন্টের বিশ্লেষণ শক্তি কি রকম ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে দেখ্ ফন্টে!

একঘন্টা পরে
নেপুল্টুদা! মামা বলেছি মনে আছে তো?
ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

বিকেলে
তোরা আগে চক্কর দিয়ে আয়। সন্দেহজনক দেখলেই আমাকে খবর দিবি, নিজেরা কিছু করবি না। যা করার আমি গিয়ে করবো।
সে তো একশোবার কেল্টুদা!

একটু পরে
স্যুটকেস সমেত একজন সন্দেহজনক দাড়িওলা ঘাপটি মেরে বসে আছে—ইঃ! রং টাইমে এসে গেছি বোধহয়।
না, না, ইয়ে, কিসের রং টাইম!

এবারে জুডোর এক প্যাঁচে কাত করে বমালশুদ্ধু বাছাধনকে ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো।

ঐ দেখো কেল্টুদা! এ ব্যাটা নির্ঘাত ব্ল্যাক ডায়মণ্ড! এবার মাল নিয়ে সরে পড়ার তাল করেছে।
আমি অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ করছি। বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে।
এবারে আর ওর পরিত্রাণ নেই। দেখবি এক প্যাঁচে ব্যাটা মাটি নিয়েছে!

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে বাছাধন—অ্যাক!
—বধিব পরাণ! ছুঁচো কোথাকার!

পাজি, বেল্লিক! আচমকা মারলি? এবার এক প্যাঁচ মেরে তোকে—

আর প্যাঁচ মারতে হবে না, কেল্টুদা! সে পালিয়েছে!
তবে সুটকেসটা নিয়ে যেতে পারে নি।
নিতে পারেনি তো?
জানি পারবে না। ব্যাটা ভীরু কাপুরুষ! প্রাণের ভয়ে বমাল ফেলে পালিয়েছে। এখন এই লুটের গয়নাগুলোই ইন্দ্রদার হাতে তুলে দেবো। এখন একবার দেখি সুটকেসের মধ্যে কি কি জিনিস আছে!

এই ভীতুটার ভয়ে সবাই এত তটস্থ! ক্রিমিন্যালটা পালিয়ে বাঁচলো, না হলে এক ঘুঁষিতে ওর থুতনিটা—

উড়িয়ে— হ্যাঁক্‌স্!
খটাস!

কেল্টুদার সার্টিফিকেট।
ওরে ছুঁচো, কেল্টু! দ্বিতীয়বার তোর গায়ে হাত দিতে মেল্লা হওয়ায় ম্যাজিক চাঁটি মেরে তোর ডাঁট ভেঙে দিলুম
ব্ল্যাক ডায়মণ্ড (দু নম্বরী)

ওটা বোধহয় নেপলুদার বাড়তি সংযোজন।
নেপলুদার তৈরি মেকানিকাল কিক দারুণ হয়েছে, কি বলিস নন্টে?
অপূর্ব!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

১৯৮৩ সালে (১৩৯০) সহসম্পাদিকা বেবী মজুমদার ও শুভ্রা রায়ের উদ্যোগে দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'ছোটোদের আসর' পত্রিকাতে প্রকাশ পায় ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু। এক-দেড় বছর পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে ওই দুই সহসম্পাদিকা একই কমিক্‌স ১৯৮৪ সালে 'গোল্ডেন কমিক্‌স' থেকে প্রথম বই আকারে প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য পত্রিকা যথা 'সুখী গৃহকোণ' (জুন ২০০০), 'সোনার বাংলা' এবং 'সাদা মেঘের ভেলা' (২০০০ সাল), 'তথ্যকেন্দ্র' (২০০২ সাল), 'সোনালী উৎসব' প্রভৃতি গল্প সংকলন বইতে ডানপিটে খাঁদু প্রকাশিত হয়। ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাত্র'জ পাবলিকেশন থেকে বই আকারে দ্বিতীয়বার প্রকাশ। যদিও পাত্র'জ-র এই বইতে দেওয়া সব ছবির গল্প নারায়ণ দেবনাথের নয়। তাঁর একনিষ্ঠ পাঠকমাত্রই গল্পগুলির হাতের লেখা দেখে সহজেই তা চিনে নিতে পারবেন।

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
ইঁক! আরেকটা ইঁদুর! বাড়ি এরা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে! কেউ কিছু একটা করো!
বাড়ির বেড়ালটা একেবারে কুঁড়ের বেহদ্দ!
চিক!

তুমি একটা যান্ত্রিক বেড়াল তৈরি করছো না কেন, দাদু?
ঠিক বলেছিস, খাঁদু!
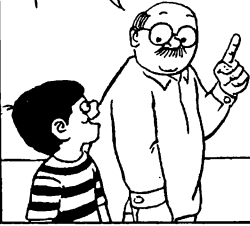
এই ছোট্ট মোটরটা যথেষ্ট শক্তিশালী হবে!
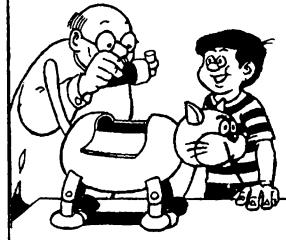
আমি ওটা বদল করে আরো বেশী শক্তিশালী মোটর লাগিয়ে দি। একটা অতি বিড়াল বেশী তাড়াতাড়ি ইঁদুর তাড়াতে পারবে।
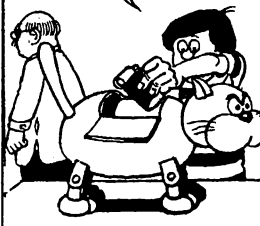
এবার এটাকে পরখ করতে হবে। কোথায় কোথায় ইঁদুর লুকিয়ে থাকে শুঁকে বের করার জন্যে ওকে একে একে দেখাবো।
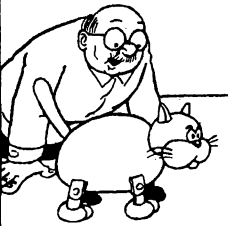
আরিব্বাস! এটা এর মধ্যেই নির্ঘাত ইঁদুরের গন্ধ পেয়েছে!

ঝনন্!
মরেছে! আমি ধারণা করতে পারি নি এ কাজের পক্ষে এটা এতো বেশী শক্তিশালী হয়েছে!

দড়াম!
ইঁক! এটাকে না থামালে সমস্ত বাড়িই ধ্বংস করে ফেলবে!
চিক্!
গরর! এই যান্ত্রিক বিড়ালটাকে আমি এতো শক্তিশালী করে তৈরি করিনি। তুই নিশ্চয় কিছু করেছিস!
উঁহু! হ্যাঁ দাদু, করেছি!
কিন্তু এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে দাদু যে, এতে জাদুর মতো কাজ হয়েছে!
বাহ্!
দেখো! অতি বিড়াল জিতেছে! সমস্ত ইঁদুরকে ও তাড়া করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে—এবং জোর দিয়ে বলতে পারি ওরা আর ফিরে আসবে না!
অতি বিড়ালের নজর এবার যেন তোর ওপর মনে হচ্ছে, খাঁদা!
অ্যাঃ!
বিপ-বিপ!
হেঃ! তুই খুব ভালো পুষি! তোর কাজে আমি খুব খুশি – কিন্তু আমি ইঁদুর নই!
বাঁচাও!
হোঃ হোঃ! খাঁদু জানে না যে ওর পকেটে একটা ইঁদুর ঢুকে আছে!
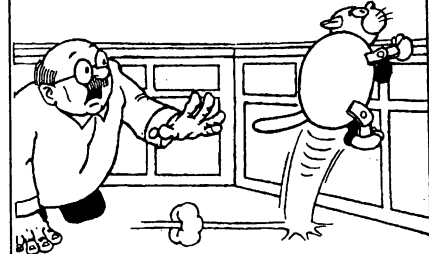
ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
উফ্! রাস্তায় চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে আমায় নাজেহাল হতে হয়েছে! আমাকে সত্যিকারের আরামদায়ক একজোড়া জুতোর উদ্ভাবন করতে হবে।

জুতোর অসহযোগের এই হচ্ছে জুতো! এই জুতো আমি ফুলিয়ে তুলতে পারবো।
দেখতে মোটেই মজার নয়, দাদু!

ঠিক যেন হাওয়ার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া!
আরিব্বাস! দুটোকে হাতাতে হবে!

দাদু এখন দিবানিদ্রায় বিভোর। এই আমার সুযোগ!

প্রথমে আমি এদের খুব বেশী করে ফুলিয়ে নেবো...

আরি সাবাশ! যা ভেবেছিলাম! এগুলি এখন সত্যি লাফিয়ে উঠছে!

বাপরে! লাফ মেরে সাফ দুধের গুমটি পেরিয়ে গেলো!
ওফ্!

আমি বরং স্কুলেই যাই কিন্তু সোজা গেট দিয়ে ঢুকবো না!

সব থেকে সোজা রাস্তা আর বেশী মজার!
ওঃ হো! কাল স্পোর্টসএর জন্যে বচা ওখানে পোল-ভল্ট প্র্যাকটিস করছে!
ইয়াঃ! পোলের কে তোয়াক্কা করে?
ইঁরক!
য়্যাগহ!
হাঃ হাঃ! এবার দেখি স্পোর্টসএর প্র্যাকটিসের পর কি খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে!
আরিব্বাস! মাংস। আমার নতুন জুতো লাইন দিয়ে খাবার নেওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিলো!
এবার চটপট এখান থেকে কেটে পড়ে আয়েস করে খাবারটা খাওয়া যাবে!
গরর! ওর জুতোর খেলা আর মেলা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।
মরেচে! কাঁটা পেরেক!
দুম!
আগহ!
এই তোমার জুতো, দাদু! পরের বার ফুটো-প্রুফ তৈরি করো। নাহলে তোমার আবিষ্কারই ফুটো!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ

কিছুক্ষণের জন্যে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, খাঁদু। কিন্তু আমি চাই যে আমি যাবার পর তুই গাড়িটাকে পালিশ করবি।
ওরে বাবা! বড্ড শক্ত কাজ!

কিছুদিন আগে দাদু সহজে পালিশ করার জন্যে একটা স্প্রে তৈরি করেছিলেন। মনে হচ্ছে এটাই সেইটা!

অ্যাই মরেচে! আমি ভুল করে চুল গজাবার স্প্রে লাগিয়ে ফেলেছি!

এটা সেই জিনিস যেটা দাদু টেকোদের সাহায্যের জন্যে তৈরি করেছিলেন। আমি এটা দিয়ে বেশ মজা করতে পারি!

এইযে, ফাটকা! চুলওয়ালা ট্রাইসাইকেল দেখতে কেমন লাগে দেখি তো!
অ্যাই! তুই আমার গাড়িতে কি করছিস খাঁদা?

ওও! ইরক! হোঃ হোঃ! ভয়ানক সুড়সুড়ি লাগছে মাইরি! হিঃ হিঃ!

হিঃ হিঃ! ...গেছি রে!
হিঃ হিঃ! দারুণ মজা হলো!

এবার দেখি পিছলে নামার এটাতে এই স্প্রে করলে কি ফল হয়।

অ্যাই! এই পিছলে নামার জিনিসটা চুল দিয়ে জ্যাম করে আমাদের খেলার মজাটাই ভেস্তে দিলি, খাঁদা!

সুপস! আমি আমার জমানো সমস্ত পয়সা দিয়ে এই দই কিনেছি। এবার আয়েশ করে খাবো!

তাই ভেবেছিস বুঝি?
ইয়ক! আমার দইয়ের হাঁড়ির দাড়ি গজালো কি করে?

ইয়ারগাহ্‌! আমার দৈ খাওয়া তুই পণ্ড করেছিস, খাঁদা! তোর গণ্ড আমি খুবলে দেবো!
এখানে থাকা আর সমীচিন নয়!

কি ব্যাপার? খাঁদা কি আবার কোন গোলমাল পাকিয়েছে? তাহলে আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেবো!
যদি আমাকে ধরতে পারো!

আমার পিছনে দাদুর ধাওয়া করাটা আমি আটকানোর ব্যবস্থা করি!
ফিস্‌স্‌!

আরে! আমি দরজা খোলার হ্যাণ্ডেল খুঁজে পাচ্ছি না!

হিঃ হিঃ! দাদুকে হাঁদু বানিয়ে আমি নিজেকে খাবার ঘরে বন্ধ রেখেছি! চাকুম-চুকুম!
দুম! দুম!

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু

আমি জানিনা তোর কাছে কি আছে, খাঁদু, কিন্তু ওটা দিয়ে তুই ক্লাশে খেলা করবি না! মধ্যাহ্ন বিরতি না হওয়া পর্যন্ত ওটা আমার এই ডেস্কে রেখে যা।
আচ্ছা, স্যার!
আগে এটাতে খুব ভালো করে ঝাঁকুনি দিয়ে নি!
ডেস্কের ভেতরে বুদ্বুদের বুজরুকি হচ্ছে শোন!
খেঁদো! আমি বলছি এখুনি ক্লাশে কথা বলা বন্ধ কর!
দুড়ুম!
চল সবাই! যতক্ষণ না স্যারের ঘোর কাটে ততক্ষণ সেই সময়টা আমরা চোর পুলিস খেলি!

ইয়োফ্! আমি নির্ঘাত চাকায় বেশী হাওয়া দিয়ে ফেলেছি!
হাঃ হাঃ! বুদ্বুদ ওকে বোকা বানিয়েছে!
দুড়ুম!
অ্যাই! আমার বলটা লাথি মেরে ফিরিয়ে দে, পক্কা!
লাথি মেরে ফেরত পাঠাবো? এটাকে আমি পরের সপ্তাহের মাঝখানে পাঠিয়ে দেবো!
গেছি রে!
হিঃ হিঃ! এটা সাবানের একটা বড় বুদ্বুদ ছিলো!
দুড়ুম!
ওওওঃ! মাথা থেকে টুপিটা নামাতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোলো!

এই আমার মওকা! এটাতে আবার একটু মজা হবে।
এবার ঠিক হয়েছে!
এটা এক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটবে!
দুড়ুম!
ওয়াহ্!
হিঃহিঃ!
বাপরে! ব্যাপারটা ঘটলো কি করে?
হাঃহাঃ! এবার আমি স্কুলের দিকে যাই!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
তুমি আজ কি জিনিস তৈরি করছো, দাদু?
একটা নতুন ধরনের বুজবুজি পানীয়। ইচ্ছে করলে তুই এটা প্রথম চেখে দেখতে পারিস।
কিন্তু সাবধান, বেশী দেবার প্রয়োজন নেই! এটা এতো বুজবুজে যে বুদবুদের ফেনায় উপচে পড়বে!
বুজ বুজ
তোর মুখ দেখে আমি বলতে পারি যে, এটার স্বাদ বেশ ভালো!
দারুণ!
সত্যি দাদু, এটা চমৎকার! এখন আমি খেলতে যাচ্ছি, কিন্তু তেষ্টা পেলে খাওয়ার জন্যে সঙ্গে আরো কিছু নিয়ে যাচ্ছি।
আমি এই জিনিসটা দিয়ে বেশ মজাও করতে পারি!
হাঃ হাঃ! দারুণ মজা!
বুজবুজ!
এই যে, পুসি! তুইও এটা একটু চেখে দেখ্!
হাঃ হাঃ!
বুজবুজ!

এসব বিশৃঙ্খলা কিসের, খাঁদা! জীবজন্তুগুলোকে তুই বিপর্যস্ত করছিস! তোর কি সাহস যে আমার বুজবুজি পানীয়ের পাউডার নিয়ে তামাশা করছিস!
এসবের জন্যে শাস্তি হলো খালি পেটে গিয়ে শুয়ে পড়ো!
কে চাইছে রাতের খাওয়া? আমার রবারের ব্যাগে ঠাণ্ডা জল ভর্তি করে তাতে কিছু বুজবুজি পাউডার দিয়ে দি, এবার খিদে পেলে এই বুজবুজি পানীয় খেয়ে নেবো!
উপস! বেশী পাউডার পড়ে গেল! কিছুক্ষণের জন্যে ছিপিটা এঁটে দি!
মরেছে! ব্যাগ যে ফুলে উঠছে!
যাচ্ছিস কোথায় খাঁদা? আমি না তোকে শুয়ে থাকতে পাঠিয়েছি।
কি-কিন্তু আমি আর শোবার ঘরে ফিরে যেতে পারবো না, দাদু!
কেন পারবি না? বাপস! সাবধান! এটা কিন্তু....
দুম
পাজী! বেল্লিক! ছুঁচো! তোকে কুচো কুচো করলে তবে তোর কাজের উপযুক্ত শাস্তি হয় হতচ্ছাড়া!
অখাদ্য মার্কা পানীয়ের গুঁড়ো নষ্ট করেছি বলে বুড়ো আমার হাড্ডি একেবারে চূর্ণ করে দিয়েছে!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল হাফছুটির পর শনিবারের বিকেলটা কাটানোর কি দারুণ পথ!
খুব লায়েক হয়েছিস দেখছি! আমার চেয়ারে বসে আমার টফি খেয়ে আবার আমারই বই পড়ছিস! তোর কি দুঃসাহস রে!
তুই একটা ষাঁড়ের ডিম! ওপরে ল্যাবরেটরিতে এসে আমাকে সাহায্য কর!
হয়ে, ঠিক আছে!
এই যে—এই নে জীব জন্তুদের জন্যে আমার আবিষ্কার। পোষ্য প্রাণীদের জন্যে এটা সাংঘাতিক তেজী বড়ি।
বুঝেছি।
পরীক্ষা না করে এগুলিকে পোষ্য প্রাণীদের দেওয়া ঠিক নয়। এই যে, ঝুঁদো! একটা চেখে দ্যাখ!
আহ! মনে হচ্ছে কিছু যেন প্রতিক্রিয়া ঘটেছে!
আরিব্বাস! ঝুঁদা এখন সাংঘাতিক তেজে ভরপুর!
বলি এখানে এসব কি হচ্ছে? এতো হট্টগোল চেল্লাচেল্লি কিসের খাঁদা?

হরক! কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে! অ্যাই পালা!
ঘাবড়িও না দাদু! তোমার কাছ থেকে কুঁদোকে সরাবার উপায় আমার জানা আছে।
এই যে পুসি! তুই একটা তেজী বড়ি খা।
উরিব্বাস! এখন বেড়ালটা কি দুর্দান্ত গতিতে ছুটছে!
চমৎকার! কুঁদোটা এখন ওটার পেছনে হয়তো দৌড়তে পারে।
মরেচে! এবার যে দুটোই আমার দিকে তেড়ে আসছে!
এখন তুমি একটাই কাজ করতে পারো, দাদু!
তুমি একটা তোমার নিজেরই তেজের বড়ি খাও! আশা করি এটা তোমার ওপরও কাজ করবে!
হিঃ হিঃ! কি দারুণ মজা! দাদুর তৈরি তেজের বড়ি একেবারে জাদুর মতো কাজ করেছে! দাদু কি গতিতে যাচ্ছে দেখো।
বাঁচাও!
ভুউসস!
তেজের বড়ির তেজ কেটে যাওয়াতে দাদু এতো নিস্তেজ হয়ে পড়েছে যে, আমি তার চেয়ার, তার বই—এবং তার টফি যথাপূর্বং চালিয়ে যাচ্ছি!

ডানপিটে খাঁদু
আর তার
কেমিক্যাল দাদু
নারায়ণ দেবনাথ
উফ! রান্নাঘর থেকে খাবার ঘরটা বেশ দূরে। খাবারের থালা বাসন আনতে দম বেরিয়ে যায়।
ঠিক আছে, আমি এটাকে সহজ করে দিচ্ছি।
এই দেখ! সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় খাবার বহন করার ঠ্যালা এটা হাত দিয়ে ঠেলতেও হবে না!
চমৎকার জিনিস তৈরি করেছো!
দেখ? এই ঠ্যালা বাড়ির যেখান থেকেই সঙ্কেত পাবে, সেখানেই গিয়ে হাজির হবে।
আরিব্বাস! এতো দারুণ দরকারী জিনিস বের করেছো, দাদু!
বিপ্! বিপ্! বিপ্!
উলপ! পায়েস! আয়েস করে সবটাই একলা খেতে হবে।
আর কি করে ওটা পেতে হবে সেটা আমার জানা!
আঃ! খাবারটা আসছে!
কিন্তু খেঁদাটা কোথায়?
বিপ্! বিপ্! প্!
ওঃ! ঠ্যালাটা এখানে আসছে না!
অবাক হবার কিছু নেই! সঙ্কেত পাঠাবার যন্ত্রটাও বেপাত্তা!
হিঃ হিঃ! চলে আয়, পায়েস, খাঁদুর কাছে চলে আয়! ওঃ, দারুণ!
বিপ্! বিপ্! বিপ্!

ভেবেছিলি একাই সব সাঁটাবি? সেটি হচ্ছে না চাঁদু!
এঃ! প্ল্যানটা ভুমি ভেস্তে দিলে, দাদু!
এই অপকর্মের জন্যে তোকে পায়েস খাওয়া থেকে ছাঁটাই করা হলো এবং এর পরের একটা দারুণ খ্যাঁট তোর নট হয়ে গেলো!
অহ্!
বিপ! বিপ! বিপ! বিপ!
একটা সুখাদ্য খাওয়া চোট হয়ে গেলো, মোট কথা হলো পরেরটা আর বেহাত করছি না!
এবারে আর ফস্কাচ্ছি না। এবার পাবো আর খাবো!
আরে! সঙ্কেত পাঠাবার যন্ত্রটা আবারও দেখছি উধাও! ঠিক আছে, আমিও এই যন্ত্রটা তৈরি করেছি ওটা বের করতে সাহায্য করবে বলে!
খাসা! খাবার তো দেখছি ঠ্যালাতেই ঠাসা! আমি আমার ঘরে ফিরে গিয়ে সঙ্কেত যন্ত্রটাকে চালু করি।
দারুণ খাবার! এবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মৌজ করে খাওয়া শুরু করা যাক—
বিপ! বিপ! বিপ!
হাঁকপাক করে আর কোন লাভ নেই খাঁদু! আমি এই আলমারিটার ভেতরে ছিলাম। তোর খেল খতম—
এবার শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত আর মুখের খেল দেখে যা!
ওফ্!

শুঁটকি আর মুটকি

শুঁটকি আর মুটকি

১৯৬৪ সালে (১৩৭১) দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশ পায় শুঁটকি আর মুটকি নামে দুই মানিকজোড় ছোটো মেয়ের মজার কীর্তিকলাপ। দুই-তিন বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশের পর পত্রিকা দপ্তরে করা মেয়েমহলের আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

শুঁটকি
আর
মুটকি
তোয়ালেতে কি করছ মা ?
যার যার নাম লিখে রাখছি তোমাদের।
যে যার তোয়ালে ব্যবহার করবে। কেউ কারওটা ছোঁবেনা
মা নামগুলো এত ছোট্ট করে লিখেছ যে বোঝাই যায়না। আর তাহলেই তো যত গণ্ডগোল হবে।
আমার তোয়ালেটা দেওতো।
এই শুঁটকি! তোর বাবার তোয়ালেটা দিয়ে যা তাড়াতাড়ি

তুই ঘর থেকে মোটা বুরুশটা নিয়ে আয়। আমি ঠিক করে লিখে দিচ্ছি।

দেখ এবার কেমন দূর থেকেই পড়া যাবে।
শুঁটকি

এইযে বাবা! তোমার তোয়ালে। তুমি আজ খুব ব্যস্ত বুঝি ?
হ্যাঁরে, আজ অফিসের বড় দেরী হয়ে গেল।

এই যাঃ! বাবা লেখাটাকে একেবারে ধেবড়ে দিলে।
ওঃ! আজ আমাকে উড়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

এটা অফিস! সং সাজবার জায়গা নয়!

বৈশাখ ১৩৭২ ১৯৬৫

যা, এক্ষুণি ওকে বাড়িতে রেখে আয়! দুটোতে একেবারে জ্বালিয়ে মারলে!

এই যাঃ! দড়ি ছিঁড়ে গেল বাবা!
ধরো ওকে! ধরো শিগগির!
ঘেউ!

ওঃ! এই শুঁটকি মুটকিটাকে সঙ্গে নিলেই একটা না একটা ঝামেলা ঘটাবে!

গাড়ি চালিয়ে তুমি বাবার সঙ্গে রেস দাও মা, তাহলে বেশ মজা হবে!
গেলুম! গেলুম! ওকে আমি থামাতে পারছিনা যে!

পাঁচ মাইল যাওয়ার পর।
দেখ মা! বাবা কি সুন্দর পিকনিকের জায়গা খুঁজে পেয়েছে!
বুড়োর জন্যেই এমন সুন্দর জায়গা পেয়েছ, না বাবা! নাও, সন্দেশ খাও!

শুঁটকী আর মুটকি

মা! আমরা বাজার করে আনি?

বেশ! এই ফর্দ্দ দেখে সব কিছু এনো।

বাজার করাটা ভারী মজার ব্যাপার, নারে?

ও: কি বরাত জোর দোকান খুলতে না খুলতেই খদ্দের!

বিস্কুট, বেবী ফুড, সাবান স্নো....

বেশ, বেশ! সব দিচ্ছি। আগে বিস্কুটটা দি।

এই ফুড্‌টা খুব ভালো। আমিই বার করে নিচ্ছি।

আরে, আরে, সর্বনাশ করলে রে!

এই মুটু : এখানে কি চমৎকার টম্যাটো রয়েছে।
এই! ওতে হাত দিয়োনা সব নষ্ট হয়ে যাবে।
?
?
ফ্যাচ!
পাকা টম্যাটো
পাকা টম্যাটো

কিচ্ছু লজ্জা নেই : ওরকম হয়ে থাকে। গা-টা মুছে ফেলুন। আমরা ততক্ষণ আপনার বিজ্ঞাপনের কার্ডগুলো বাইরে টাঙিয়ে দি। অনেক খদ্দের আসবে।
মহাসুগন্ধি সাবান
অতি পুষ্টিকর খাদ্য
আবার কি ব্যাপার দোকানের বাইরে অতো হাসির ধুম কেন ?

অফুরন্ত ভাণ্ডার
এতে-যসবার কি আছে বলতো ?
কে জড়ের মহাসুগন্ধি সাবান
সকালে চায়ের সঙ্গে খেতে উপাদেয়
প্রফুল্ল রাখবে
চ্যাং এর চা ব্যবহার করুন
আপনার চুল ঝকঝকে হবে
আপনার ত্বক পরিষ্কার রাখবে
ঘোষের বিস্কুট
নিকালো! এক্ষুনি নিকালো আমার দোকান থেকে।
লোকটা কিরে গুঁটু! এত উপকার করলুম... চ অন্য দোকানে যাই।

১৩৭২ কার্তিক ১৯৬৫

শুঁটকি আর মুটকি
মুটকি! আমার রেকর্ডগুলি এনেছি!

আমার ভাইটাকে ওর ভেতরে খেলা দিয়ে আটকে রেখেছি! গণ্ডগোলের ভয় নেই!

উঃ!
ঠকাস!
ইঃ!

ওরে বাবা! কান ঝালাপালা হয়ে গেল! দাঁড়া ওকে বার করে দি!
অ্যাঁ-অ্যাঁ!

ওঃ! আমার প্রিয় রেকর্ডগুলি!

এই মরেছে! এযে এবার রেকর্ড ঘোরবার চাকতির ওপর উঠে বসলো!

সেই তখন থেকে একটা গানও শুনতে পেলুম না! দাঁড়া, ওকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে রাখার একটা বুদ্ধি বার করতে হবে!

এবারে শান্তি!

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান

এই নতুন সিরিজটি নারায়ণ দেবনাথ শুরু করেছিলেন কিশোর ভারতীর পাতায়। ওই পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (কার্তিক ১৪৭৬, নভেম্বর ১৯৬৯) আত্মপ্রকাশ পটল চাঁদ জাদুকর। ম্যানড্রেকের মতোই সে হাত ঘুরিয়ে সম্মোহনের মায়াজাল ফেলে আবার প্রয়োজন সাধারণ কার্পেটকে উড়ন্ত গালিচাতেও বদলে দেয়। আবার জাদুর প্রভাবে মানুষের মনেরও পরিবর্তন ঘটায়। কিশোর ভারতীতে পটলচাঁদ আবির্ভূত হয়েছিল ওই একটি সংখ্যাতেই। পরবর্তী সময়ে পক্ষিরাজ পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান, এই পত্রিকার প্রথম বছরেই (১৩৮৫/১৯৭৮) দুই রঙে ছাপা হয়েছিল পটলচাঁদের চিত্রকাহিনি। প্রায় দশ বছরের ব্যবধানে পটলচাঁদের চেহারাতে কিন্তু এসেছিল পরিবর্তন।

পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান • নারায়ণ দেবনাথ

সব ঠিক আছে। তোমার বাবা এসে দরকারী বাক্সটা নিয়ে স্টেশনে ফিরে গেছেন। তোমার ফিরে আসার দরকার ছিলনা।
কি বলছো তুমি? আমার বাবা তো কবেই মারা গেছেন! আমার অবর্তমানে তোমরা কি করেছো?
গুবলেট করে ফেলেছো পটলদা! আপনার ড্রেসিং টেবিলের ওপরে যে বাক্স ছিল তাতে কি ছিল?
ঘরের ভিতরে
আমার বোনের বিয়ের গয়না ওতে ছিল, ওটা এখান থেকে হাওয়া! তোমরাই ওটা চুরি করতে কাউকে সাহায্য করেছো!
পটলদা, ও লোকটা এক নম্বরের চিটিংবাজ চোট্টা! তোমায় ওকে ধরতেই হবে, নাহলে তুমিও সমান দোষী হবে!
ঠিক বলেছিস! ব্যাটা খুব বেশী দূর যেতে পারেনি। কিছু যাদুই খেল লাগাই — হিং টিং ছট, ওঠো চটপট!
এটা কি হচ্ছে পটলাদা?
গেছিরে!
ধরে থাক। ওর চেয়ে বেশী স্পীডের বাহনের দরকার আমাদের বুঝলি?

ভয়ের কোন কারণ নেই! কিন্তু বিটকেলটা গেল কোন দিকে?

একটু পরই
ঐ যে হতচ্ছাড়াটা যাচ্ছে
তুমি ওকে এখন কি করবে পটলদা!

দ্যাখনা, ওর লোভ দিয়েই ওকে কুপোকাৎ করে দেবো!
ক্লিং ক্লিং ক্লুক্, আমি যা দেখাতে চাই তাই ও দেখুক!

পরক্ষণেই
আই রে বাপ!
পাত্রভর্তি মণি মাণিক্য! এ যে বিশ্বাসের অযোগ্য—কিন্তু সত্যিই তো রয়েছে! শুধু তুলে নিলেই হয়। মিছিমিছি সামান্য গয়নার জন্যে এত কষ্ট করলুম!

প্রথমটাকে ধরতেই
হাওয়া! যানে দেও— সামনে অনেক রয়েছে।
ফুস্!

১৩৭৬, কার্তিক ১৯৬৯

ভাদ্র ১৩৮৫ ১৯৭৮

ভাদ্র, ১৩৮৫ ১৯৭৮

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান
নারায়ণ দেবনাথ

পটলচাঁদ তার একান্ত ভক্ত কুঁতেরামকে সঙ্গে নিয়ে একদিন যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো ঠিক তখন...
দেখো পটলদা! ঐ ছোট্ট মেয়েটা এখুনি ঐ গাড়িটার তলায় চাপা পড়বে!
ওর মা ওকে লক্ষ্য করে নি! এখুনি আমাকে কিছু জাদু প্রয়োগ করতে হবে—এবং তাড়াতাড়ি!

বাচ্চার ওপর কোন জাদু প্রয়োগ করবো না। তাতে ও ভয় পাবে! আমি শুধু মানবাহনের ওপর এটা প্রয়োগ করবো!

পরক্ষণেই মেয়েটি ছাড়া রাস্তার সব কিছু মৃতবৎ অচল হয়ে গেলো!
আগহ্! কি হলো—আমি তো ব্রেক ছুঁই-ই নি!
এ কী! গাড়ি গীয়ারে রয়েছে তবু নড়তে পারছি না!

কুঁতে, ওকে পেয়েছিস? বেশ! এবার মানবাহন চলুক!
কী স্বস্তি পটলদা! এবারে ওকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসি!

ওঃ, তোমরা যদি না দেখতে, টিলকি তবে গাড়ির নীচে গিয়ে যেতো। কিন্তু আমি বড়ই ক্লান্ত বলে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম।

বেশী টাকার লোভে ঘরের মালিক জোর করে ঘর থেকে আমাদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তারপর থেকে শুধুই আশ্রয়ের জন্যে ঘুরছি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না।

খুবই বিশ্রী ব্যাপার! আমি নিশ্চিত যে অনেক লোক আছে সাহায্য করার, শুধু যদি তারা টিলকিদের দুর্দশার কথা জানতে পারে। আমি তাদের সে কথা জানাবো!
ঠিক কথা! কিন্তু কি করে তুমি সেটা করবে?

পটলচাঁদ দ্রুত চিন্তা করলো, এবং তারপর...
সবাইকে জানাবার এটাই ঠিক জায়গা—ক্লিং ক্লিং ক্লুক, আমি যা দেখাতে চাই সবে তা দেখুক!

কার্তিক, ১৩৮৫ ১৯৭৮

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান

নারায়ণ দেবনাথ

এই যে কুঁতে, তোদের দুধটা নিয়ে যা। আজ আমি একটু ব্যস্ত কারণ আমি... ওওপস!

একটা বিচ্ছিরি দুর্ঘটনা। কিন্তু পটলচাঁদ চকিতে ভালোভাবে নামার জাদু প্রয়োগ করলো।

থাম ওরে থাম— ভালোভাবে নাম!

এবং

বাপরে! আমি এটা ম্যানেজ করলুম কি করে? আমি তো দেখেছি ভেল্কি দেখানোর কাজ পেতে পারি!

ওঃ! তোমাকে ধন্যবাদ পটলদা! ভেকুদা এমনিতে খুব ভালো কিন্তু অপটু— তবে মনে হয় ওর এখন সত্যিই খুব তাড়া আছে!

সেদিন দুপুরে
পটলদা, তুমি ভেকুদাকে তোমার জাদু দিয়ে সাহায্য করবে বলেছিলে, ও কিন্তু এখন ব্যাট করতে যাচ্ছে।
হ্যাঁ, নিশ্চয় করবো।
কিন্তু কি ভাবে করবো? আমি যে ক্রিকেট খেলার বিষয়ে আনাড়ি এটা তো আর ভূঁতেকে বলে নিজের প্রেস্টিজ ঢিলে করতে পারি না, কাজেই —

আমি ব্যাটটার ওপরেই জাদু প্রয়োগ করি ওটাই ওর কাজ করবে!

ভেকু ক্রিকেটে গিয়ে দাঁড়াতে বিপক্ষ দলে হাসাহাসি শুরু করলো
বেচারা ভেকু! ও তো পয়লা বলেই আউট!
একেবারে নিশ্চিত! আর ওই ওদের শেষ ব্যাটধারী!

কিন্তু ভেকু বল মারার জন্যে ব্যাট তুলতেই ওটা যেন ওর হাতে জ্যান্ত হয়ে উঠলো, এবং...
?
ঠকাস!
বাপরে! বল যে ছক্কার জন্যে যাচ্ছে!

কিন্তু
যাঃ! ভেকুর ছক্কা ফক্কা হয়ে গেলো!

লজ্জায় লাল হয়ে ভেকু মাঠ ছেড়ে গেলো
মরেছে! ভেকুকে—ইয়ে—মানে তুলতে হলে আমাকে অন্য রকম কিছু ভাবতে হবে!

পটলচাঁদের সুযোগ এসে গেলো যখন সে বিরতির সময় ডেকুদের দলের অধিনায়ককে কথাবার্তা বলতে শুনলো . . .
কাকে প্রথম বল করতে পাঠাচ্ছো, বন্ধু ? আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয় দ্যোতনকে ?
পটলচাঁদ খুশিমতো বলাবার জাদু প্রয়োগ করলো . . .
ক্লিং ক্লুং ক্লুক আমি যা বলাতে চাই তাই ও বলুক।
না না, ভাবছি ডেকুকে একটা সুযোগ দেবো।
কী? কিন্তু সে জীবনে কোনদিন বল করে নি !
জোরে জোরে করে বল, ভেঙে দাও বিপক্ষের মনোবল।
পটলচাঁদের জাদু কাজ করলো চমৎকার, কিন্তু . . .
যেখানে সেখানে বল ফেলছে যে !
ডেকুর বোলার হওয়ার ইতি।
ছ'টা বল ছ'টাই বাইরে ! নির্ঘাত আমার কিছু হয়েছিলো, তাই তোর হাতে বল তুলে দিয়েছি ! এবার যা বাউণ্ডারীতে গিয়ে দাঁড়া, যাতে আর কোন ক্ষতি করতে না পারিস !
শিগগিরই বিপক্ষ দলের শেষ খেলোয়াড় এলো, তাদের জিততে তখন মাত্র দু'রান বাকি। পটলচাঁদ দ্রুত চিন্তা করলো।
আমি যদি ডেকুকে দিয়ে একটা সত্যিকার দারুণ ক্যাচ ধরাতে পারি, তাহলে ও হয়তো ম্যাচ বাঁচাতে পারে ! যাই হোক না কেন ডেকু, তুমি পরের বলটা লোফো !

চৈত্র ১৩৮৫ ১৯৭৯

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান
নারায়ণ দেবনাথ

পটলচাঁদ একদিন কুঁতের বাড়ি এসে...
আরে, কুঁতে... এসব কিরে?
ওঃ, এই যে পটলদা। আমি কিছু ছোটকেক তৈরির চেষ্টা করছি— কিন্তু আমি আগে এসব কখনো করিনি। এবং ঠিক কোত্থেকে শুরু করতে হয় তাও জানিনা।

আগামী কাল আমাদের স্কুলের মুক্তাঙ্গন অনুষ্ঠান, আর সেই অনুষ্ঠানে আমি অতিথিদের কিছু খাইয়ে তৃপ্তি দেবার প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি সামর্থের চেয়ে বেশী ভার নিয়ে ফেলেছি!

পটলচাঁদ সাহায্য করতে এগিয়ে এলো
এটা আমার ওপর ছেড়ে দে কুঁতে— আমি ভালো কেক তৈরি করতে পারি! দ্যাখ্— হাত না লাগিয়েই করছি!
হিং টিং ছট্, লেগে যা ঝটপট!

ঠিক আছে কুঁতে— তুই চামচেটা শক্ত করে ধরে থাক আর আমি ঘূর্ণী জাদুতে গামলাটা ঘোরাই!
হিঃ হিঃ! এযে ইলেকট্রিক মিশ্রণকারীর চেয়ে অনেক ভালো পটলদা!
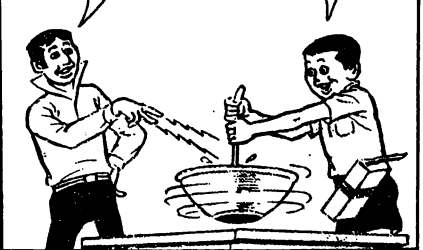
এই রে, বেকিং পাউডার একটুও নেই!
বেকিং পাউডার? দাঁড়া আমি একটা জিনিস ওতে দিয়ে দিচ্ছি!

ও-ওতে কি আছে পটলদা?
এ আমার এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর দেওয়া একটা তরল পদার্থ। এর এক ফোঁটা তোর কেকের মিশ্রণে মেশালে কেক একেবারে পালকের মতো হাল্কা হবে

১৩৮৬, আষাঢ় ১৯৭৯

শুকতারা ১৩৮৬ ১৯৭৯

১৩৮৬, শ্রাবণ ১৯৭৯

পটলচাঁদ
দ্য
ম্যাজিসিয়ান
নারায়ণ দেবনাথ

ম্যাজিসিয়ান 'পটলচাঁদ সব সময়েই চেষ্টা করে তার ম্যাজিক দিয়ে সকলের উপকার করতে। একদিন সকালে···
উফ্‌! মিনিট দশেক জিরিয়ে নি কেলো — চল্‌ ভ্যানে গিয়ে বসা যাক।

আশ্চর্য! ঐ দুজন বৃদ্ধ এই ভারী ভারী আসবাব ঘরে তুলছে! ওরা যতক্ষণ বিশ্রাম করছে ততক্ষণ আমি ওদের কিছু সাহায্য করি।

ইন্তি, মিন্তি, মাও, লোহা, কাঠ নরম হয়ে, হেঁটে ঘরে চলে যাও!

ঠিক নিজের জায়গাতেই ও যাচ্ছে!

এবার বাকীগুলো। কিন্তু ওরা না শুনতে পায়।

এই তো! সোফা··· টেবিল···আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এর আগে কেউ এতো তাড়াতাড়ি কিছু নাড়ানাড়ি করতে পারে নি!

আমি এই মালপত্র সরানোর লোকদের বলি যে, তাদের কাজ আমি করে রেখেছি! ওরা খুব অবাক হয়ে যাবে!

কিন্তু বাইরে, বাড়ির মালিক এসে হাজির।
বলি ব্যাপারটা কি? আমি তোমাদের দুজনকে টাকা দিয়েছি আমার বাড়ি থেকে আসবাবগুলি অন্যত্র নিয়ে যেতে ··· আর তোমরা এখনো হাতই লাগাও নি!
কি-কিন্তু— আমরা যে এইমাত্র কাজটা শেষ করেছি!

অ্যাই মরেচে! ওরা ঐ আসবাবগুলো বাড়ির বাইরে নিচ্ছিলো, ভেতরে রাখতে নয়!

মরিয়া হয়ে পটলচাঁদ আবার ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়লো।
ওদের দেখো না দিয়ে ওগুলি আমাকে সরাতে হবে, তাই এবার উড়িয়ে বের করতে পারবো না। এখন কি ভাবে এটা করবো? আমি জানি!
ট্রে···থাকো বড়ো! আর সব ক্ষুদে হও যতোখানি পারো!

আমি সমস্ত সংগ্রহ করে, চুপিসারে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো। ওরা এখন যে কোন মুহূর্তে এখানে চলে আসতে পারে!

তারা এলো!
এখানেও নেই! তোমরা আমার আসবাবগুলি কি করেছো?
আমরা ওগুলি বাইরেই নিয়েছিলাম, স্যার! এখন শুধু চিন্তা করতে পারি

এদিকে ভ্যানে···
সব করে ফেলেছি! এখন···একটা যার যা আকার ফিরে পাওয়ার জাদু প্রয়োগ!

আ- আমি কি ভেল্কি দেখছি! ভ্যান তো মালে ভর্তি হয়ে আছে!
হ্যাঁ, আর এ রকম ভালো কাজ করার জন্যে আমরা পুরস্কার পেতে পারি!

শ্‌শ্‌শ! একটা কথাও না! ক্ষুদে এই উপকার বিভ্রাটের কথা শুনতে পেলে ভয়ানক পেছনে লাগবে— অতএব চুপ!

১৯৭৯ সেপ্টম্বর

পেটুক মাস্টার বটুকলাল

পেটুক মাস্টার বটুকলাল

পেটুক মাস্টার বটুকলাল প্রকাশিত হয়েছিল পাক্ষিক 'কিশোরমন' পত্রিকায়। কিশোর মনের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় (১ মে, ১৬ মে, ১ জুন, ১৫ জুন, ১৯৮৪) প্রকাশিত হয়েছিল বটুকলালের চারটি গল্প। ধারাবাহিক চরিত্র হিসেবে এটিই নারায়ণ দেবনাথের সর্বশেষ চরিত্র। শিরোনামেই বটুকলালের চরিত্রের আঁচ পাওয়া যায়। রসুইখানা থেকে চুরি করে ছাত্রদের থেকে জোর করে কিংবা আরও কিছু অন্যায় পদ্ধতিতে সে খাবার সংগ্রহ করে। কিন্তু অন্যায়ভাবে আদায় করা সেই খাদ্য সে ভোগ করতে পারে না। গল্পগুলিতে আরেকটি নিয়মিত চরিত্রও আছে, স্কুল বোর্ডিং-এর দারোয়ান। তার চরিত্রেও বটুকলালেরই ছায়া। একটি গল্পে অবশ্য ও তিন ছাত্রকে সাহায্য করেছিল। ওই তিন ছাত্র রয়েছে সব গল্পেই। গল্পের শেষ হাসি হাসবে ওই তিন খুদেই। ধারাবাহিক চরিত্র হলেও খুব বেশিদিন এই চরিত্রগুলিকে পাঠকদের সামনে হাজির করেননি শিল্পী।

পেটুক মাস্টার বটুকলাল
নারায়ণ দেবনাথ
কড়া নিষেধ! কেক, টফি, চকোলেট এসব স্কুলে আমদানি চলবে না! সব এই ব্যাগে ফ্যালো!
বাহ্!

ছেলেদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া খাবারে ভর্তি থলি নিয়ে ঐ তো বটুক মাস্টার!

থলিটা আমার এই কাপবোর্ডে রেখে ঘরে চাবি লাগিয়ে দি! হেঃ হেঃ! কি দুর্দান্ত ভোজ হবে!

কোন উপায় নেই বন্ধুরা! আমাদের খাবার আর ফিরে পাবো না! বটুক স্যার ওগুলি কাপবোর্ডে রেখে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে।

ওটা কোন সমস্যা নয়! আমরা দারোয়ানের মই হাতিয়ে বটুকস্যারের ঘরের জানালা গলে ভেতরে ঢুকবো।

এই মরেছে! দারোয়ানও একই ধান্দায় রয়েছে রে!

হিঃ হিঃ! আমি নিশ্চিত বলতে পারি বটুকমাস্টার সমস্ত খাবার ওর কাপবোর্ডে রেখেছে!

জলদি! ওর মইটা সরিয়ে নে! আমরা ওকে আমাদের খাবার নিয়ে ভাগতে দিতে পারি না!

গেছি রে!
মারো টান!
ওয়াহ্!
মড়াৎ!
হেডমাস্টার আমাকে দেখা করতে বলেছেন, কিন্তু আমি এখন ঝট করে আমার ঘরে খাবার চাখার জন্যে যেতে পারি!
টওফ!
বাঁচাও!
এখানে আমার কাজ শেষ...এবার ডিপোয় ফিরে যাবো।
ইর্‌র্‌র্‌ক!
দমাস্!
স্কুলের মালপরিবহন
থামাও! বাঁচাও! আমাদের নেমে যেতে দাও!
হিঃ হিঃ! এবার আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের জিনিস আমরা খাবো! গাড়ির চালক বদ্ধ কালা আর কোথাও না থেমে কুড়ি মাইল দূরে ডিপোয় যাবে।

পেটুক মাস্টার
বটুকলাল
নারায়ণ দেবনাথ
আঃ-হা! ঐতো বটুকমাস্টার জানালা দিয়ে ছেলেদের খাবার হাতাবার জন্যে যাচ্ছে!
বটুকস্যারের টিকিও দেখা যাচ্ছে না রে, বুচে!
চল সবাই! একবার ভেতরে নিয়ে যেতে পারলে এই চকোলেটের বারগুলো ভাগ করে নেবো।
স্কুলে খাবার নেওয়া নিষিদ্ধ—তাই আমি এই চকোলেটের বাক্সটা নিয়ে নিলুম!
হেঃ হেঃ! আমার প্রিয় জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে চকোলেট!
দমাস!
ধ্যাৎ! বাক্সটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো!
ভাইসব! আমি যা দেখেছি তোরা কি তাই দেখেছিস?
জলদি! চকোলেট বারগুলো পকেটে লুকিয়ে ফ্যাল!
বাহ! স্যার যাতে চকোলেট নিতে না পারে সেজন্যে বাক্সটা দেয়াল টপকে ফেলে দিলো!
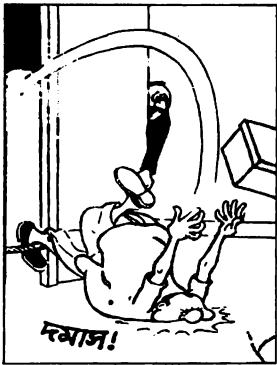
আমাকে ওটা উদ্ধার করে আনতে হবে!
যদি আমাকে আদ্ধেক দেন তাহলে বাক্সটা খুঁজতে আমি আপনাকে সাহায্য করবো!
ঠিক আছে! ওটা এই মাটির চাঙড়ের মধ্যেই আছে!
রাস্তা মেরামত
ওটা গেলো কোথায়?
ওটা এখানেই কোথাও আছে!
হুঁম্মুফ!
এটা কি হচ্ছে?
বাঁচাও!
গেলুম!
গাড়ি বোঝাই হয়ে গেছে! চলো এবার যাওয়া যাক!
গররর!
খাওয়া শুরু করো, বন্ধুরা! হেডস্যার আর দারোয়ান সহজে ফিরছে না!
হোঃ হোঃ! আজ আর পড়াশোনাও নেই!

পেটুক মাস্টার বটুকলাল
নারায়ণ দেবনাথ
কুলশ্রঙি-এর পাকশালা
দারুণ! এই হাত সাফাই করা জ্যাম স্পঞ্জ রোলটা আমার ঘরে লুকিয়ে রাখি পরে রসিয়ে খাবো!
এই যে দারোয়ানজী! বটুকস্যার এইমাত্র খাবারঘর থেকে ইয়াব্বড়ো একটা জ্যাম রোল হাতিয়ে নিয়ে এলো। এসো আমরা আবার ওটা ওর কাছ থেকে হাতিয়ে নি!
আমার একটা ভালো মতলব এসেছে! এই পুরোনো চেয়ারের এক টুকরো ফোম-রবার আমার প্রয়োজন...
এবার অতি জোরদার গঁদের আঠার মধ্যে আমি লাল রং ঢেলে দিলুম।
গঁদ
হিঃ হিঃ! এবার এটাকে দেখতে ঠিক জ্যাম স্পঞ্জ রোলের মতন হয়েছে!
তাড়াতাড়ি করো! বটুকস্যার শিগগির তার ঘরে ফিরে আসবে!
ঠিক আছে! আমিও কাজ সেরে ফেলেছি।
বটুকলাল
ঐ জ্যাম রোলে এবার আয়েস করে কামড় বসাবো!
আগহ্!
আলপ্! আরগহ্! আমার চোয়াল জোড়া লেগে গেছে!
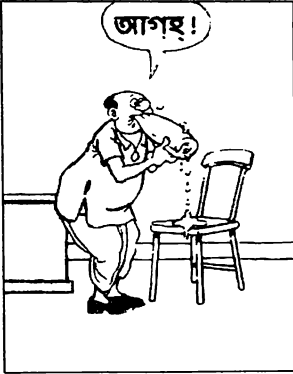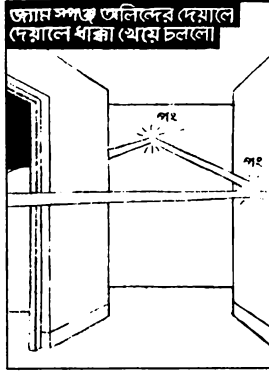
বাহ্! আমি প্রতারিত হয়েছি!
বটুকলাল
জ্যাম সপাত্ অলিন্দের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চললো
পং
পং
পং
ইঁয়োক!
ঠপ!
ওদিকে বটুকলাল তার চেয়ারে আটকে গেছে...
গরররর!
চেয়ারটাকে পাইপটার সঙ্গে বেঁধেছি। এবারে টেনে আমাকে ছাড়াতে পারবে।
বাহ্! আমি বাজী রেখে বলতে পারি এ কাজের কাজী বটুকলাল।
ওফ!
সড়াৎ!
হোঃ হোঃ! বটুক বাবু এখন খুবই ব্যস্ত থাকবে। এই মওকায় খেয়ে নাও, ছেলেরা!

পেটুকমাস্টার বটুকলাল
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল বোর্ডিংএর রান্নার লোক দরজা খুলতে আসছে না।
আপেল! আমি আপেল ভীষণ ভালোবাসি।
তাতে কিছু এসে যায় না। আপেলের বস্তাটা দরজার কাছে রেখে গেলেই হবে।
আরিব্বাস! মালপত্র দেবার লোকটা একথলে আপেল অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেছে!

রান্নার লোক আসার আগেই এগুলো সরিয়ে ফেলি।
দারুণ! কি চমৎকার খাওয়া হবে আজ!

এটা কাঁধে তুলে নি।
ধমাস!

গরর! ওই আপেলগুলো আমাকে ফেরত দিন বটুকবাবু!

মাইরি আরকি! আপেল শুদ্ধু বস্তা অতো সস্তা নয়, দারোয়ান মশাই! আমাকে যেতে দাও বলছি!

ধ্রাম!
ফড়াৎ!
আরিব্বাস! আপেল রে মাইরি!

গর্‌র্‌! এটা তোমার জন্যে হলো! ওরা আপেল নিয়ে দিব্যি সরে পড়লো।

পাজি বদমায়েশগুলো গেলো কোথায়?
এখানে বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে

ঐতো–ওরা আসছে!

জলদি– নিচু বেড়াটার ধার দিয়ে মাথা নিচু করে চলো। সব কটাকে দুজনে দুদিক থেকে চেপে ধরবো!

এ-এটা কী? আমি আটকে গেছি!
হরক!

...এবার পাইপের এই অংশটাকে ঝুলিয়ে সঠিক জায়গায় নিতে হবে।

বটকস্যার আর দারোয়ানের জন্যে চোখ খোলা রাখ– ওরা ধারে কাছেই ঘাপটি মেরে আছে।

আগহ্‌!
!
আমাদের নামতে দাও!
হিঃ হিঃ!
বন্ধুগণ! এবার তোমরা বেশ মন লাগিয়ে আপেলের সদ্ব্যবহার করো।
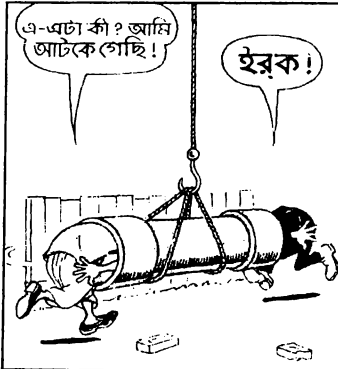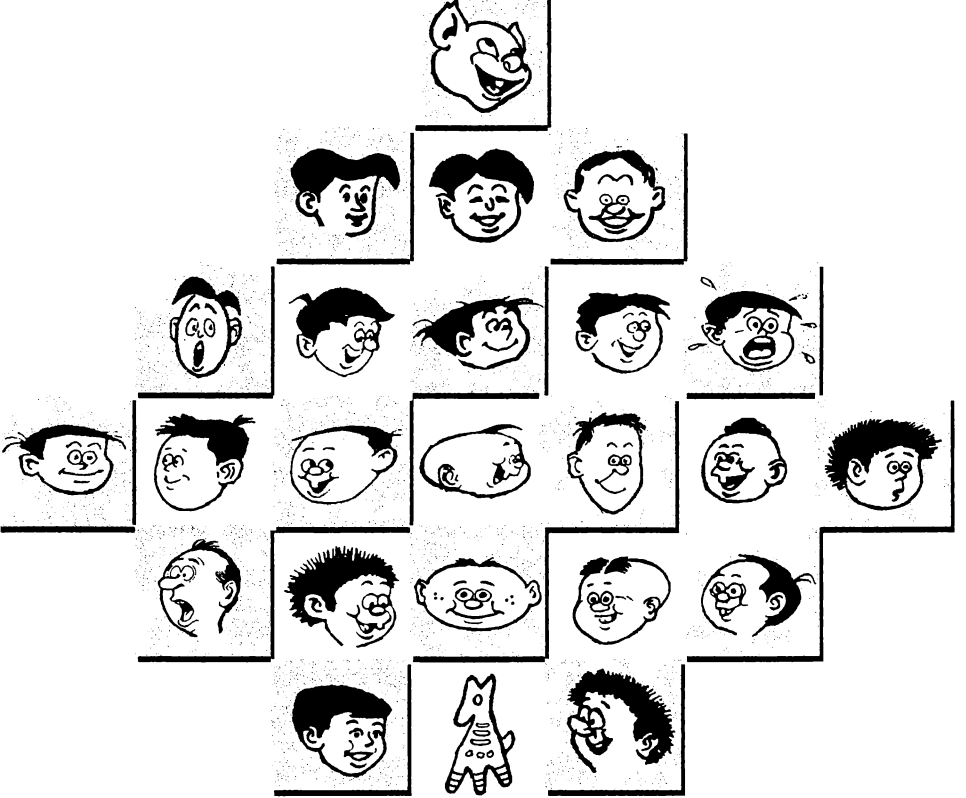
হরেকরকম মজার গল্প

শুকতারার পাতায় আগেই শুরু করেছেন বাঁটুল, হাঁদা ভোঁদার মজার কাণ্ডকারখানা। এর পরেই দেবসাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীর পাতায় নারায়ণ দেবনাথ হাজির করলেন নতুন নতুন চরিত্রদের নিয়ে মজার কমিক্স। চার পাতায় সম্পূর্ণ এই কাহিনিগুলোর নায়ক, বালক কিশোররাই। ষাটের দশকের প্রথম ভাগে শুরু হয়েছিল এই চিত্র কাহিনিগুলি। এর পরে প্রায় কুড়ি বছর ধরে প্রতি বছর পূজাবার্ষিকীর পাতায় নারায়ণ দেবনাথ এঁকেছেন মজার মজার গল্পগুলি। যেসব ছবিতে গল্প দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল ''যেমন কর্ম তেমনি ফল" (অলকানন্দা, ১৩৬৯) ''সবেতে সর্দারি" (শ্যামলী), ''বাঁদরামির ফল হাতে হাতে" (উত্তরায়ণ ১৩৭১), ''আচ্ছা জব্দ" (নীহারিকা, ১৩৭২), ''চালাকির ফল হাতে হাতে" (অরুণাচল, ১৩৭৩), ''অতি লোভের সাদা' (রেণুবীণা, ১৩৭৪), ''নন্দীর ফন্দী" (ইন্দ্রনীল ১৩৭৫), ''নেপালের কপাল" (শুকশারী ১৩৭৬), ''ক্যাবলার কীর্তি (মণিহার, ১৩৭৭) ''ওস্তাদির খেসারত" (উদ্বোধন, ১৩৭৮), ''লাল মানেই বিপদ" (পূরবী ১৩৭৯), ''গুটকের ডাক্তারী" (তপোবন ১৩৮০), ''গুণধর গনু (মনিদীপা, ১৩৮১), ''বুদ্ধিমান দুঃখরাম" (বলাকা, ১৩৮২), ''পুটিরামের নারকেল" (আগমনী, ১৩৮৩), 'বোঁচার বরাত" (মন্দিরা ১৩৮৪), ''যদুবাবুর মধুর চাক" (চন্দনা, ১৩৮৫), বুদ্ধুর বুদ্ধি (প্রভাতী, ১৮৭), (বোধন, ১৩৮৮), ''কেলোর কীর্তি" (দেবায়ন, ১৩৮৮) ''টকাই ঢোলের খ্যাঁটে গোল" (আরাধনা, ১৩৮৯) ''ঝানু ছেলে কানু" (বিভাবরী, ১৩৯০)

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মজার গল্প তৈরি করেছেন অন্যান্য পত্রিকা যেমন— পক্ষিরাজ, কলকাকলী ইত্যাদির জন্য। অধুনা লালমাটি প্রকাশনার জন্য, অঙ্কন প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি মজাদার গল্প তৈরি করেন। ''সবার সেরা লালমাটির ঘোড়া" নামে ২০১১ জানুয়ারিতে।

অলকানন্দা ১৩৬৯ ১৯৬২

অলকানন্দা ১৩৬৯ ১৯৬২

এখানে রাখলে খুঁজে পাবে না!
যাই এবারে মজা করিগে!
ভাই কাটুর কুটুর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, তোমাদের থেকে কিছু বাদাম দাওনা।
কাটুর কুটুর বাদাম আনতে গেল। কিন্তু গর্তে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল–
নেই!
নেই!!
এখানেও নেই!!!
সব বাদাম চুরি যাওয়াতে কাটুর কুটুর-বউ কাঁদতে লাগল। বড় কাটুর কুটুর তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।
দেখ বাবা ডাব্বুটা কেমন হাসছে। ওর যেন খুব মজা লাগছে।
ডাব্বুটাকে ফিক ফিক করে হাসতে দেখে কাটুর কুটুরদের সন্দেহ হল। তারা রেগে গিয়ে তাকে বলল।
তুমি অমন হাসছ কেন?
যদি নিয়ে থাকো তো ফেরৎ দিয়ে দাও

অলকানন্দা ১৩৬৯ ১৯৬২

শ্যামলী ১৩৭০ ১৯৬৩

শ্যামলী ১৩৭০ ১৯৬৩

শ্যামলী ১৩৭০ ১৯৬৩

শ্যামলী ১৩৭০ ১৯৬৩

উত্তরায়ণ ১৩৭১ ১৯৬৪

উত্তরায়ণ ১৩৭১ ১৯৬৪

একি! আমাদের টেকো, অঙ্কের স্যারের পেছনেও যে পুলিশ ধাওয়া করেছে!
POLICE

কী আশ্চর্য কাণ্ড! গদা কাকাকেও!

আরে! এযে ঘন্টার বাবা! বুঝেছি— পুলিশ সন্ধান চাই বিজ্ঞাপনের ছবি গুলি দেখেছে---
হাঃ-হাঃ! কি মজারে বাবা!

POLICE থানা
হিঃ-হিঃ-হিঃ! গারদ খানায় কেমন লাগছে আপনাদের? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

উত্তরায়ণ ১৩৭১ ১৯৬৪

আচ্ছা জব্দ

খপ্প খপ্প!

চিলে কোঠায় কিসের যেন শব্দ হচ্ছে ?

নীহারিকা ১৩৭২ ১৯৬৫

নীহারিকা ১৩৭২ ১৯৬৫

সিপাই দাদা! আমায় ফেলে যেওনা, আমায় গেরেপতার করে নিয়ে যাও।
হিঃ! হিঃ!
হিঃ! হিঃ! এবার এদিকে একবার দেখি।
ছেলেটার গলা দেখছি রেলিঙয়ে আটকে গেছে।
ব্যা-ব্যা-ব্যাঘ্র!

কে কোথায় আছো বাঁচাও!
হাঃ! হাঃ!

একজন ষ্টার্টার রেসের ষ্টার্ট দিচ্ছিল---
উঁআ-উঁআই

নীহারিকা ১৩৭২ ১৯৬৫

অরুণাচল ১৩৭৩ ১৯৬৬

এ্যাই প্তুঁটে! দড়ি টানার খেলায় তুই ওদের দলের একজনকে জখম করেছিস। তার জায়গায় তোকে খেলতে হবে।

এখন যাও, বিকাল পর্যন্ত জিরিয়ে, নিজেকে বেশ ভারী করে নাও!

বিকালে—
প্তুঁটে! তুমি কোথায়? খেলার সময় হয়ে গেছে।

এই যে স্যার! আমি ওপরে। আসছি!

সাবধান! আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছি!
ওফ্!

কী কাণ্ড বলতো পুঁটে! কোমরে এতো লোহা বেঁধেছিস কেন? সারকে যে আধমরা করে ফেলেছিস!
সার যে বল্লেন ভারী হতে!

আমাকে খুন করে ফেলেছিলি হতভাগা। এর শাস্তি হচ্ছে, তোর দলকে জিততে হবে!

রেডি!
পুঁটেদা! এখানে এমন জিনিস পেয়েছি— যা তোমাদের জিতোবে!

কি জিনিস রে বোঁচা?
আরে বাপ— আমরা তো জিতবোই!

এ্যাই পুঁটে! উজবুকের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? টান!
ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ্ করিস নে! আমরা এমনিতেই জিতে যাবো!

অরুণাচল ১৩৭৩ ১৯৬৭

অতিলোভের সাজা
আহা! পাইপগুলোর ওপাশ থেকে খাশা গন্ধ আসছে!
রাস্তা বন্ধ

উলস! মাংসের চপ! ছেলেটাই ভাজছে ঐ উনুনে
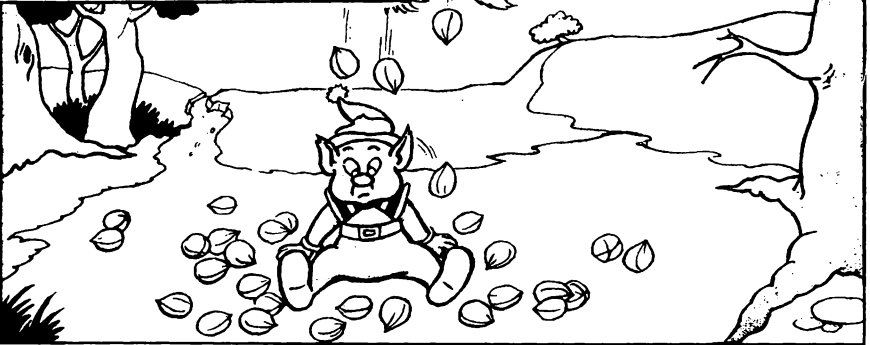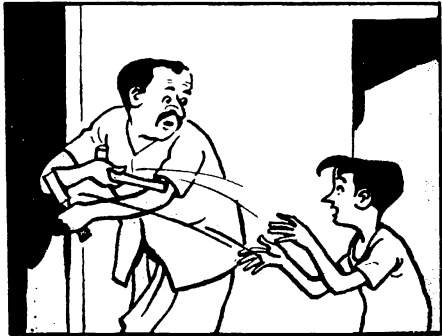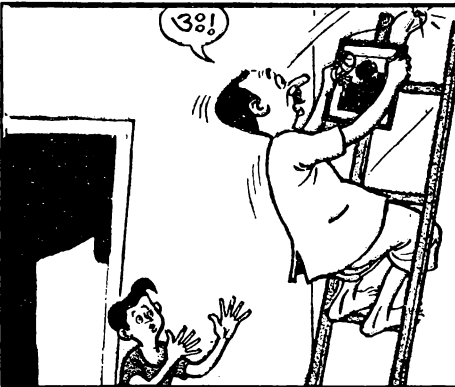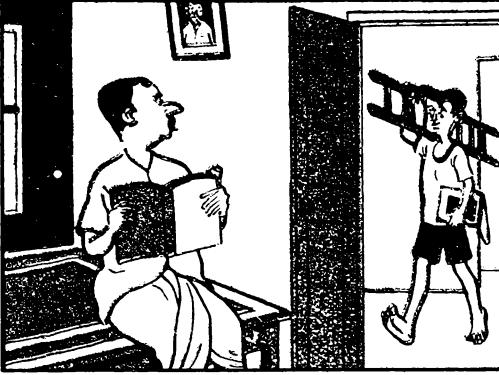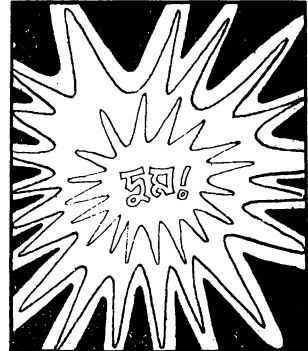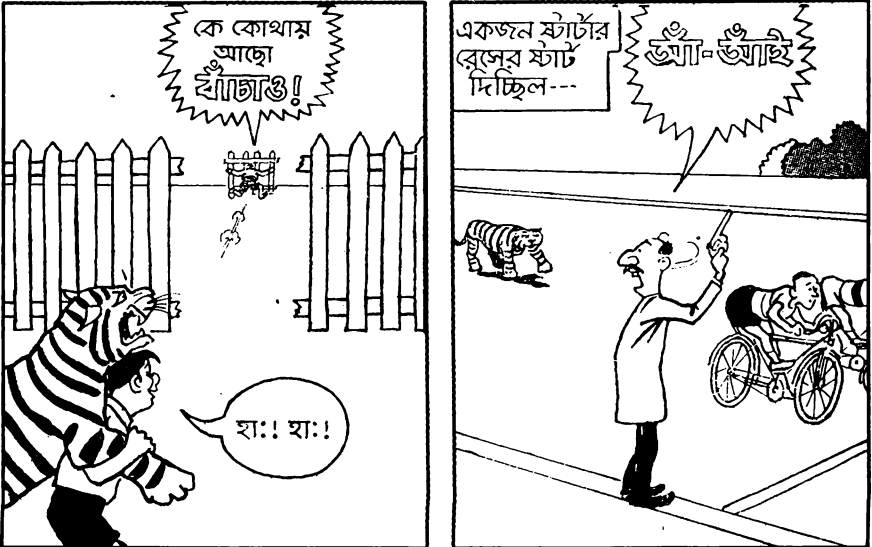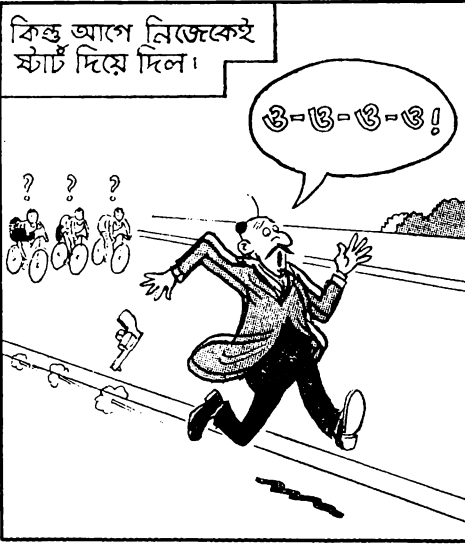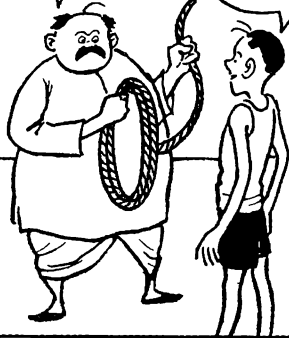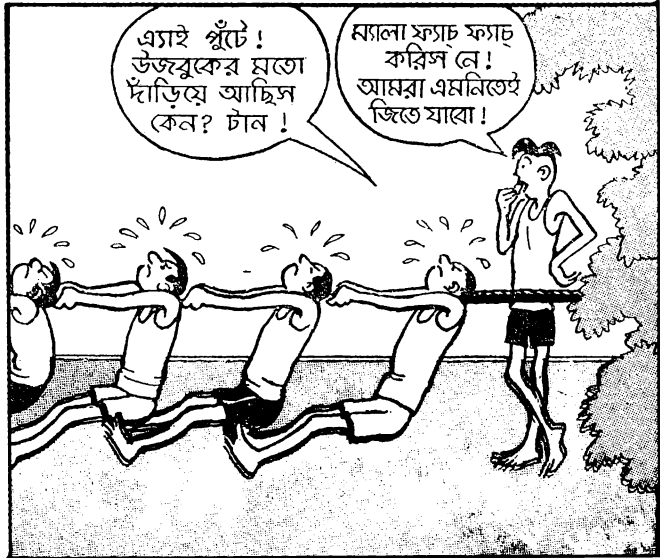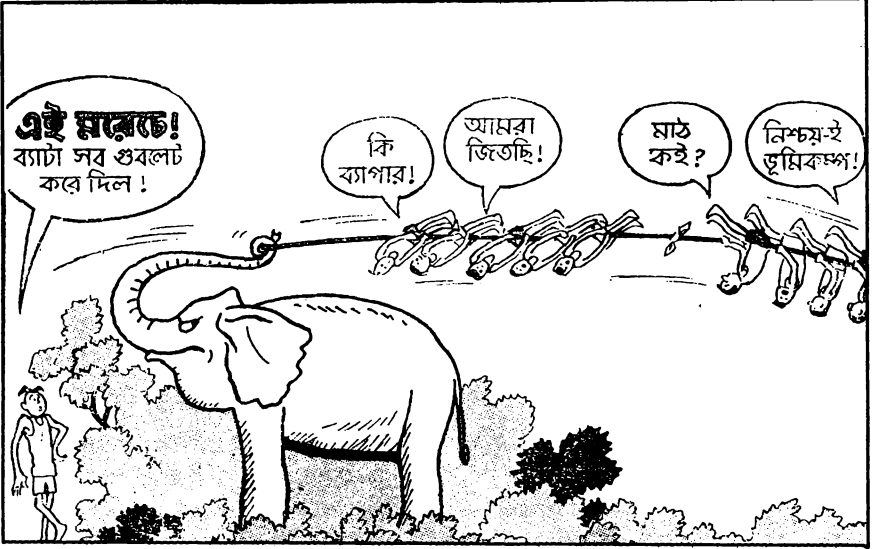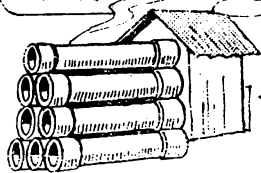
এখানে এক টুকরো দড়ি দেখছি! এটা দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করে, সেই ফাঁসে আটকে একটা চপ তুলে নেবো!

লক্ষ্মী ছেলে! চপগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেছিস! তেলটা কিনতে দেরী হয়ে গেল। এবার তোকে দিয়ে দিচ্ছি।
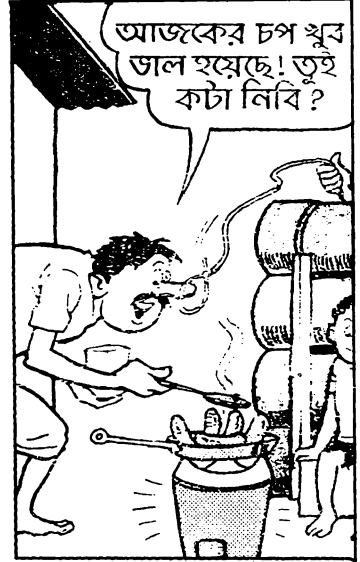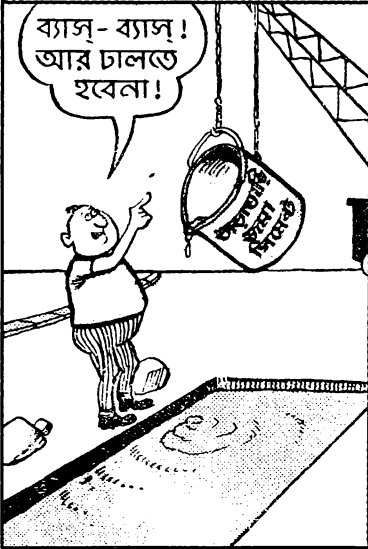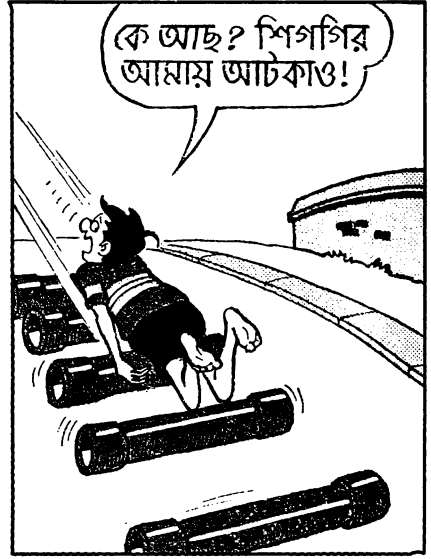
বেণুবীণা ১৩৭৪ ১৯৬৭

বেণুবীণা ১৩৭৪ ১৯৬৭

ওরে বাবা! ডুবে যাচ্ছি যে!

দাঁড়া হতচ্ছাড়া! একবার হাতের নাগালে পাই, তো মজাটা দেখাই!
উরে ব্বাস্! ক্ষেপে বোম হয়ে গেছে!

এ্যাই মরেচে! পায়ের সিমেন্ট যে জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে!

আগে আমারটা ছাড়া, তারপর ওর। ততক্ষণ হাতের সুখ করি!
দমাস্!
উফ্‌স্!
ঠিং! ঠিং!

ইন্দ্রনীল ১৩৭৫ ১৯৬৮

ইন্দ্রনীল ১৩৭৫ ১৯৬৮

ইন্দ্রনীল ১৩৭৫ ১৯৬৮

ইন্দ্রনীল ১৩৭৫ ১৯৬৮

শুকশারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

শুকশারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

শুকশারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

শুকশারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

মনিহার ১৩৭৭ ১৯৭০

মনিহার ১৩৭৭ ১৯৭০

মনিহার ১৩৭৭ ১৯৭০

মনিহার ১৩৭৭ ১৯৭০

উদ্বোধন ১৩৭৮ ১৯৭১

উদ্বোধন ১৩৭৮ ১৯৭১

উদ্বোধন ১৩৭৮ ১৯৭১

উদ্বোধন ১৩৭৮ ১৯৭১

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২
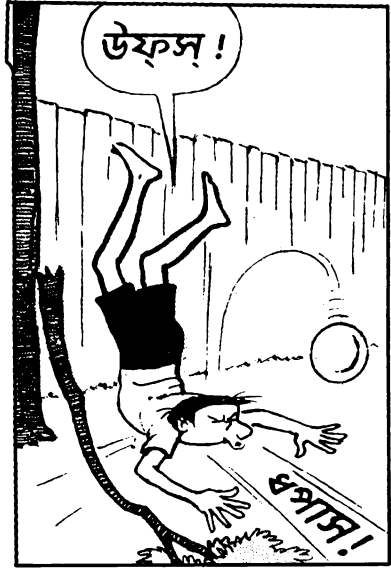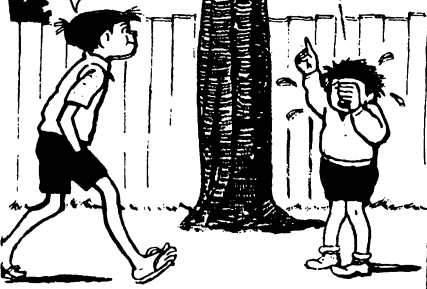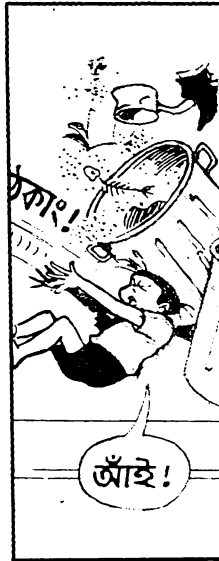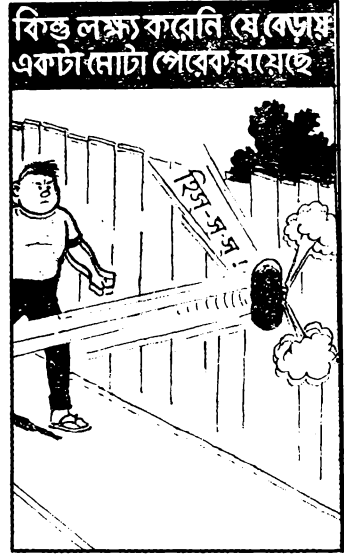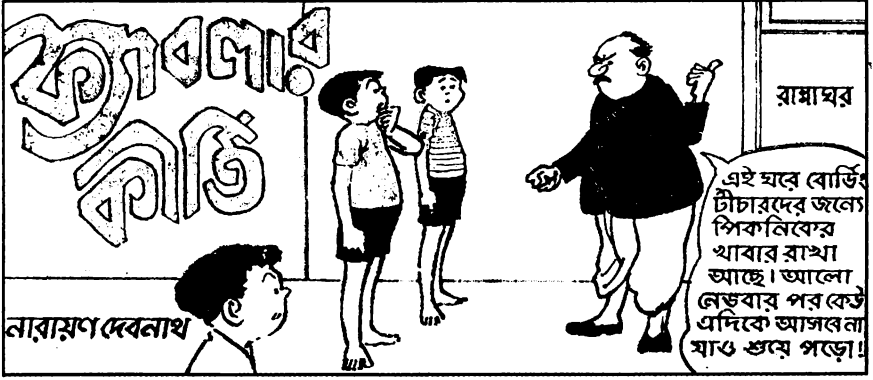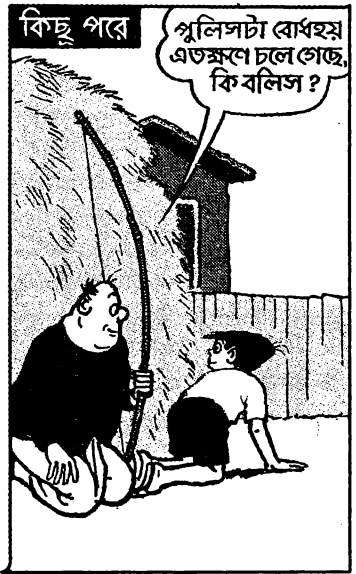
পরে
বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। এই তালে জটার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।
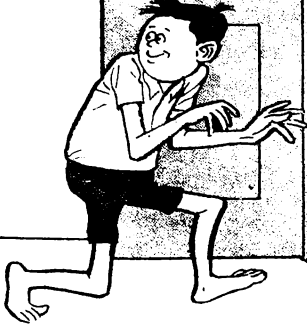
এখানে একটা ইঁট দেখেছি! লাল! তার মানে এটা কারও পক্ষে বিপজ্জনক!

কারও ক্ষতি করার আগে এই লাল ইঁটটাকে পাঁচিলের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দি!

গেছি রে! গেছি রে!

আউফস্‌!
মরেচে! ইঁটটা আবার পালটে ছুঁড়ে পুলিশের টাকে লাগিয়েছে!

হতচ্ছাড়া বিটলে! ইঁট মারবার আর জায়গা পাওনি হতভাগা, ধরতে পারলে —
ইঁট আমি ছুঁড়িনি!

এই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ি!

এবারে ধরেছি তোকে!
দরজাটা লাল, কিন্তু এটা বোধ হয় বিপজ্জনক হবে না!

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২

গুটকের ডাক্তারি
নারায়ণ দেবনাথ

গুটকে! বাইরে যেও না, ঘরে বসে খেলা করো। আমি একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছি!

চুপ করে বোস ভুল্টে! তোর একটা ছবি এঁকে দি।

নাঃ, তোর থ্যাবড়া নাক মুখের ছবি আঁকতে ভালো লাগছে না! অন্য কিছু করি।

ওষুধের বাক্সো! ঠিক হয়েছে, আমি ডাক্তার ডাক্তার খেলবো!

বাবার পায়ে যেন চোট লেগেছে, এবার আমি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দি!

ব্যাণ্ডেজ করার মতো একটা কিছু তবু পেয়েছি!

তপোবন ১৩৮০ ১৯৭৩

তপোবন ১৩৮০ ১৯৭৩

তপোবন ১৩৮০ ১৯৭৩

গুণধর গণু
নারায়ণ দেবনাথ
গণু চাকা নিয়ে আয়। দুজনে রেস দেবো।
রান্নাঘরে অনেকদিন থেকে একটা চাকা ঝোলানো রয়েছে দেখেছি। ওটাই নিয়ে আসি

বাবা এখন গাড়ি সাফ করতে ব্যস্ত। এইতালে এই চাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

চমৎকার চাকা পাওয়া গ্যাছে। এবারে ভন্টার সঙ্গে রেস দিতে যাই।

আঁফস্!

আমি যখন আমার গাড়ির কাজ করবো তখন এই সব চাকা-ফাকা সামনে থেকে হঠা!

মণিদীপা ১৩৮১ ১৯৭৪

নবকল্লোল ১৩৮১ ১৯৭৪

মণিদীপা ১৩৮১ ১৯৭৪

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

পুঁটিরামের নারকেল
আমার জারে রাখার জন্যে রাস্তার ধারের নালাটা থেকে মাছ ধরে আনি।
নারায়ণ দেবনাথ
ফৎনা ডুবেছে এবারে হ্যাঁচকা টান মারি!
ভোঁক! ভোঁক!
হেইয়ো!
ইয়াপ্পি! মাছের বদলে নারকেল ধরেছি!
এবারে এটাকে ভাঙতে হবে!
বাবার এই হাতুড়িটা দিয়ে আগে এটা ফাটাই!

আগমনী ১৩৮৩ ১৯৭৬

ওঃ, পা টা গেছে! এখুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে!

একটা রাস্তার রোলার দেখছি! ঠিক যে জিনিসটা আমার নারকোলটাকে ভাঙতে পারবে!

থামিয়ে দি! খাবার সময় হয়েছে!

রোলারটা বড্ড তাড়াতাড়ি থেমে গেলো। কিন্তু এবার কি করতে হবে আমার জানা আছে!

এই বড় বাড়িটার একেবারে ছাদে উঠে যাবো!

এবার আমি এখান থেকে এটা শুধু ফেলে দেবো। তাহলে নিশ্চিত এটা ফাটবে!

আগমনী ১৩৮৩ ১৯৭৬

বোঁচার বরাতে

নারায়ণ দেবনাথ

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

দাঁড়া একবার তোকে ধরি!
ও-বাবা! এখান থেকে সটকে পড়ি!

আঃ হিপিটার হাত এড়িয়ে দাদুর চায়ের জন্যে মাছ ধরে বাড়ি এসে গেছি!

হড়কে!
সড়াৎ

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো আমার মাছ কই?

গ্লপ!
গ্লুব!
একটা মাছধরা ছিপের জোগাড় সম্বন্ধে আর কিছু ভাবলি বোঁচা?
খবরদার! মাছের ব্যাপার কোন কথা আমার কাছে তুলবি না!

চন্দনা ১৩৮৫ ১৯৭৮

চন্দনা ১৩৮৫ ১৯৭৮

চন্দনা ১৩৮৫ ১৯৭৮

চন্দনা ১৩৮৫ ১৯৭৮

প্রভাতী ১৩৮৭ ১৯৮০

প্রভাতী ১৩৮৭ ১৯৮০

প্রভাতী ১৩৮৭ ১৯৮০

প্রভাতী ১৩৮৭ ১৯৮০

দেবায়ন ১৩৮৮ ১৯৮১

দেবায়ন ১৩৮৮ ১৯৮১

দেবায়ন ১৩৮৮ ১৯৮১

দেবায়ন ১৩৮৮ ১৯৮১

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

আরাধনা ১৩৮৯ ১৯৮২

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

বিভাবরী ১৩৯০ ১৯৮৩

নারায়ণ দেবনাথ

কি চমৎকার আঙুর! মনে হচ্ছে আলোর জন্যে একথোকা কিনি!

কিন্তু আমার এমনই লাক যে, পকেট একেবারে চিচিং ফাঁক। তাই ভাবছি কেনার উপযুক্ত পয়সা কোথায় পাওয়া যায়।

আঃ, তুই ঠিক সময়েই এসে গেছিস নন্দ। এই ফুলগুলো হাসপাতালে আমার বন্ধু তোর পুঁটিমাসীকে দিয়ে আয়।

বাসে করে ঠিক দেখা করার সময়ে পৌঁছবি। এই তোর যাওয়া আসার জন্যে দুটাকা দিয়ে দিলুম। পুঁটিকে বলবি আমি সন্ধ্যের সময় যাবো।

হুররে! আঙুর কেনার জন্যে এখানে ঢের আছে যদি আমি বাসের বদলে সারা রাস্তা দৌড়ে মেরে দি।

আমাকে ঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছতে হলে আরো জোরে ছুটতে হবে!

খাসা ফুলগুলো তো! খোকা, আমি একটু শুঁকে দেখবো?
অ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই!
বোঁওও!

হঁক্!
বোঁওও!
!
পচাং

হতচ্ছাড়া পাজি মর্কট!
উফ!

ব্যাটা বুড়ো ভেটকি! আমি কি করে জানবো যে ফুলের মধ্যে মৌমাছি আছে?

বিক্রির জন্যে এই চেয়ারটা বাইরে নিয়ে রাখি!
পুরাতন আসবাব বিক্রয়

!
ইর্‌র্‌ক্‌!

ওরে বাবারে গেছিরে! বাঁচাও!

অ্যাঁয়ো!

আমার আর্ম চেয়ারের কি হাল করেছে দেখুন!
ছোকরা তো দেখছি বেশ পাকা নেশাড়ু। একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকা দরকার।

নন্দলাল শেষপর্যন্ত হাসপাতালে পৌঁছোল ...
দ্যাখ্‌ নন্দু, তোর জন্যে কি সুন্দর আঙুর এনেছি।
ইঃ! আমার কপালটাই মন্দ। সেই আঙুর পেলুম, কিন্তু—

কলাকাকলি ১৪০৫ ১৯৯৮

ওপস্! ব্যাটারি শক্তি এখন কমে এসেছে। আর আমি একটা অত্যন্ত গোপন স্থানের ভিতরে চলে এসেছি। যদি আমি এখানে নামি তাহলে ঝামেলায় পড়ে যাবো!
সুউউস!
সুরক্ষিত এলাকা
সরকারী গবেষণা কেন্দ্র
এ্যাঁ! দেখে মনে হচ্ছে এই নিরাপত্তা রক্ষীরা জ্ঞান হারিয়েছে! এখানে কিছু একটা ঘটেছে!
জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ঘুমের ওষুধ মেশানো দেওয়াটা একটা দারুণ মতলব ছিলো!
TOP SECRET
X42
এবার আমরা এক্স ফরটি টু পেয়েছি. আমাদের বসেরা খুশী হয়ে অনেক টাকা দেবে। চল এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি
ওও! উড়ন্ত চাকিটা একটা লোকের কপালে চোট দিয়েছে!
TOP SECRET
অর্বাচীন বুদ্ধু! মাথার ওপর দিয়ে যেটা উড়ে গেলো সেটা কি ছিলো?
ওরা একটা উড়ন্ত চাকিও আবিষ্কার করেছে! এটা এক্স ফরটি টুর চেয়ে গোপনীয় হবে, আমাকে ওটা পেতে হবে!
ভগবানকে ধন্যবাদ! আমি নিরাপদে নেমেছি!
ওকৎ! আমি ভিতরে একজন ছোটো মানুষ দেখতে পাচ্ছি! এটা নির্ঘাত অন্য গ্রহ থেকে আসা আসল উড়ন্ত চাকি!
আমি নিশ্চিত বলতে পারি এই দুটোই রক্ষীদের অজ্ঞান করেছে! এবার দেখি আমি যদি এটাকে বোকা বানাতে পারি...
পিছু হটো, পৃথিবীর মানুষ, না হলে এই মারাত্মক রশ্মি বন্দুক দিয়ে তোমাকে আমি গলিয়ে ফেলবো!
আগহ্! ইয়ে-হ্যাঁ স্যার! ঐ জিনিসটা আমার দিকে ছুঁড়বেন না!

তোমাদের দলপতিদের তোমাদের টেলিফোন মেসিনে ডাকো! তাদের সতর্ক করো তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মহাকাশযানের সৈনিকেরা এখানে এসে পড়বে!
আমি তাদের বলবো যে আমরা বহির্বিশ্ব থেকে আক্রমিত হতে পারি!

অন্য গ্রহ থেকে? তাই বুঝি? এই যে, স্যার কেউ গবেষণা কেন্দ্র থেকে উড়ন্ত চাকি বা ঐরকম কিছু ব্যাপারে বলছে!
কি? ঠিক আছে। আমরা এসব বিজ্ঞানীদের অবহেলা করতে পারি না। আমরা ওখানে যাচ্ছি!

গোঁয়াও! কিসে আমাকে চোট দিয়েছিলো? কফি? অ্যাই কে তুমি? এখানে কি হচ্ছে? আর এই ক্ষুদে মানুষটাই বা কে?
ও এ-একটা উ-উড়ন্ত চাকি থেকে এসেছে! ওর ঐ রশ্মি বন্দুক মারাত্মক! সাবধান!

আর এই হচ্ছে সমস্ত কাহিনী, মহাশয়। এবার বোধহয় আপনি আমার ভাইপোর উড়ন্ত চাকিটা মেরামত করে দেবেন—আর আমাকে বাড়ি পাঠাবেন।
বেশ, এতো সোজা—এটা আমরা করবো আর তোমাকে ধন্যবাদ তুমি আমাদের গোপন পরিকল্পনা রক্ষা করেছো।
কিন্তু আপনি এখানে যা শুনেছেন বা দেখেছেন কাউকে অবশ্যই কখনও বলবেন না!

খুড়ো! ওটা আমার উড়ন্ত চাকি! তুমি ওটা একেবারে পুলিস পাহারা দিয়ে ফিরিয়ে এনেছো! কি ঘটেছিলো?
তুই এটা কখনোই বিশ্বাস করবি না, বুড়ো! কিন্তু তোকে কিছু বলার অনুমতি নেই!
তোমার খেলনা মেরামত হয়েছে, বুড়ো!

আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, খুড়ো! তুমি আমার উড়ন্ত চাকি উদ্ধার করেছো, কিন্তু মজা পাওয়ার জন্যে এতে চড়ে উড়তে তুমি অমত করছো। তুমি কি মনে করো না যে এটা একটা উদ্দীপক খেলনা?
নিশ্চয়ই, বুড়ো! এটা আমার পক্ষে একটু বেশী উদ্দীপক! ভুলে যাচ্ছিস কেন আমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

বুদ্ধিমান কুকুর
নারায়ণ দেবনাথ
নিশ্চয়, আপনি এই বুদ্ধিমানকে নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন।

সিধে চলে এসো, ভয় পেয়ো না!

বাঃ! আমায় তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে! ভীতু কোথাকার!

সরু তক্তার পুলের ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে ভীষণ ভয়ে ও পারছিলো না।

তাই নাকি? দেখুন কাপড় মেলার দড়ির ওপর ও কি করতে পারে!

সবার সেরা লালমাটির ঘোড়া

জানুয়ারি, ২০১১ সালে এই কমিক্সটি লালমাটি প্রকাশনাকে উপহার দেন নারায়ণ দেবনাথ।

একটা সংস্থা জানিয়েছে যে ওরা আমাদের স্কুলের ছেলেদের দিয়ে একটা আঁকার প্রতিযোগিতা করবে।

তাই আমি চাই যে তোমরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করো।
নিশ্চয় করবো স্যার!

প্রতিযোগিতায় কি ছবি আঁকতে হবে সেটা কাল প্রতিযোগিতার সময়েই ওরা জানিয়ে দেবে।

পরদিন-
শোনো, ছেলেরা! ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে আঁকার বিষয় হবে ঘোড়া। তোমরা যে যার মতো করে আঁকবে।

ওই ওখানে গিয়ে আঁকার ড্রয়িং পেপার নিয়ে নাও।

এই নাও, কাগজ। নিয়ে আঁকতে বসে যাও।
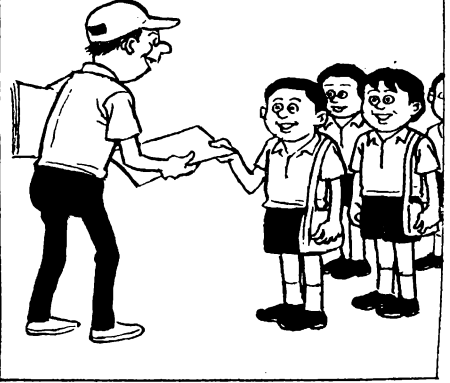
ঘোড়ার কি রকম ছবি আঁকি, বলতো?
বলেছে তো যে যার মতো করে আঁকবে।

এক ঘণ্টা পর-
সব আঁকিয়েদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এবার আপনারা দেখুন এর মধ্যে আঁকা কোন ঘোড়াটা সেরা!

যতোগুলি নানা ধরনের আঁকা ঘোড়ার ছবি দেখছি একটাও তেমন চোখে লাগছে না।

সবই প্রায় একই পর্যায়ের আঁকা ঘোড়ার ছবি।

এটাও ঠিক মনঃপুত হোলো না!

বাঃ! এই তো, এটাই সেরা ঘোড়ার ছবি আঁকা হয়েছে। ঠিক যেন লালা মাটির ঘোড়া!
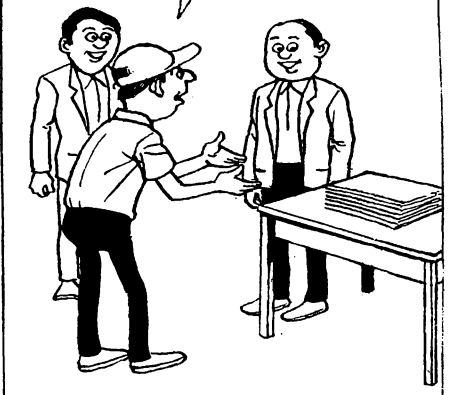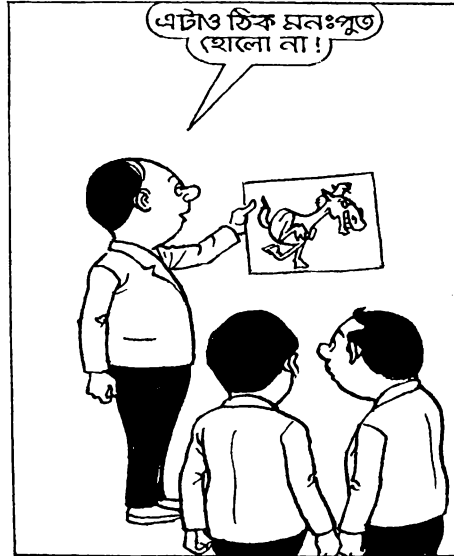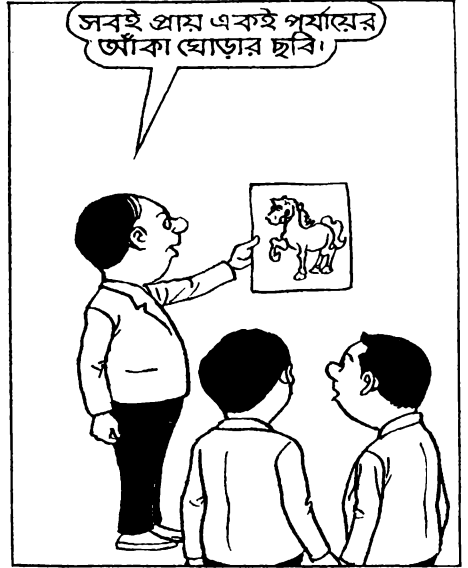
দেড়ো-ডাক্তারের ফ্যাসাদ
গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ
দেড়ো-ডাক্তারকে রাজ্যিশুদ্ধ লোক ভক্তি শ্রদ্ধা করত দুটো কারণে। প্রথমতঃ, তাঁর ওষুধ পড়লেই লম্বা দিতো যে কোনো রোগ—অক্কা পেতো রোগজীবাণু। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর দাড়ি দেখতে লোক আসত দেশ দেশান্তর থেকে। আহা, সে দাড়ি দেখবার মত দাড়ি। ডাক্তারের দু'গুণ লম্বা তেমনি মোটা! অথচ বিখ্যাত এই দাড়ি নিয়েই দেড়ো ডাক্তার পড়লেন এক মহা ফ্যাসাদে!
একদিন গভীর রাতে।
ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!
ইস! এত রাতে আবার কে ডাকাডাকি করে!
ঠক! ঠক!

দরজা খুলে দেখলেন এক থুত্থুরে বুড়ো।
ডাক্তারবাবু! আমার মেয়ের কঠিন রোগ হয়েছে। কিছু খেতে চাইছে না। আপনি ওষুধ দেবেন চলুন!
আশ্চর্য! বৃষ্টি নেই তবু এ দেখছি ভিজে ঢোল হয়ে এসেছে!

দেড়ো-ডাক্তার কাউকে না বলতেন না। তাই অত রাতেও ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরোলেন বুড়োর সঙ্গে।

শহরের ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে এসে পৌঁছালো দুজনে।
মরেছে! এ যে হড়বড় করে কুয়োয় নেমে গেল! মনে হয় শুকনো কুয়ো, দেখি উঁকি!

ও বাবা! এতো কানায় কানায় ভর্তি! ব্যাপার সুবিধের নয়, এই তালে সরে পড়ি!

কিন্তু পালাতে যেতেই
হাঃ হাঃ হাঃ! আমার মেয়েকে ওষুধ না দিয়ে যাবে কোথা?

কে তুমি?
পাতাল-জাদুকর মোবাটা!

শুকতারা আশ্বিন ও ভাদ্র ১৩৮০ ১৯৭৩
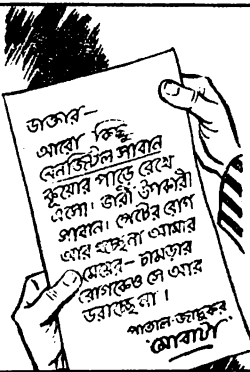
গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ

গড়গড়িবাবু মস্ত বৈজ্ঞানিক। তার বৈঠকখানার চেয়ার জঞ্জাল থেকে তৈরী প্লাস্টিক দিয়ে, টেবিল চুল থেকে তৈরী কাঠ দিয়ে। তাঁর আবিষ্কৃত ঘাসের চপ খেলে বাড়তি ভিটামিন খাওয়ার দরকার হয় না।
গড়গড়িবাবুর সবচাইতে আজব আবিষ্কার তাঁর উড়ন্ত গাড়ি। এ-গাড়ি ডাঙায় চলে গড়গড়িয়ে, জলে চলে পাখনা নেড়ে, আকাশে ওড়ে ডানা মেলে। গাড়িটা তাঁর চলন্ত কারখানা। গাড়ির মধ্যেই তিনি গবেষণা করছেন আর আবিষ্কার করছেন।

তবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে বলো!
এমনি সাবানে কাজ হচ্ছে না!
সেটা আগে বললেই তো হতো!
ঘটাং!
এই নাও! এই দিয়ে বাচ্চাদের হাত ধুয়ে খেতে বলবে— হাতের জীবাণু ঘায়েল হবে—পেটের অসুখ হবে না। খেলেধূলে এসে মাখতে বলবে—চামড়ার রোগ হবে না!
আর যদি না হয় তো আবার তোমাকে আছাড় মারবো হিঃ হিঃ হিঃ!
দুম!
ওঃ! খুব বেঁচে গেছি!
দিন কয়েক পরে
তোমার বেনজিটল সাবান আরো কিছু দিও বাপু!
বড় ভালো সাবান! ছেলেপুলেদের পেটের অসুখ আর হচ্ছে না—চামড়ার রোগও হচ্ছে না! কি বর চাও বলো?
চাঁদে যাওয়ার বর!
তথাস্তু!
Benzytol SOAP
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী
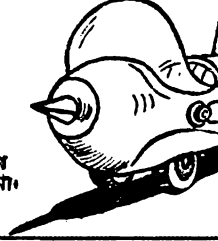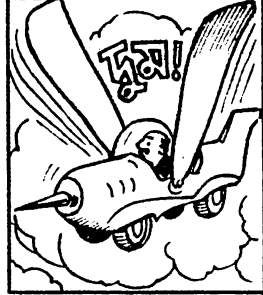
পেত্নীরানীর নুড়ি

গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ

পেত্নীরানীর রঙ মিশমিশে কালো মাথায় তালগাছের মতো লম্বা চোখ ভাঁটার মতো ড্যাবডেবে। পেত্নীরাজ্যে অমন সুন্দরী নাকি আর একজনও নেই। পেত্নীরানীর এক মেয়ে দেখতে মানুষের মেয়ের মতো। ফুটফুটে গোলগাল হাসিখুশী পেত্নীরানীকে ভয় পায় সবাই। ছোট্ট একটা নুড়ির দৌলতে তার এতো দাপট। নুড়ির ম্যাজিকে পেত্নীরানী ইচ্ছেমতো ব্যাঙ হতে পারে টিকটিকি হতে পারে, কাক হতে পারে, এমন কি অদৃশ্যও হতে পারে। এ-হেন ডাকসাইটে পেত্নীরানী একদিন মহাফাঁপড়ে পড়লো মেয়েকে নিয়ে। মেয়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে রোগজীবাণুর ভয়ে, পেটের অসুখের ভয়ে। তাকে এমন একটা সাবান এনে দিতে হবে যা জীবাণুর যম। যা মাখলে চামড়ার রোগ হবে না খাওয়ার আগে যা দিয়ে হাত ধুলে পেটের অসুখ হবে না। ভুতুড়ে নুড়িকে হুকুম দিয়েছিলো পেত্নীরানী। সাবানের পাহাড় হাজির করেছিলো ম্যাজিক নুড়ি। কিন্তু—

শুকতারা অগ্রহায়ণ ১৩৮০ ১৯৭৩

মুখের কথা খসাতে মা খসাতেই
হুকুম তামিল করলো তুতুড়ে নুড়ি।

কালো ইঁদুর এবার পেত্নীরূপ ধরলো
কীরে, জীবাণুর যম সাবানটা দিবি, না ঘাড় মটকে মরবি?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাগ থেকে একটা সাবান বের করলো দেড়ো-ডাক্তার।
এ-এই নাও বে-বেনজিটল সাবান। জীবাণুর যম এই সা-সাবানে চামড়ার জীবাণু, হাতের জীবাণু কাবু হয় বলেই— চা-চামড়ার রোগ পেটের অসুখ ধারে কা-কাছে ঘেঁসে না।

হিঃ হিঃ! সাবানে যদি কাজ না হয় তাহলে শ্যাওড়াগাছে তোর দাড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবো!
আর যদি কাজ হয়?

আমার কাঁধে চেপে যেখানে খুশী যাবি।

কিন্তু বেনজিটল সাবান মেখে রোগজীবাণুকে থোড়াই কেয়ার করতে শুরু করলো পেত্নীরানীর মেয়ে। ফলে— রাতবিরেতে রুগী দেখতে গেলেই —
আরো একটু জলদি চলো পেত্নীরানী!

Benzytol
SOAP
ক্যালকাটা কেমিক্যাল এর তৈরী

গল্প • অদ্রীশ বর্ধন ছবি • নারায়ণ দেবনাথ

মঙ্গলগ্রহের আগন্তুকরা পৃথিবী আক্রমণ করেছিলো এবং বেধড়ক পিটিয়ে পৃথিবীবাসীদের ঠাণ্ডা করেছিলো। কিন্তু শেষকালে নিজেরাই পড়লো ফ্যাসাদে। যাদের শুধু চোখে দেখা যায় না, তাদের আক্রমণে বেচারীরা ঘায়েল হতে লাগলো একে একে। এই পর্যন্ত জানা যায় ওয়েলস সাহেবের 'ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস' উপন্যাস আর সিনেমায়। তারপর কি হলো তা জানা যাবে এই কাহিনীতে

বিখ্যাত আবিষ্কারক প্রফেসার নাট-বল্টু-চক্র গবেষণা মন্দিরে এক্সপেরিমেন্ট করছেন —

প্রফেসর তখন এটা সেটা মিশিয়ে —
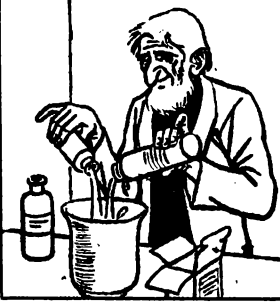
বিস্তর ধোঁয়া ছেড়ে —

অনেক দুমদাম আওয়াজ করে একটা সাবান বানালেন।
ব্যস, তৈরি।

এই সাবান মেখে রোজ গায়ের ধূলোবালি ময়লা সাফ করবে, খাওয়ার আগে হাত-পা-শুঁড় ধুয়ে নেবে — দেখবে, পেটের অসুখ হবে না — জীবাণুরা জব্দ হবে।

পরের দৃশ্য।
মঙ্গলের বিশাল স্পেসশিপগুলো পিঠটান দিচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে।
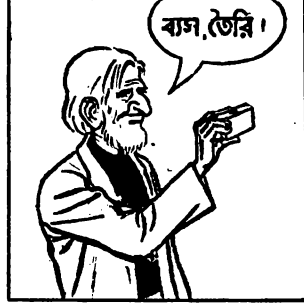
ভাগ্যিস বেনজিটল সাবান দিলে, তাই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা। মহাকাশ জাহাজ বোঝাই করে তোমাদের বেনজিটল সাবান নিয়ে যাচ্ছি — যাতে পৃথিবীর জীবাণুরা মঙ্গলে গিয়েও উৎপাত করতে না পারে।
Benzytol SOAP
ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

বিষ্ণুর চিঠি

ও ভাই কমল কা'লকে তোমার চিঠি পেলাম ভাই,
রেগেই তুমি আগুন দেখে হেসেই মরে যাই।
সরস্বতী পুজোর পরে পাও নি দেখা বটে,
বুঝলি নি তার কারণ গাধা বুদ্ধি নেই ক' ঘটে (ঘট-এ)?
এসে পড়ল শুকতারা যে পহেলা ফালগুনে,
যাহার তরে ছিনু ব'সে পথ চেয়ে আর দিন গু'নে।
পিয়ন খুড়ো কাগজখানি বাক্সে (বাক্স-এ) দিতে যায়,
কেড়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আমি চার তলায়।
সেই থেকে কে জানে কখন উঠে নামে সূর্য,
খাওয়ারও হুঁস হয় না, কানে না বাজলে তূর্য।
প্রতি পাতায় নতুন মজা, কলসী ভরা সুধা,
ভুলেই যাবে ছেলে বুড়ো তেষ্টা এবং ক্ষুধা।
সেকালেতে মিলত সুধা চাঁদের (চাঁদ-এর) দেশে নাকি,
যোগায় এখন ঝামাপুকুর রইল কী আর বাকী?
বেশী-পোড়া ইটকে ঝামা বলে অভিধানে;
ঝামার ভিতর সুধা ছিল, কোন্ জ্যোতিষী জানে?
গলিটারে মিষ্টিপুকুর ব'লতে আমি চাই।
গল্প যেন রসগোল্লা কোথায় এমন পাই?
তরুণেরি জয় পতাকা ওড়ায় শুকতারা,
গ্রাহক হবি— দিব্যি দিলাম বিষ্ণুচরণ খাঁড়া।

শুকতারা ১৩৬৬ (১৯৫৯), বৈশাখ

ছবির ধাঁধা

(মজার চিঠির উত্তর)

শোন ভাই তারাপদ মজার খবর,
একদিন রবিবার সন্ধ্যার পর,
তাতলা গিয়েছিনু গোপালের বাড়ি,
বহুদিন পরে দেখে মন খুশী ভারী।
রয়ে গেনু সেইখানে খাওয়া দাওয়া করে,
আরামে ঘুমিয়ে পড়ি বিছানার পরে।
হঠাৎ অনেক রাতে ঘটিল কি হায়,
কার যেন চীৎকারে ঘুম ভেঙে যায়।

দেখিলাম সে বাড়ির ছোট মেয়ে রানী
ছুটে যাই তাড়াতাড়ি, তার কাছে যাই,
কি হল তোমার রানী আমরা শুধাই।
ছুটে আসে তিনকড়ি আর গদাধর,
হইচই হয় কত ঘরের ভিতর
দুই চোখ ছলছল রানি কেঁদে বলে
আমার পুতুল নিয়ে চোর গেল চলে।

সকলে অবাক হয়ে চারদিকে চাই,
রানির পুতুলগুলি আছে ঠিক ঠাঁই।
ব্যাপার দেখিয়া সবে হাসিয়া আকুল
বলিলাম রানী তুমি দেখিয়াছ ভুল।
রানী বলে ভুল নয় একটু আগেই,
স্বপ্নে দেখেছি চোর নিজের চোখেই।

রবি দাসের চিঠি—

শুকতারা ১৩৬৬ (১৯৫৯), আষাঢ়

পাদপূরণ (কার্টুন স্ট্রিপ)
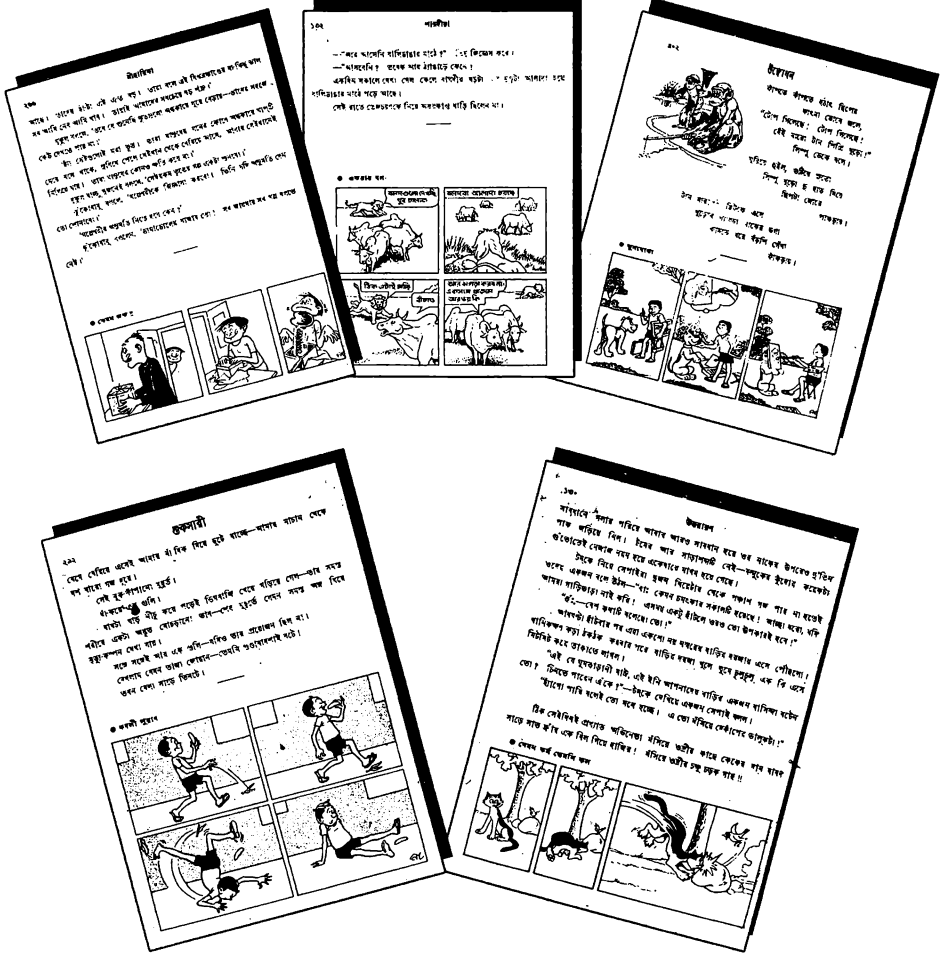
‘পাদপূরণ’ (কার্টুন স্ট্রিপ)

দেবসাহিত্য কুটির প্রকাশিত বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে অসংখ্য ‘পাদপূরণ’ (কার্টুন স্ট্রিপ) তৈরি করেছেন নারায়ণ দেবনাথ। ‘পাদপূরণ’ শব্দটি এসেছে– কোনো লেখার শেষে অতিরিক্ত স্থান, মজার ছবি দিয়ে পূর্ণ করার পদ্ধতি থেকে। এই কার্টুনস্ট্রিপগুলি প্রধানত সংলাপ বিহীন দু-তিনটি বা তার বেশি সমান আকারের কার্টুন ছবি দিয়ে পাঠকদের মনোরঞ্জন করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ বিশ্ববিখ্যাত কার্টুনিস্ট কাফি খাঁ (পি.সি.এল.) সর্বপ্রথম বাংলায় কার্টুন স্ট্রিপ সৃষ্টি করেন।

উল্লেখযোগ্য পাদপূরণগুলি প্রকাশিত হয়েছে পূজাবার্ষিকী— শারদীয়া ১৩৬৮, অলকানন্দা ১৩৬৯, শ্যামলী ১৩৭০, উত্তরায়ণ ১৩৭১, নীহারিকা ১৩৭২, অরুণাচল ১৩৭৩, শুকশারী ১৩৭৬, উদ্বোধন ১৩৭৮, পূরবী ১৩৭৯ ইত্যাদিতে।

● একতার বল

● নিজে জেনে পরকে জানাও

● ঠেকে শেখা

● দুকূল যায়

এই: তোরা সব কাক। আমি বাজপাখী।

তারপর কাক তার দল ছেড়ে বাজপাখীদের দলে এলো।

ঠিক করেছ। চল, তোমাদের দেশে গিয়ে সকলকে মানুষ করি।

কাকেদের দেশে বাজপাখী।

না
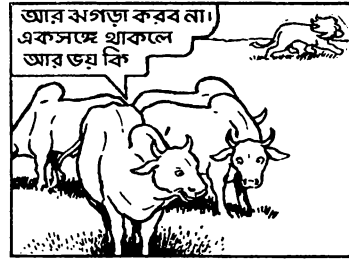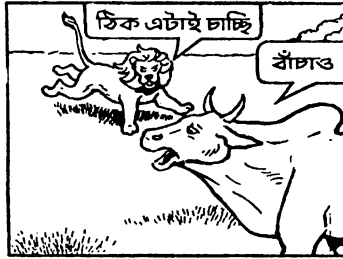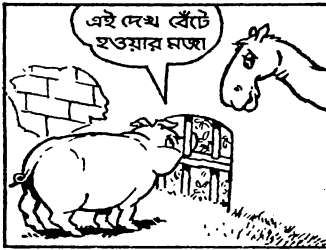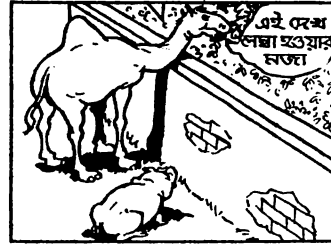
● ইঁদুর হলেও বুদ্ধি আছে
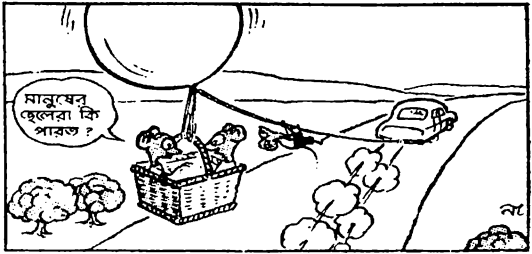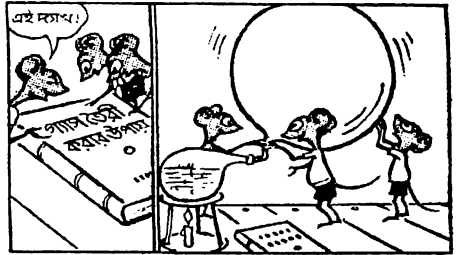
● ভয় পেলে ভয় বাড়ে
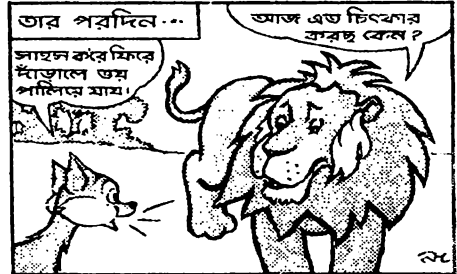
চালাকির ফল

বোকা কুকুর
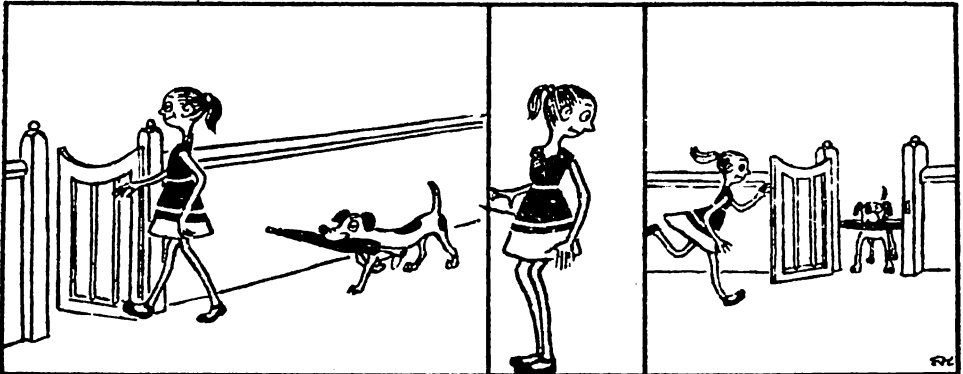
সোজা উপায়
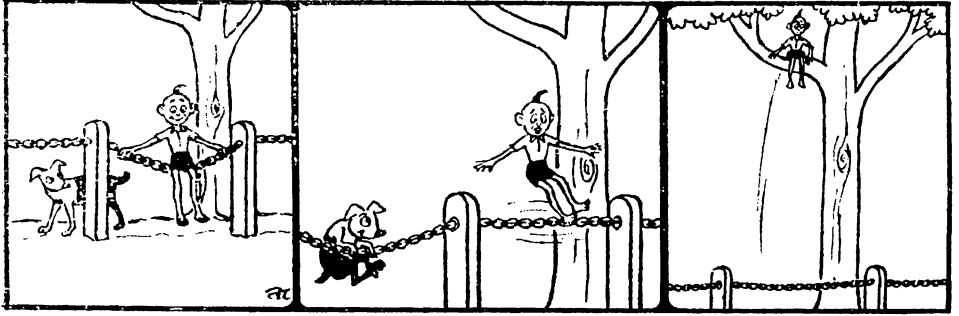
বাঁটুলের বুদ্ধি

● কম্মিতকর্মা

● কুকুরের বুদ্ধি
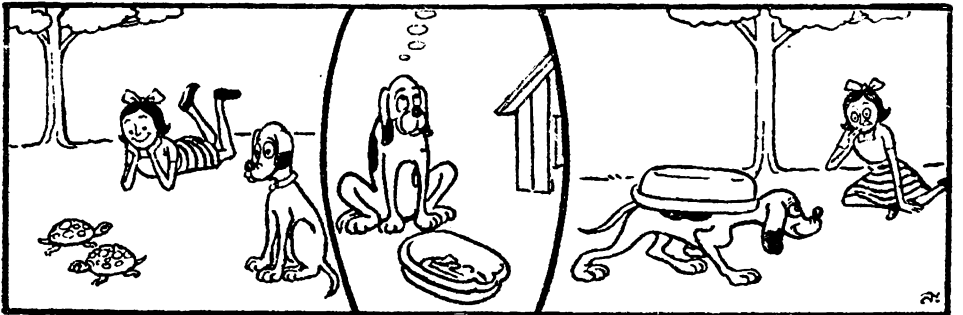
● গরু ও বোঝে
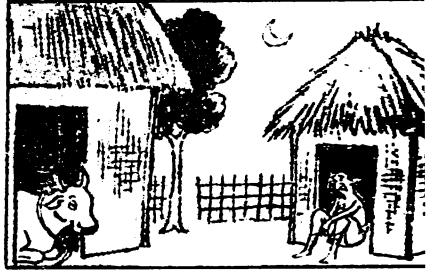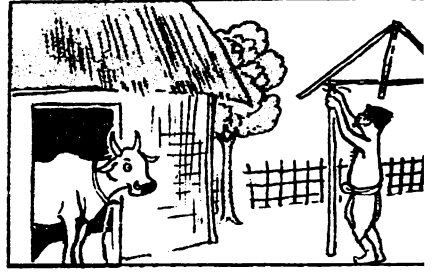
● ক্ষুদ্র হলেও তুচ্ছ নয়

● চালাকির ফল

● খেলার মজা

● বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য
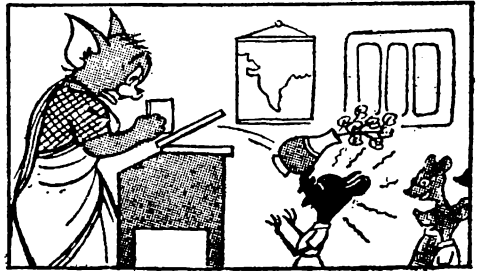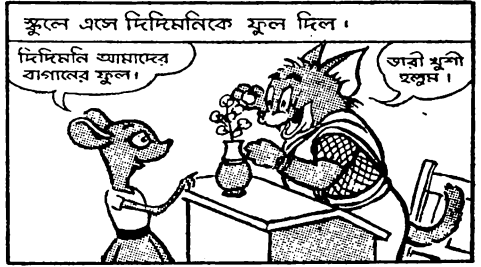
● বাহাদুরির ফল
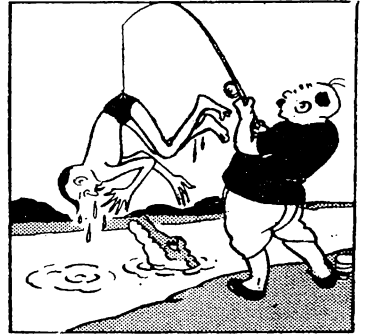
● বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার

● একতার বল
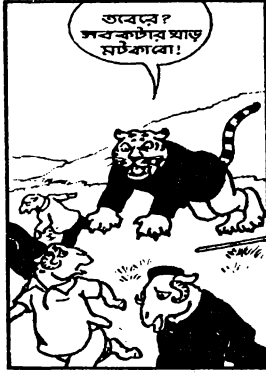
● যেমন কর্ম তেমনি ফল

● অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা

● বন্দী
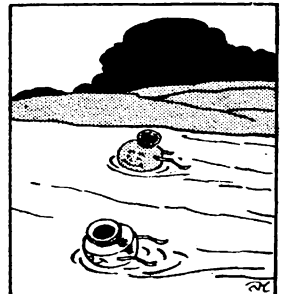
● তালার ভাষা

● বীর শিকারী

● বুদ্ধিমান ইঁদুর

● জাত শিল্পী

● কেমন জব্দ

● বুদ্ধির্যস্য
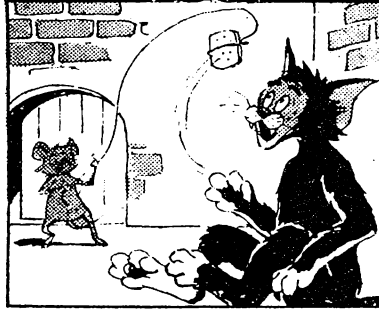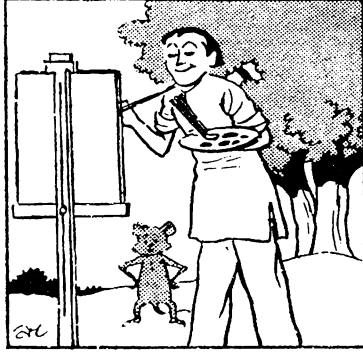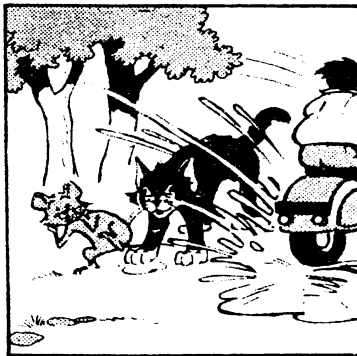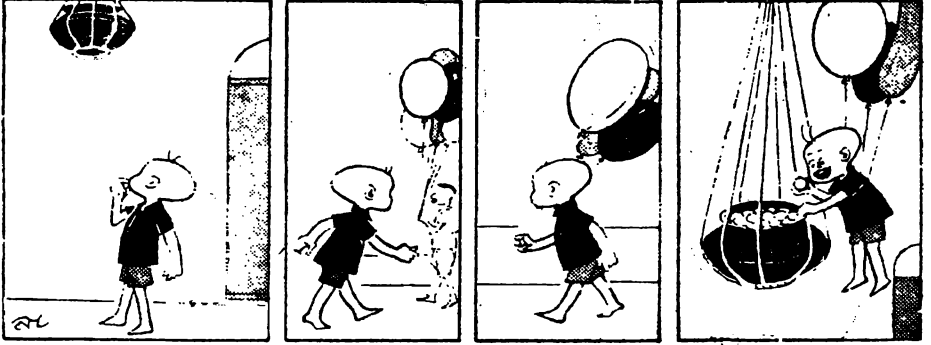
● ইঁদুর হলেও বুদ্ধি আছে
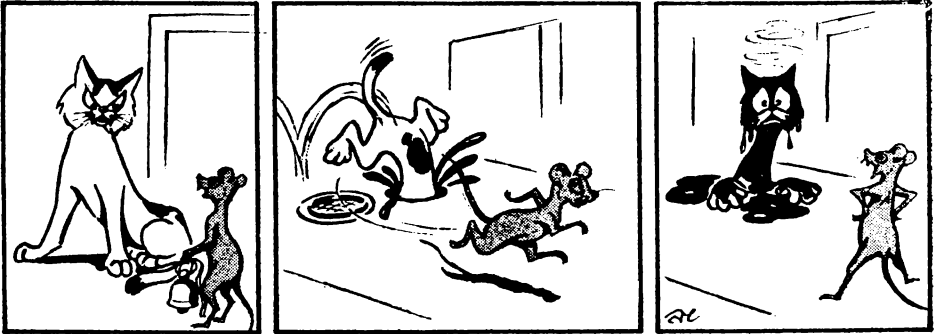
● ক্যামেরার কারিকুরি
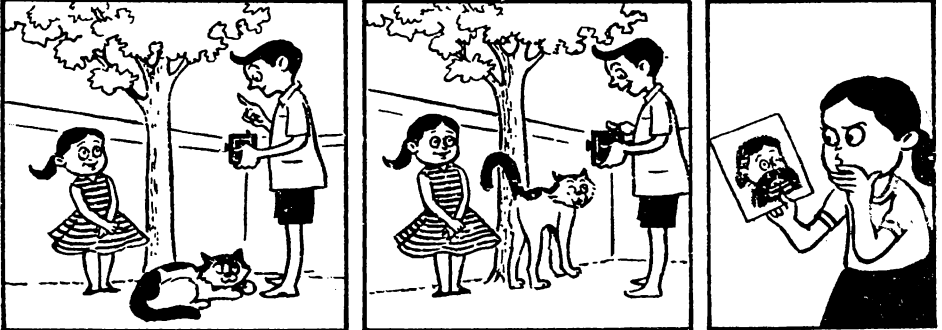
যেমন কর্ম তেমনি ফল

অতি চালাক

শারদীয়া দেয়ালা ১৩৮১

● না দেখে পথ চলা

● উল্‌টো জব্দ
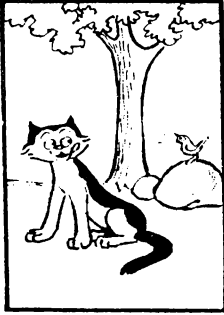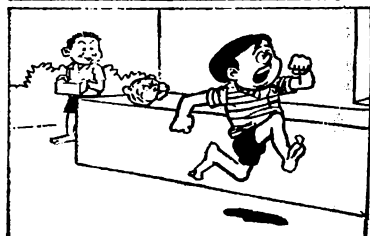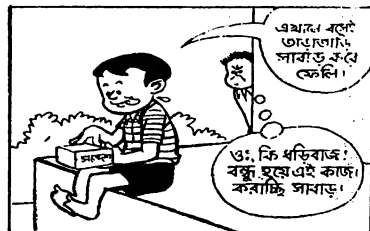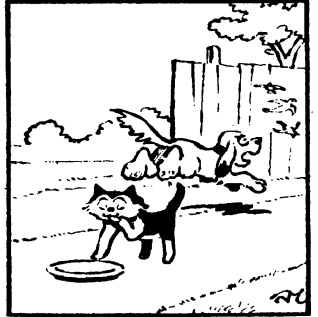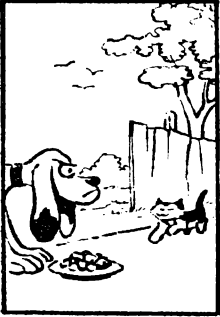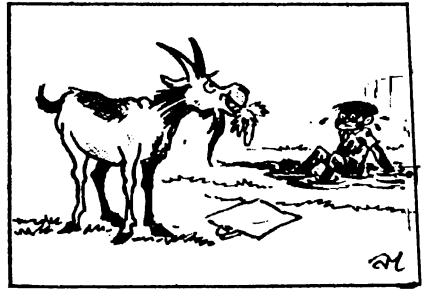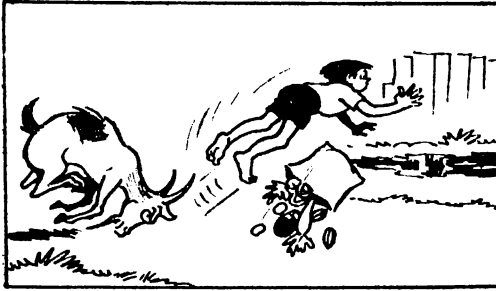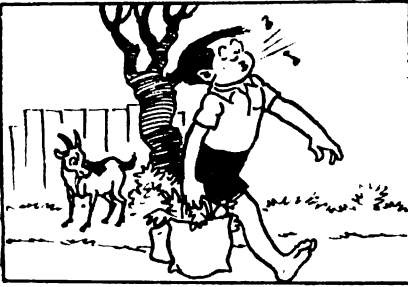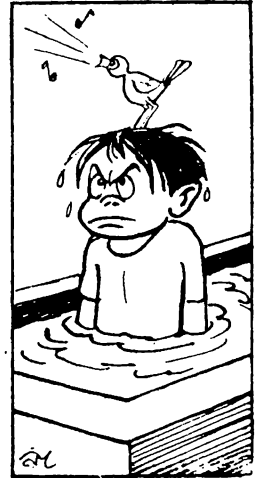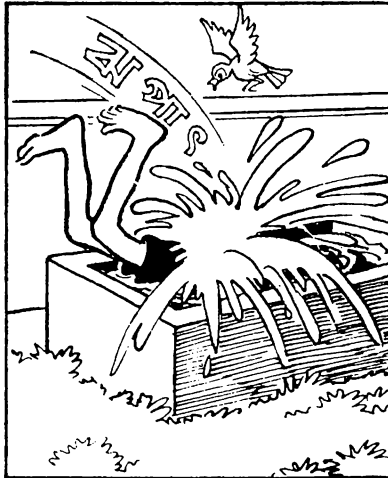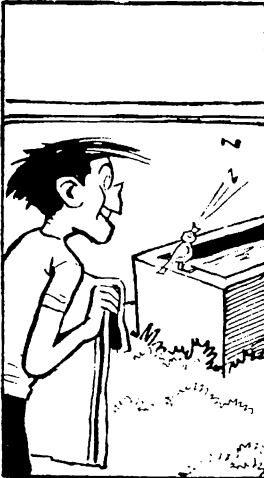
● কেমন জব্দ !!
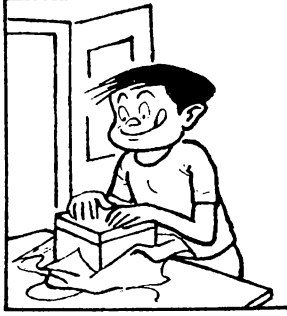
● গানের ছিপি
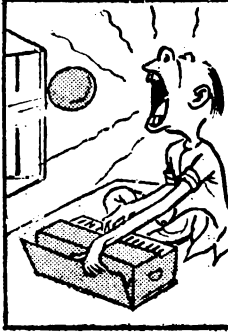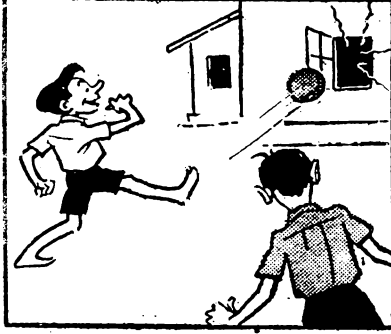
● ইটের বদলে পাটকেল

● নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে !

● মজার সাজা!
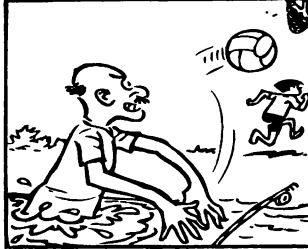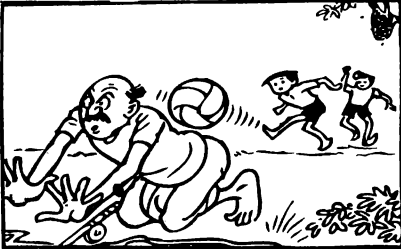
● কুকুরের বুদ্ধি
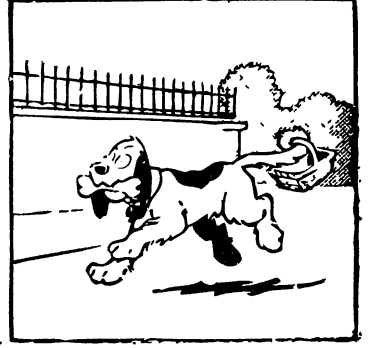
● যেমন কর্ম তেমনি ফল

● সম্মোহনের মূল্য—
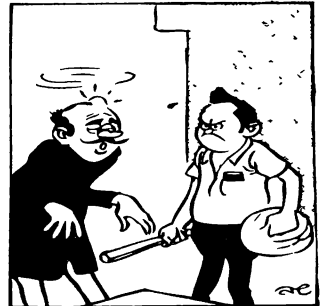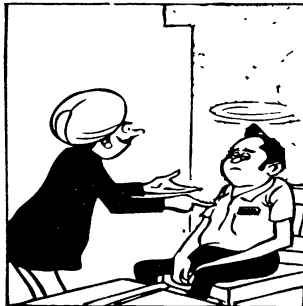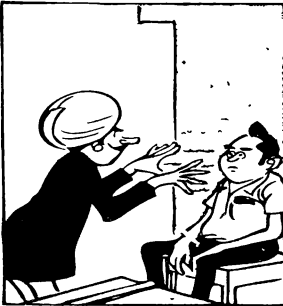
● লক্ষ্যভেদ !
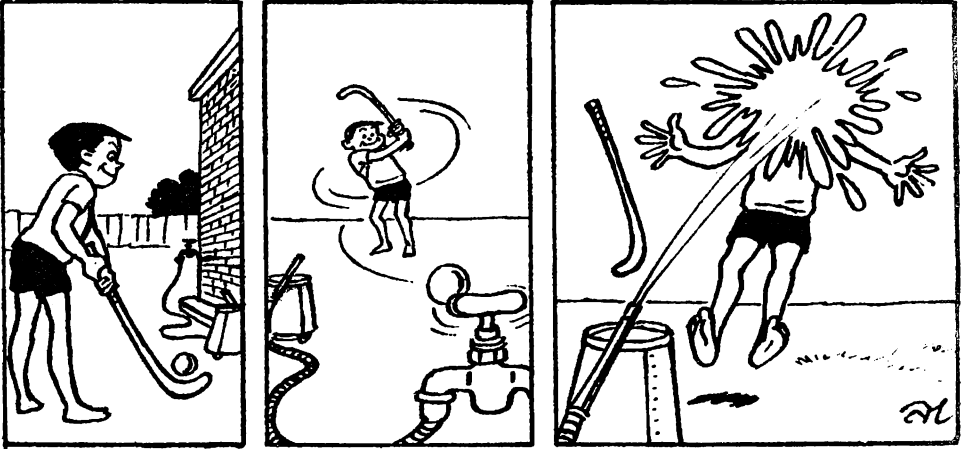
● হিপ্‌নোটাইজ !

● ঠাণ্ডা-গরম !

●নিজের সাহায্য নিজে কর

● মোক্ষম দাওয়াই !

● আচ্ছা ফ্যাসাদ!

● হাতে হাতে ফল

● বাজীমাৎ না কুপোকাৎ!
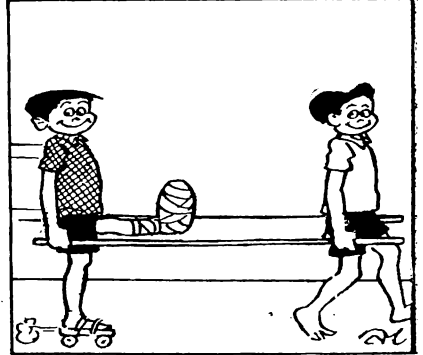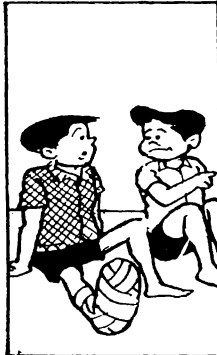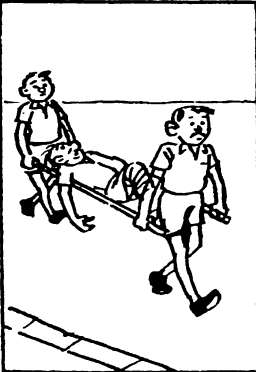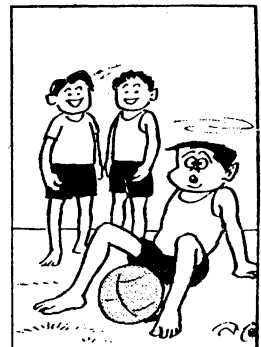
● চুরির ফল!

বেপরোয়া!

● কেমন মজা!

● মৎসশিকারী

● ঘুমের অষুধ

● শক্তের ভক্ত

বাড়িওয়ালা

কুঁজের অসুখ

১৩৭৭ আষাঢ় ১৯৭০
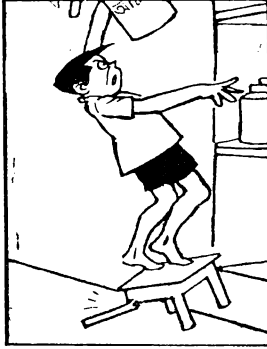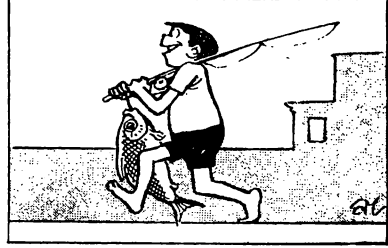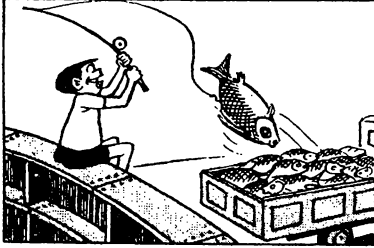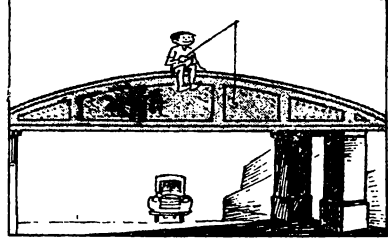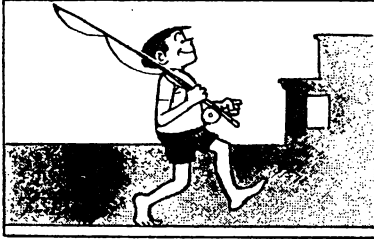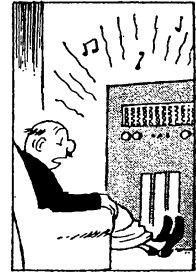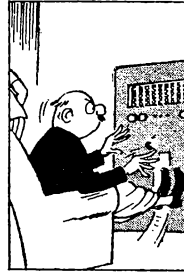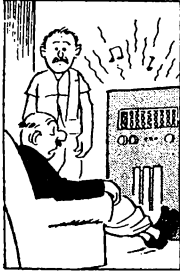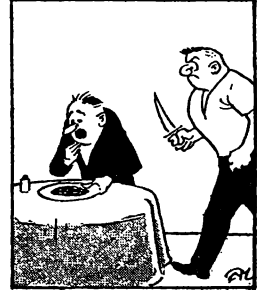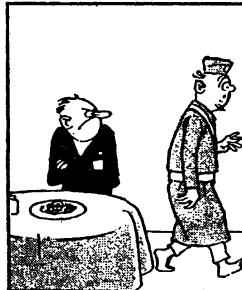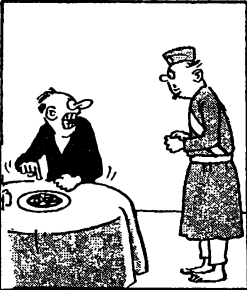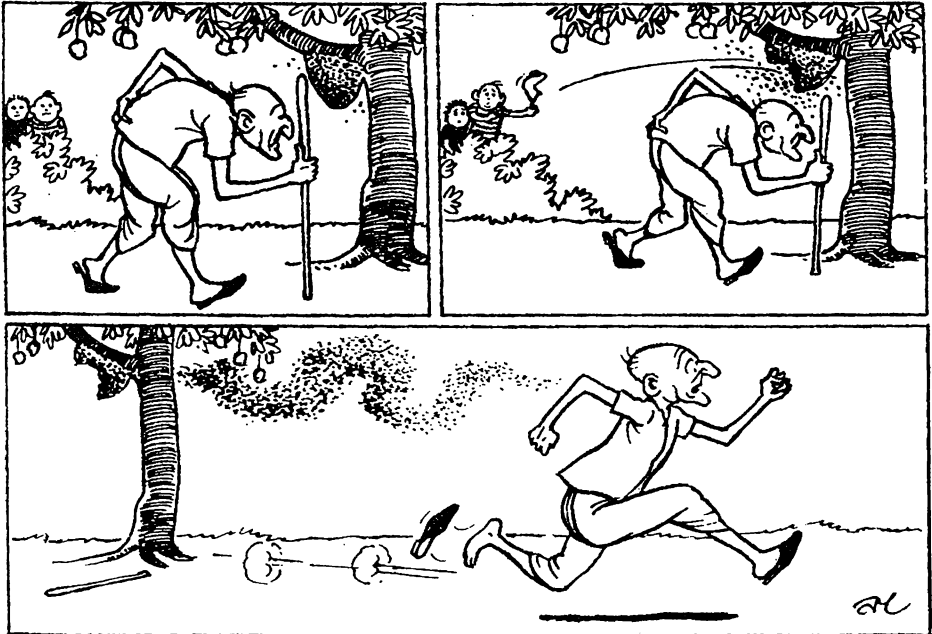
● বুদ্ধি থাকলে উপায় হয়
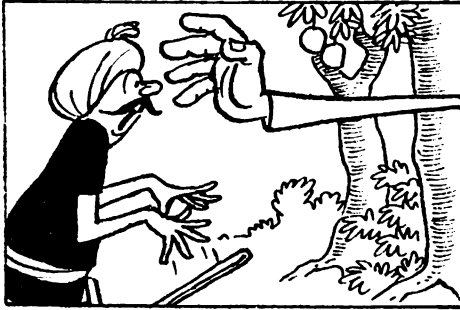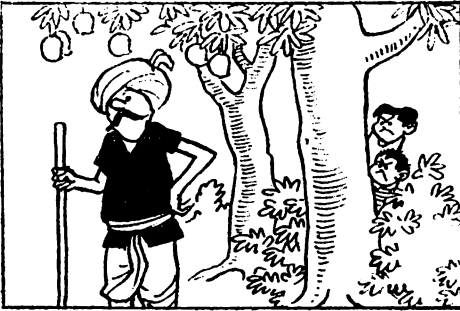
● বাবার বিপদ
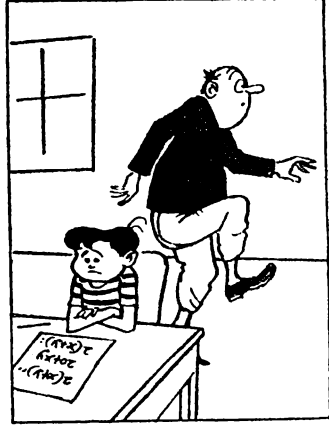
● কদলী পুরাণ
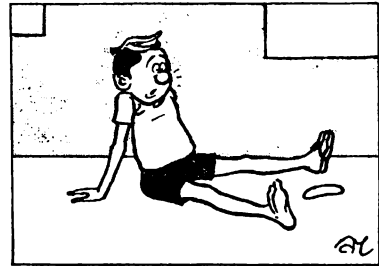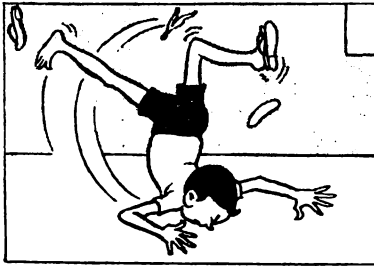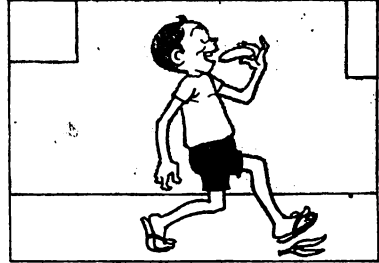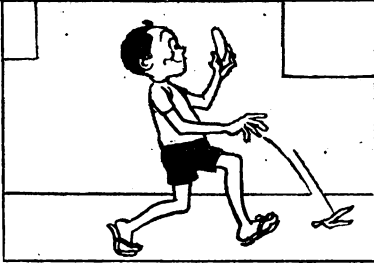
● চোর ধরা
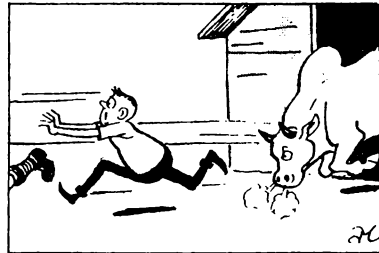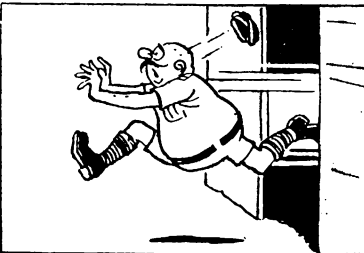
● ইসারায়

● প্যালার বুদ্ধি
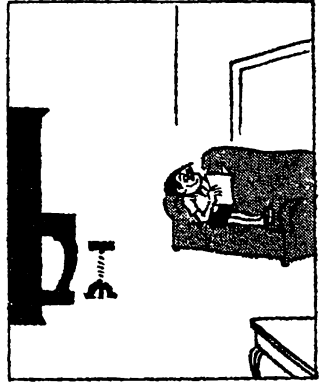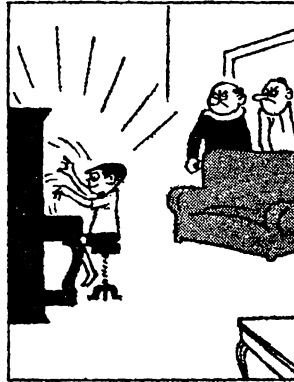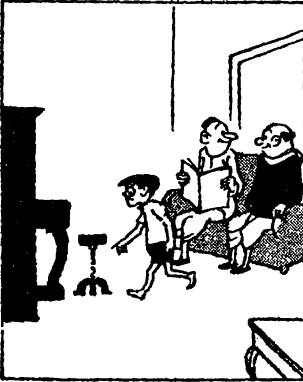
● খোঁজাখুজি খেলা
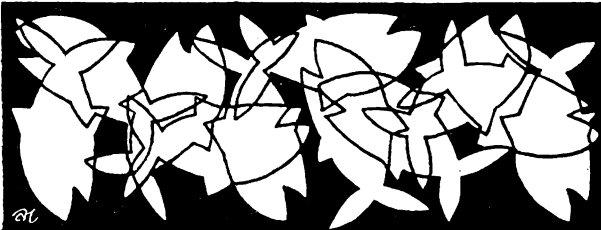
খুঁজে দেখো তো এখানে কটা মাছের ছবি আছে।

শুকতারা আষাঢ়, ১৩৮০ ১৯৭৩

ছেলের ভক্তি

ডাক থামান কল ঃ—
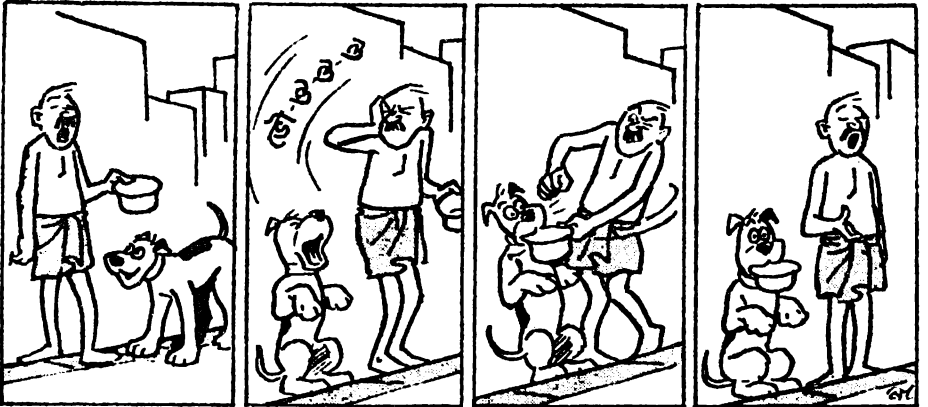
● এ কি বল!

● স্বপ্নভঙ্গ

● ফটাং

● ভুলবোঝা

● একমনে

● অবুঝ কুকুর

সমজদার

হাওয়া পরিবর্তন

কার ভয়ে

সম্মোহনের মূল্য—

ভাল ছেলে—

আরে তোমার আজ সেনবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা না? চলো চলো।
কিন্তু আজ যে বাড়ির দেওয়ালে গুলোতে তেল রং লাগাবো বলে ঠিক করেছিলাম।
আমি একটু বেরোচ্ছি। শিগগিরই ফিরবো। চুপচাপ থাকবি, দুষ্টুমি করবি না।
বাবা কি সুন্দর রং এনে রেখেছে।
বাবা বাড়ি ফিরলে একেবারে চমকে যাবে।
দুঘন্টা পরে
আরে আরে একি!
তিন দিকেই করে ফেলেছি বাবা। একটা দিক শুধু তোমার জন্যে রেখেছি।
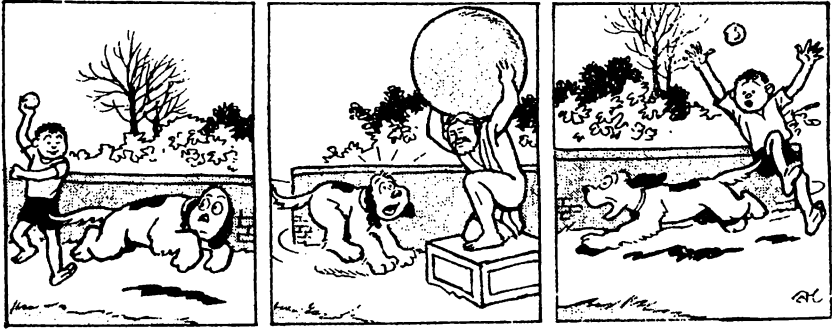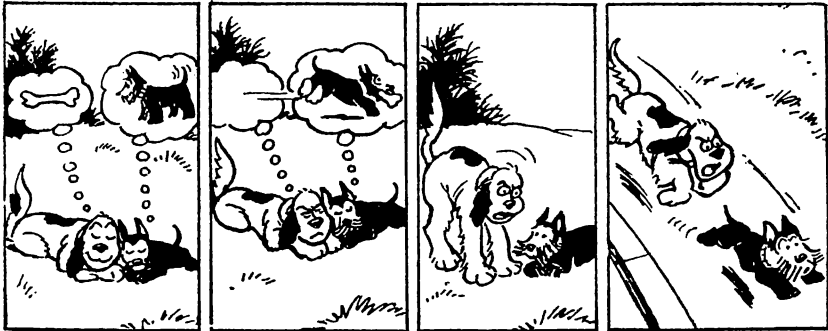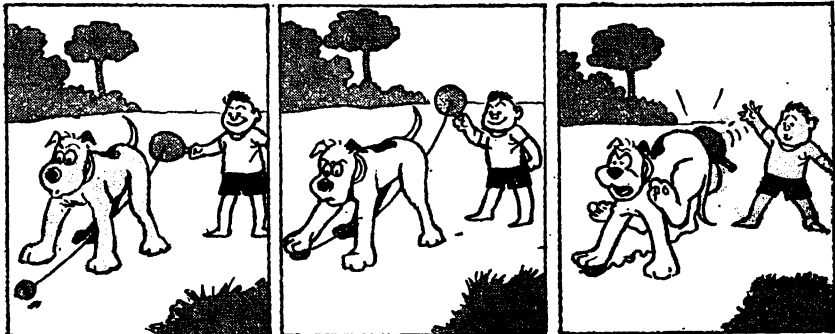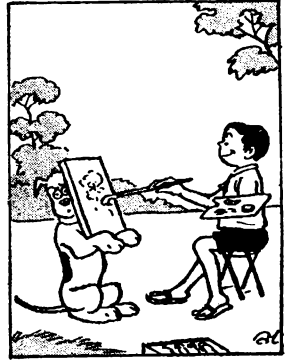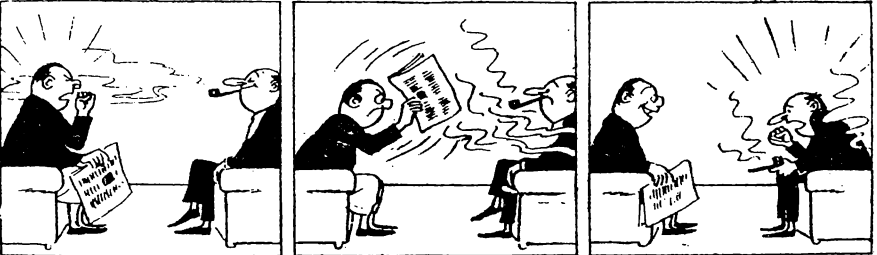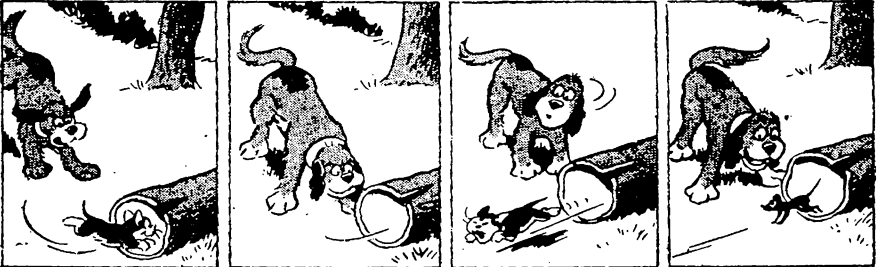
● বোকা ছাগল বোকা নয়—

● চিত্রকরের চিত্রকলা—

● বাইরে ভেতরে—

● কাজের ছেলে—

বাবা, শিগগির ওঠো তোমার অফিসের বেলা হয়ে যাবে!

বাবা, তুমি তো রোজ কাজে যাবার আগে আমাকে দশ পয়সা করে দিয়ে যাও।
এখন বিরক্ত করিস না! ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।

স্টেশনে টিকিটঘরের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে দেরী হয়ে যাবে। তুই গিয়ে তাড়াতাড়ি টিকিটটা করে রাখ।

মতলবটা মাথায় ভালোই এসেছিল। যাক এবারে আর তাড়াহুড়ো করতে হবে না।

একখানা সহরের টিকিট দিন।
টিকিট
এই নাও।

এই যে বাবা, তুমি এসে গেছো। তোমার টিকিট পেয়েছি!
সাবাশ! আমি ঠিক সময়ে এসেছি। লেট হলে কর্তাবাবু ভীষণ রেগে যাবে!

রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা? এ দিয়ে আপনাকে যেতে দেবো না—এ যে চাইল্ড টিকিট!
CHILD

টিকিটের ফেরত পয়সা দিয়ে এই আইসক্রীম কিনেছি।
ওঃ!
পরের গাড়ি ১১-৩০ মিনিটে

● উপস্থিত বুদ্ধি—

● জ্ঞানলাভ—

● দুষ্টুমির ফল—

● উলটো লাফ—

● ম্যাজিক ছাতা—

FRIENDS DO YOU THINK WE SHOULD LET AIR POLLUTION INCREASE?
NO, NEVER, WE CAN'T LET IT HAPPEN.

THEN FRIENDS, SAY- AIR POLLUTION CANNOT GO ON,
NO!
NEVER!
STOP POLLUTION

AIR POLLUTION CAN'T—WHAT? WHAT IS THIS?

COUGH! THAT SWEEPER LEFT A CLOUD OF DUST AFTER SWEEPING THE ROAD. HE HAS POLLUTED THIS ENVIRONMENT.
COUGH!
COUGH!
COUGH!

WHAT IS THE COMMOTION ABOUT BHOTOBABU?
LET'S GO AND SEE.

WHAT IS HAPPENING, THERE, DADA?
A PICK POCKET WAS CAUGHT AND IS BEING BEATEN UP.

WHERE ARE YOU GOING?
ONE OF THOSE ROGUES HAD ONCE PICKED MY POCKET. LET ME GIVE THIS ONE SOME BLOWS.

AFTER TWO MINUTES-
WHAT HAPPENED, BONDEBABU? I CAN'T RECOGNISE YOU!

THIS FISH IS BIG. SO I THINK THIS ONE SHOULD BE GIVEN FIRST PRIZE.
FISHING CONTEST

BUT
I AM ALSO A PARTICIPANT. SORRY, I AM A BIT LATE.
WOW! I THINK THIS ONE IS BEST.

THIS YEAR'S 'BEST FISHING' AWARD GOES TO BATUKESHWAR BATABYAL.

HEY, BABU! YOU OWE ME ANOTHER Rs. 40 FOR THIS FISH. OH, IF ONLY YOU TOLD ME, I WOULD HAVE GIVEN YOU A BIGGER SIZE THAN THIS.
EH!
IRK!

দি টেলিগ্রাফ ২০০৮

হাঁদা রামের স্বপ্নভঙ্গ

নবকল্লোল ১৩৭২ বৈশাখ ১৯৬৫

দড়াম!
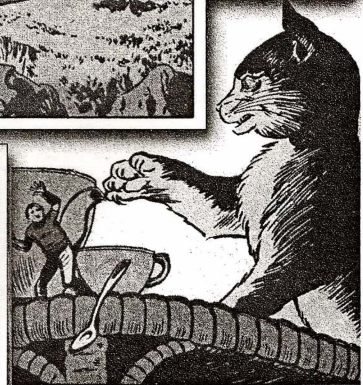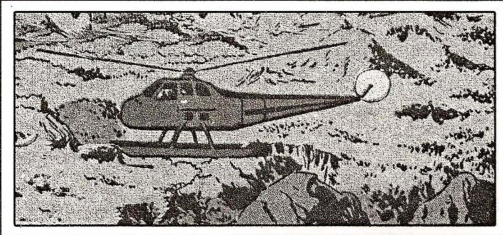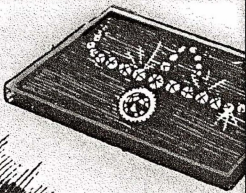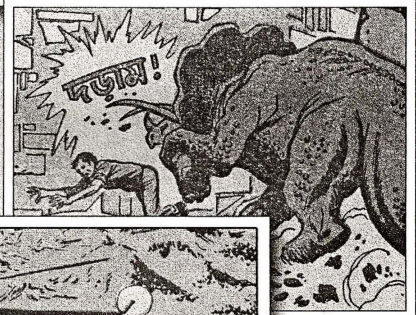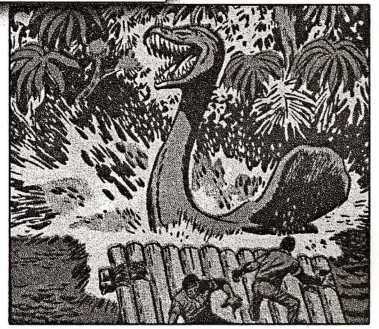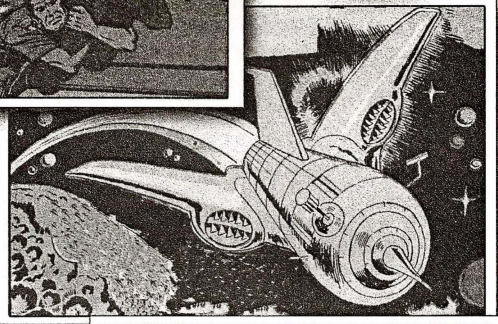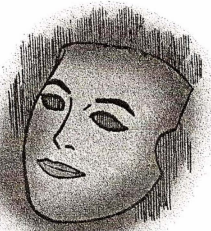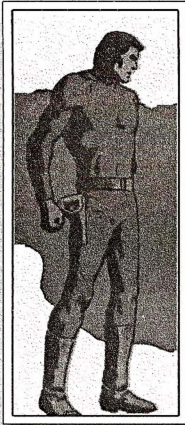
অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স

''নারায়ণ দেবনাথ মানেই 'ফানিস', নারায়ণ দেবনাথ মানেই মজার ছোটো ছোটো গল্প।" বাঁটুল দি গ্রেট, হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে ফন্টের স্রষ্টা নারায়ণ দেবনাথকে লোকে জানে এই পরিচয়েই। কিন্তু না সিরিয়াস চিত্রকাহিনিও অজস্র এঁকেছেন শ্রীদেবনাথ। রোমহর্ষক, রোমাঞ্চকর অভিযানের, রহস্যভেদী গোয়েন্দার, কল্পবিজ্ঞানের চিত্রকাহিনিও তাঁর তুলিতে সমান সাবলীল। দেবসাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকীগুলিতে মজার চিত্রকাহিনিগুলির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সিরিয়াস কমিক্সও এঁকেছিলেন তিনি। সেগুলি হল— 'অজানা দেশে' (শুকশারী, ১৩৭৬), 'স্বপ্ন না সত্যি' (পূরবী, ১৩৭৯), 'মৃত নগরীর দানব দেবতা' (তপোবন, ১৩৮০), 'দুঃস্বপ্নের দেশে' (বলাকা, ১৩৮২), 'অন্ধকারের হাতছানি (মন্দিরা, ১৩৮৪)। করেছেন 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ' (পক্ষিরাজ, ১৩৮৫), 'আশ্চর্য মুখোশ' (পক্ষিরাজ, ১৩৮৬) ইত্যাদি অলৌকিক কমিক্স। এ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা যেমন— নবকল্লোল, কিশোর ভারতী, শুকতারা পত্রিকায় তৈরি করেছেন অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স।

শুকতারা

রহস্যময় অভিযাত্রী

মেঘে ঢাকা চাঁদের ঝাপসা আলোয় বিরাট একটা আয়নার মতো পড়ে আছে বঙ্গোপসাগর!

১৩৭৯ ফাল্গুন ১৯৭৩

রহস্যময় অভিযাত্রী

অশুভ কিছু মনে হচ্ছে না! তবে সকাল হলে নিজেকে আরো নিশ্চিন্ত মনে করতে পারবো!

১৩৭৯ চৈত্র ১৯৭৩

১৩৮০ বৈশাখ ১৯৭৩

১৩৮০ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৩

১৩৮০ আষাঢ় ১৯৭৩

রহস্যময় অভিযাত্রী

আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ও আর কাউকে সতর্ক করবার সময় পেয়েছে কি?

অভিযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলো বুলেটে!

সামনের ঐ নারকেল গাছে যেন আগুনের ঝিলিক দেখলাম!

কিন্তু তাকে আর দ্বিতীয়বারের সুযোগ দিলো না অভিযাত্রী!

১৩৮০ শ্রাবণ ১৯৭৩

১৩৮০ ভাদ্র ১৯৭৩

১৩৮০ আশ্বিন ১৯৭৩

রহস্যময় অভিযাত্রী

মিঃ মাসুদ, আপনি ভারত রাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজের দেশের একজন বিজ্ঞানীকে তাদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন? এর জন্যে আপনাকে ভারত সরকার আর দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে!

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সম্বন্ধে আর কেউ কিছু জানবে না। তুমিই প্রথম এবং শেষ ব্যক্তি যে আমার স্বরূপ জানতে পারলো, আর তোমার সঙ্গেই এর শেষ হবে!

১৩৮০ কার্তিক ১৯৭৩

১৩৮০ অগ্রহায়ণ ১৯৭৩

রহস্যময় অভিযাত্রী

রহস্যময় অভিযাত্রী

ট্রিগারে চাপ দিন প্রোফেসার! ওই ওরা এসে পড়েছে!

১৩৮০ মাঘ ১৯৭৪

চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে কৌশিক আক্রমন করলো!
আআইইই
কৌশিক তুমি এখনি প্রধান দপ্তরে দেখা করো জরুরী প্রয়োজন।
ড্রাগনের থাবা থেকে এপর্যন্ত কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারে নি ভিনদেশী!
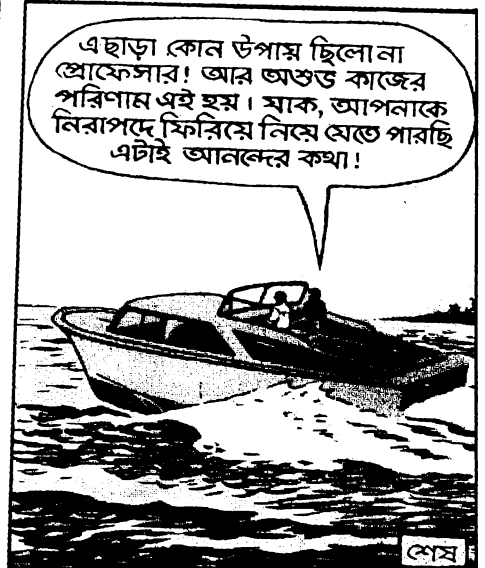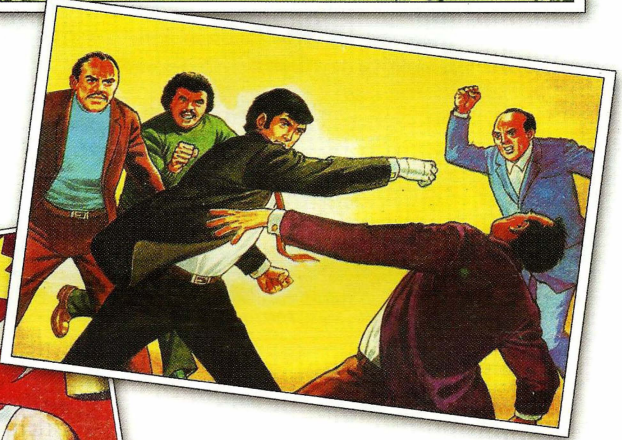
কৌশিকের অভিযান

১৯৭৫ সালে (১৩৮২ ফাল্গুন) শুকতারার প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট কৌশিক রায়ের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার চিত্রোপন্যাস 'সর্পরাজের দ্বীপে'। পরবর্তীকালে শুকতারার প্রচ্ছদেই প্রকাশ পায় কৌশিক রায়ের 'ড্রাগনের থাবা' (১৩৮৫ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্করের মুখোমুখি' (১৩৮৭ ফাল্গুন), 'অজানা দ্বীপের বিভীষিকা' (১৩৯০ ফাল্গুন), 'মৃত্যুদূতের কালোছায়া' (১৩৯২ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্কর অভিযান' (১৩৯৪ ফাল্গুন), 'স্বর্ণখনির অন্তরালে' (১৩৯৯ আষাঢ়) ইত্যাদি।

কৌশিক রায় ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের ক্ষুরধার গুপ্তচর (সিক্রেট এজেন্ট) যে মার্শাল আর্ট ও বক্সিং-এ সিদ্ধহস্ত। কৌশিকের ডান হাতটি ইস্পাতের যা থেকে গুলি, বেহুঁশ করা গ্যাস, লেসার রশ্মি বেরোয়। ইস্পাতের হাতের নখটি ছুরির মতো; প্রয়োজনে যা ছোঁড়াও যায়। আর গোপন ট্রান্সমিটার লাগানো আছে ওই ইস্পাতের হাতে।

এই রহস্য চিত্রকাহিনির ফ্রেমের ক্লোজ আপ, লং ভিশন থেকে আরম্ভ করে সংলাপের বিভাজনে সিনেমাটিক চরিত্র নিয়ে এসেছেন নারায়ণ দেবনাথ। ছবিগুলির অ্যাকশানধর্মিতা বা রিয়ালিস্টিক নেচার বিশ্বমানের। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

শুকতারা

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন • ১৩৮৭

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

অন্য রাষ্ট্রের কাছে পাচার হয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই কাহিনী...

নারায়ণ দেবনাথ

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

দলিলটা সে ওদেরই একটা প্লেনে করে আনছিলো, কিন্তু ওরা টের পেয়ে জঙ্গী প্লেন নিয়ে ওকে আক্রমণ করে। সে আমাদের ঘাঁটিতে যোগাযোগ করে এবং জানাতে চেষ্টা করে কি ঘটছে, আর বেতারঘাঁটিও কি বলছে সেটা রেকর্ড করে নেয়। যদি মনে করো তুমি ওটা শুনতে পারো!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

ও আমাকে এবার আঘাত করেছে...! আহ্! আমি নিরুপায়, উচ্চতা হারিয়ে আমি নেমে যাচ্ছি স্লুবি বেসার দ্বীপের উত্তর সমুদ্র উপকূলের দিকে...

হা ঈশ্বর, কি মর্মান্তিক!

তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি কৌশিক, কিন্তু দিবাকর বীরের মৃত্যু বরণ করেছে' আমরা ওর মতো মানুষের জন্যে গর্বিত!

দুঃখ এই যে, ওর এই আত্মত্যাগ নিষ্ফল হলো...এখন পর্যন্ত, চিন্তা করে দেখো সামান্য কয়েক ফুট জল প্লেন আর তার সঙ্গে দলিলটা ঢাকা দিয়ে রেখেছে। এখন একমাত্র উপায়...
কি উপায় স্যার?

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

একমাত্র উপায় হলো ওটা জলের তলা থেকে উদ্ধার করে আনা। অবশ্য কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু চেষ্টা চালানো যেতে পারে!
আপনি কি মনে করেন সমুদ্রের তলা থেকে ওই দলিল পাওয়া যাবে?

আমার দৃঢ় অভিমত তাই
তাহলে আমাকে চেষ্টা করতে দিন স্যার, ওর অসমাপ্ত কাজ আমি শেষ করি।

কয়েক দিন পর সুবি বেস্নারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো কৌশিক...

ক্যাপ্টেনের কেবিনে...
আমাদের পরিচয় হবে আমরা সামুদ্রিক গবেষণার জন্যে বেরিয়েছি...

আমি হলুম প্রোফেসর রমানাথন দলের প্রধান। আমাদের গবেষণার বিষয় সমুদ্রের তলায় পলি পড়া নিয়ে।

ভয়ঙ্করের
মুখোমুখি

যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলো . . .

দিবাকরের প্লেন যেখানে ভেঙে পড়েছিলো সেই সঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে!
কাউকে প্রশ্ন করতে গেলে সন্দেহ করবে!

দ্বীপের ডাচ প্রতিনিধি ওদের আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো . . .
স্বাগতম! আমার নাম বেনসন। এখানে বড় বেশী লোকজন আসে না, আপনাদের দেখে ভালো লাগছে!
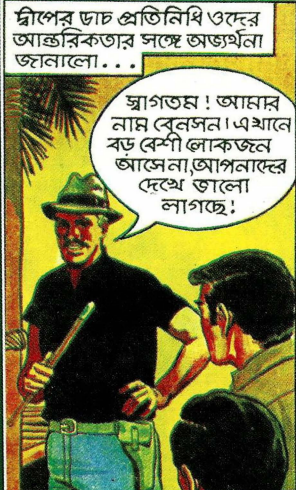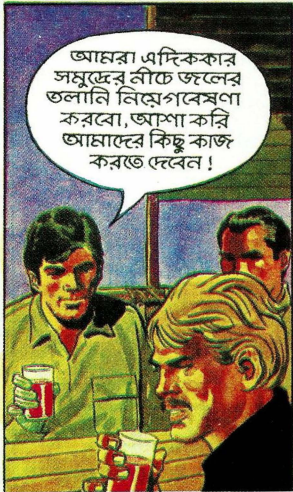
আমরা এদিককার সমুদ্রের নীচে জলের তলানি নিয়েগবেষণা করবো, আশা করি আমাদের কিছু কাজ করতে দেবেন!
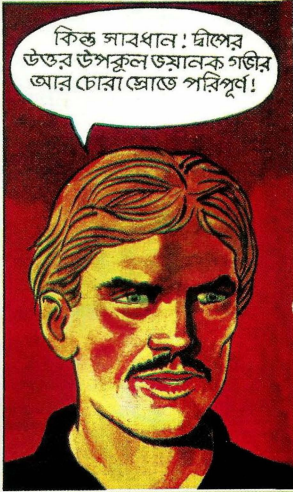
কিন্তু সাবধান! দ্বীপের উত্তর উপকূল ভয়ানক গভীর আর চোরা স্রোতে পরিপূর্ণ!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

বেনসন কৌশলে আমাদের উত্তর উপকূল সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলো। তার মানে ওখানে কিছু আছে ও জানে।
আমারও তাই মনে হয় কৌশিক। ও চায় না আমরা ওদিকটায় যাই।

পরদিন সব তোড়জোর ঠিক...
এখানে থামাও। এখান থেকেই সোজা ডুব দেবো!

এবারে ডুব দেবো!

খাঁড়ির মধ্যে কৌশিক যখন চলেছে, তখন একটা কিছু অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটতে চললো...

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

হাঙর! হিংস্র প্রাণীটা নিঃশব্দে পিছন দিক দিয়ে এলো, তারপর···

কৌশিকের ওপর একটা ছুটন্ত রেল ইঞ্জিনের মতো এসে আক্রমণ করলো!
আরেব্বাস!

ওঃ! একটুর জন্যে বেঁচে গেছি!

কিন্তু আবার ও ফিরে আসছে। এবার নির্ভুল ভাবে!
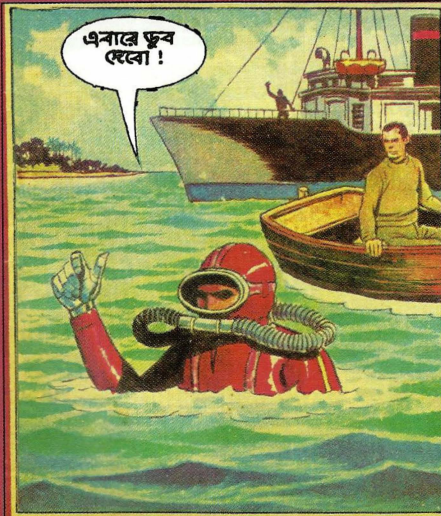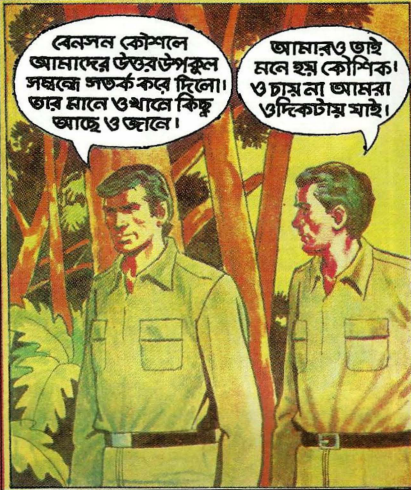
ভয়ঙ্করের মুখোমুখি
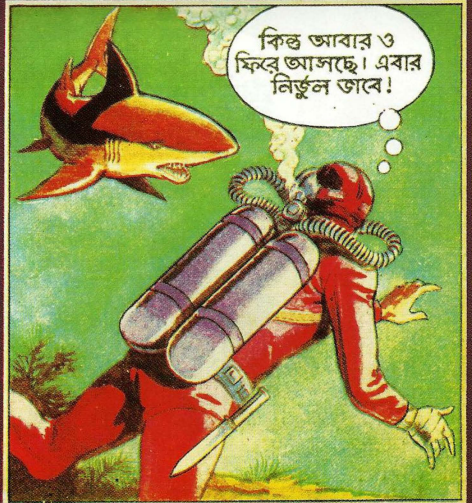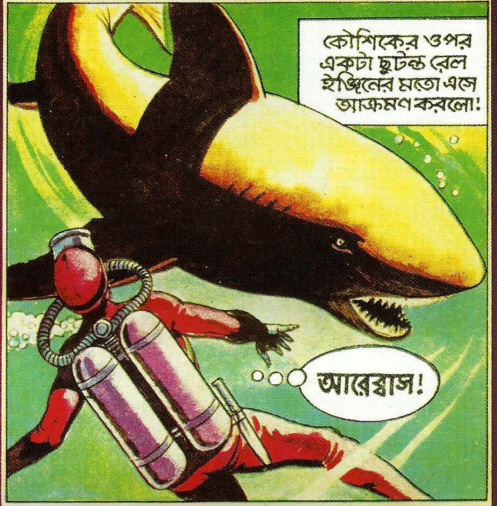
আক্রমণ মোকাবিলার জন্য কৌশিক তৈরি হলো…
চটপট ওকে কাবু করতে না পারলে বিপদ ঘটবে !

মুহূর্তের অসাবধানতার জন্যে ছুরিটা খোয়া গেলো! এখন ওর কবল থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র ভরসা—

ওকে যদি অন্ধ করে দিতে পারি !

ভয়ঙ্করের
মুখোমুখি

আবার আক্রমণ করতেই...
এবার তোকে বাগে পেয়েছি!

হাঙরের দুটো চোখই নষ্ট করে দিলো কৌশিক...
এ ছাড়া কোন উপায় ছিলো না!

রক্তের গন্ধে আরো হাঙর আসবার আগেই পালাতে হবে!

কৌশিক যখন জলের ওপর মাথা তুললো...
তাড়াতাড়ি! অনেক হাঙর আসছে!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

আপনি উঠুন। আমি ওদের দূরে হঠিয়ে রাখছি!

আমরা বোকা তাই হাঙর তাড়াবার রাসায়নিক পদার্থ সঙ্গে না নিয়েই জলে নেমেছি পরের বার আর এটা হবে না।
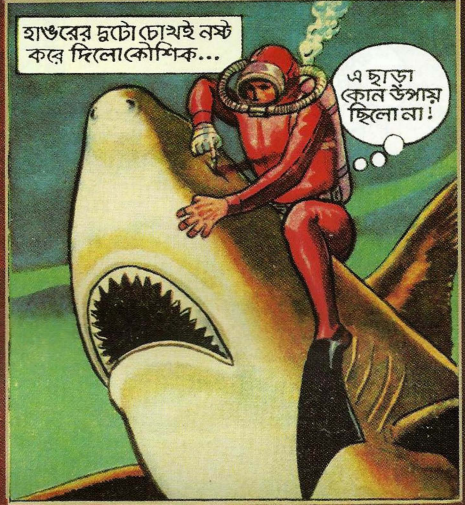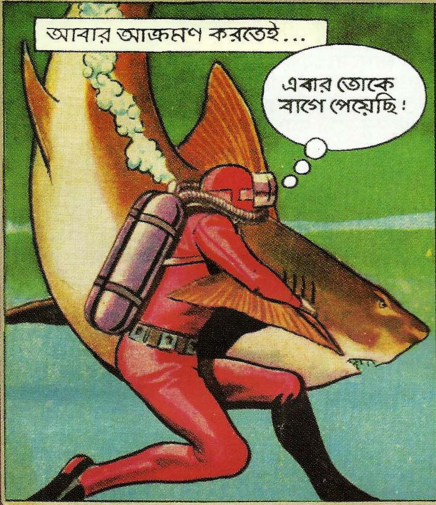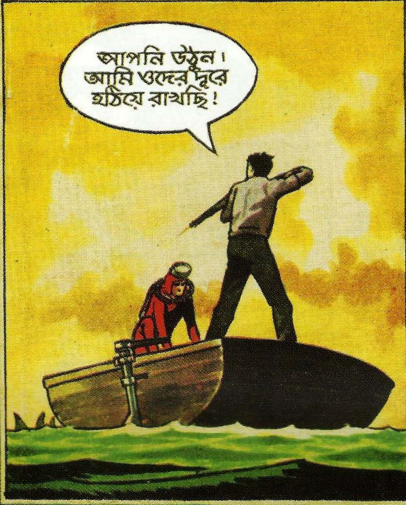
তাদের সমস্ত কার্যকলাপ খুব সতর্কতার সঙ্গে সমুদ্রতীর থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছিলো।
আহ! হাঙরেরা ওদের তাড়িয়েছে!
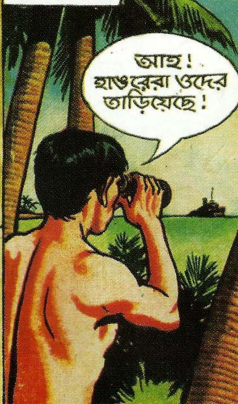
ওরা গবেষনার কাজে এসেছে বলছে বটে কিন্তু মনে হচ্ছে ওদের কার্যকলাপ বেশ সন্দেহজনক! ওরা সমুদ্রের তলায় কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে কিন্তু হাঙরের তাড়ায় পালিয়ে এসেছে!
এবার ওরা হাঙর তাড়াবার জিনিস নিয়ে আসবে আর প্লেনটাকে খুঁজে পাবে! আমাদের কিছু করতেই হবে!

বন্দী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, স্যার!
ঠিক আছে, দরজা খোলো!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে কি কিছু ভেবেছো?
হ্যাঁ, আর তার জবাব হচ্ছে না!
মূর্খ! এর জন্যে তোমার বন্ধু মারা পড়বে! তুমি কি ভুলে গেছো যে, সে এখন আমাদের হাতের মধ্যে!
এ আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি তোমার কথা রেখে ওর কোন ক্ষতি করবে না!
আমরা যা ভাবছি তা সত্যি হলে তার অর্থ হচ্ছে তুমি যে দলিলটা সঙ্গে করে আনছিলে ওরা সেটা জানতে পেরে ওটার খোঁজ করছে!
নিশ্চয়ই ওরা জানে! তোমরা ভয় দেখানোর আগেই আমি ওদের জানিয়ে দিয়েছিলাম!

তোমাকে এবার আমি গুলি করে মারবো!
তাই মারছো না কেন? তুমি জানো তোমার ঐ মুখ দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি!

শোন দিবাকর! সবাই জানে তুমি মৃত! সেজন্য তোমাকে বীরের সম্মান মরণোত্তর পদকও প্রদান করেছে! সুতরাং ওরা ধারণাই করবে না যে তুমি নোংরা বিশ্বাসঘাতকের মতো দলিলটা আমাদের হাতে দিয়েছো! এতে নিজের কাছে তুমি অপরাধী হয়ে থাকবে কিন্তু বন্ধুর প্রাণ তুমি বাঁচাবে। আমরা ঐ জলে ডোবা প্লেন দলিলটা উদ্ধারের জন্যে একটা অভিযানের ব্যবস্থা করেছি তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

পরদিন কৌশিক আবার যাবে বলে মনস্থির করলো।
কাল তুমি হাঙরের সঙ্গে লড়াই করেছো, আজ আর না গেলেই ভালো করতে। গলায় ওটা কি পরেছো?
কোন ভয় নেই। এবার আমি হাঙর তাড়াবার ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি আর এটা আমার মায়ের দেওয়া কবচ বিশেষ অভিযানে সঙ্গে রাখি।
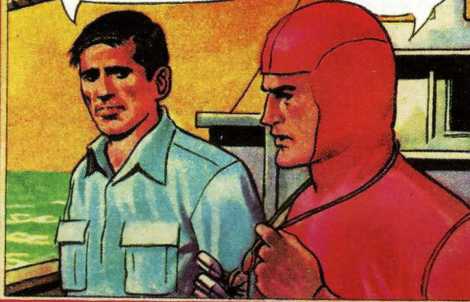
এই হলো হাঙরদের জন্যে কিছু ব্যবস্থা!

আরও একটা প্রতিরোধকের মোড়ক সঙ্গে নিয়ে কৌশিক খাড়ির দিকে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো...
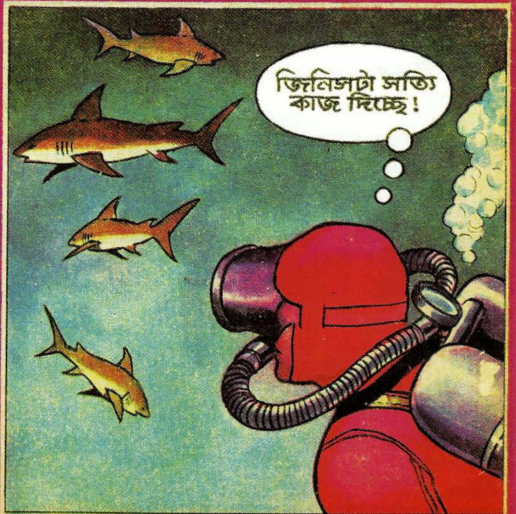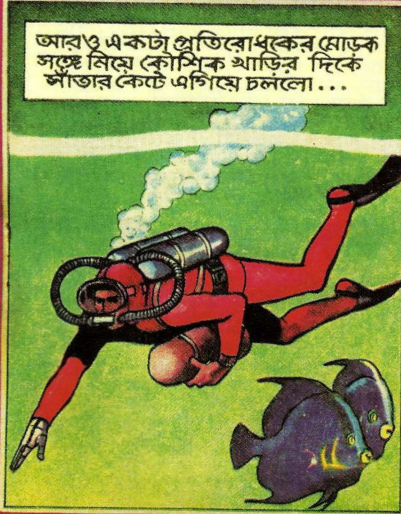
জিনিসটা সত্যি কাজ দিচ্ছে!

ভয়ঙ্করের
মুখোমুখি

কিন্তু তার কাছাকাছি আর এক ধরনের হাঙর দেখা গেলো যাদের ঐ ওষুধ দিয়ে তাড়ানো যাবে না . . .
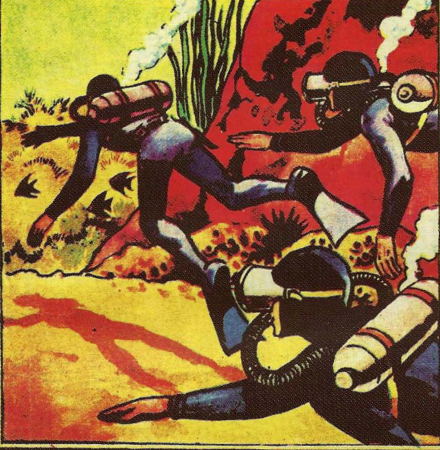
শেষে প্লেনের ভগ্নাবশেষ কৌশিক দেখতে পেলো! সে বন্ধুর দেহ খোঁজার জন্য তাড়াতাড়ি এগোলো...

দিবাকরের দেহাবশেষ আর দলিলটা নিশ্চয় পাওয়া যাবে!

ঠিক সেই মুহূর্তে শত্রুপক্ষের অনুসরনকারীরা কৌশিকের দিকে এগিয়ে এলো . . .

এবং অতর্কিতে কৌশিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো . . .

ভয়ঙ্করের
মুখোমুখি

কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করে বিদ্যুৎবেগে বিপক্ষের নিশ্বাস নেবার নল ভেঙে দিলো কৌশিক...
দুঃখিত বন্ধু! এছাড়া আমার বাঁচার উপায় ছিলো না।

দ্বিতীয় আততায়ী পিছন থেকে আক্রমণ করলো কিন্তু কৌশিক তার লৌহমুষ্টির তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো...

ডাইভিং স্যুটটা ছিঁড়ে দিয়েছে! এটা এখুনি ছেড়ে ফেলতে হবে।
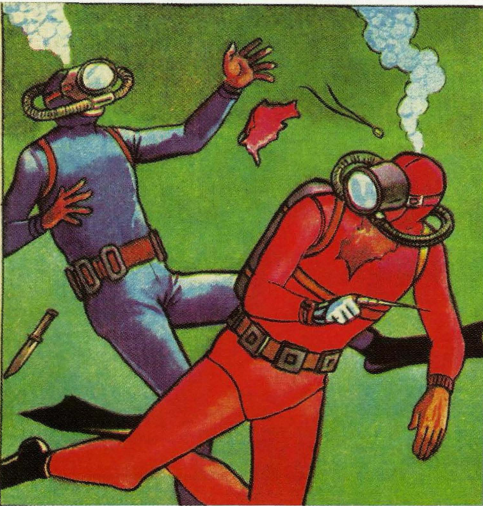
ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

ডাইভিং সুট ছিঁড়ে যাওয়ায় কৌশিক যখন বোটে ফিরে গেলো, সেই সময় জলের নীচে শত্রুচরেরা গোপন দলিল খোঁজার জন্যে ভাঙা প্লেনের দিকে দিবাকরকে নিয়ে চললো!
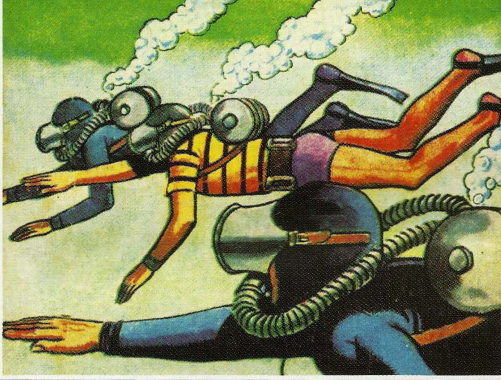
জোর করে দিবাকরকে দিয়ে লুকানো জায়গা খোলানো হলো...

দলিলটা একটা জলনিরোধক বাক্সের মধ্যে রাখা ছিলো...
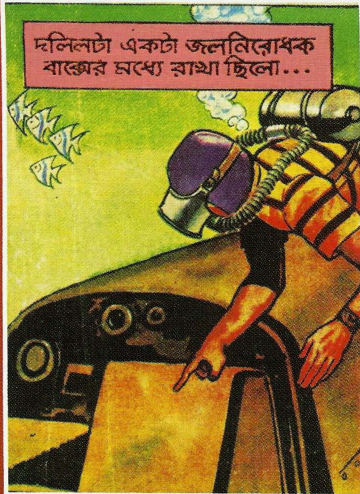
ওরা যখন দলিলের বাক্সটা সরাতে ব্যস্ত তখন সহসা কোন কিছু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো...

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

এটা কী?

ওদিকে কৌশিক...
কোন সন্দেহ নেই প্রতিপক্ষ ওই দলিলটা ফিরে পেতে চেষ্টা করছে, এ ব্যাপারে ওদের পরাস্ত করতে হলে আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে!

তোমার লকেটটা হারিয়েছে, কৌশিক!
তাইতো দেখছি!

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌশিক আবার জলে নামলো এবং হাঙর তাড়ানো ওষুধ ছড়িয়ে ভাঙা প্লেনের দিকে যাত্রা শুরু করলো...
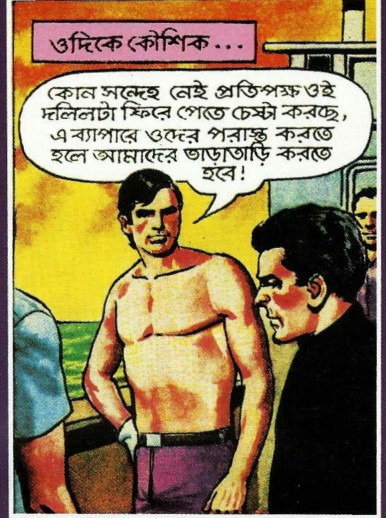
ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

কৌশিক ওখানে পৌঁছে বালিতে টানা হ্যাঁচড়ার দাগ দেখে আসল সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করলো...
আমার আগেই ওরা ওটাকে তুলে নিয়ে গেছে দেখছি!

দ্রুত অনুসন্ধানে সন্দেহ নিরসন হলো...

জাহাজে ফিরে...
এদিকে আশেপাশে কোন মোটর বোট নেই। মনে হয় ওরা খাঁড়ির ওদিক থেকে এসেছে। ওদিকটা একবার দেখতে হবে!

সেই সময় একান্ত কাছে থেকেও বহু দূরে তার প্রাণের সুহৃদ দিবাকর মিশ্র...
এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...! অথচ আমি জানি যে আমি ঠিক! এইতো এটায় তার নাম খোদাই করা রয়েছে!

কিন্তু এটা কি করে বিধ্বস্ত প্লেনের কাছে এলো? এর অর্থ হলো কৌশিক কাছাকাছিই আছে। সে বন্দী নয় যা ওরা আমাকে বলেছে। অথবা ও নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে! তাহলে এবার আর ওদের নির্দেশ আমি মানছি না!

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

সন্ধ্যা নামতেই কৌশিক তার পূর্ব পরিকল্পনা মতো অভিযানে বেরিয়ে পড়লো...
ভোরের আগেই খাঁড়ির কাছে পৌঁছোতে হবে!

নিঃশব্দে কিছুদূর যাবার পর...
দাঁড়াও! নড়াচড়া করলেই গুলি চালাবো! সুবি বেসারের পুলিশ তোমায় ঘিরে রয়েছে!

শুনুন, সার্জেন্ট! আপনি ভুল করছেন! আমি...

এজেন্ট আমাকে সাবধান করেছিলো! সে নির্বোধ নয়, সে ভুল বলেনি!
ঠিক আছে আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন! আমি ওকে বুঝিয়ে বলবো...

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

নরকের কীট! এসবের অর্থ হলো কৌশিকের বিপদ ঘনিয়ে এসেছে!

একটা সুযোগ নেবার এই সময়! এই দেশলাইটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, এটা আমাকে সাহায্য করবে, আশা করি এটা খারাপ হয়ে যায় নি!
কিছুদিন আগেই সে এই মতলব এঁটেছিলো...

এটা একটা চমৎকার হাতিয়ারের কাজ দেবে!

আগুন আর ধোঁয়া প্রহরীকে আতঙ্কিত করলো...
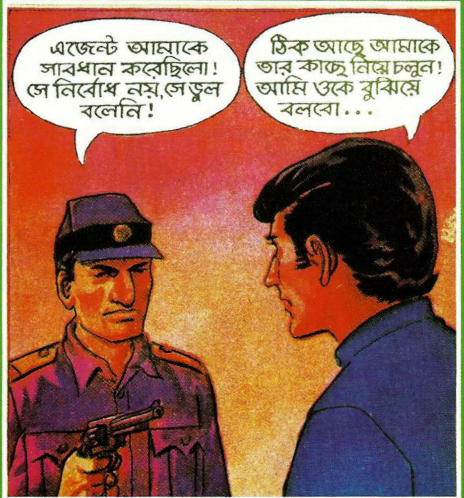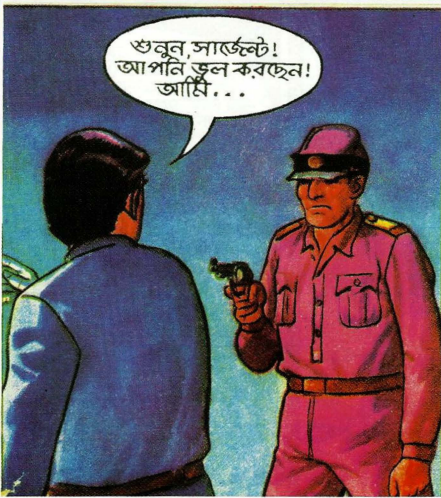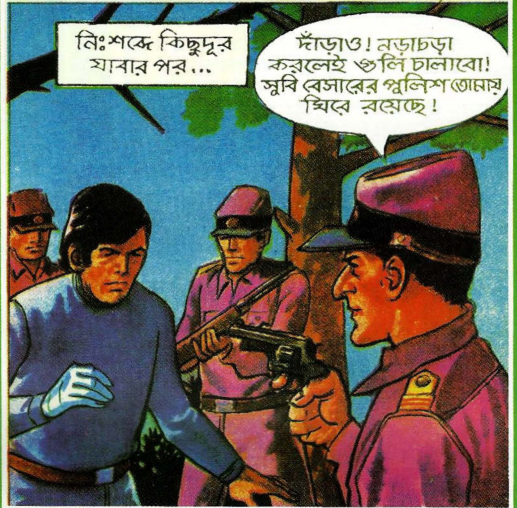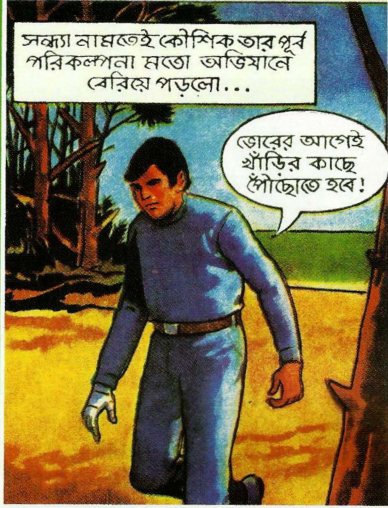
ভয়ঙ্করের
মুখোমুখি
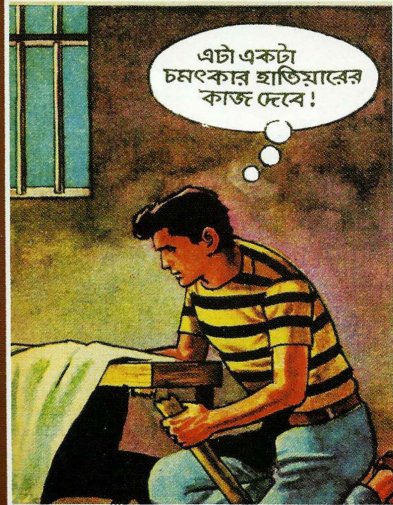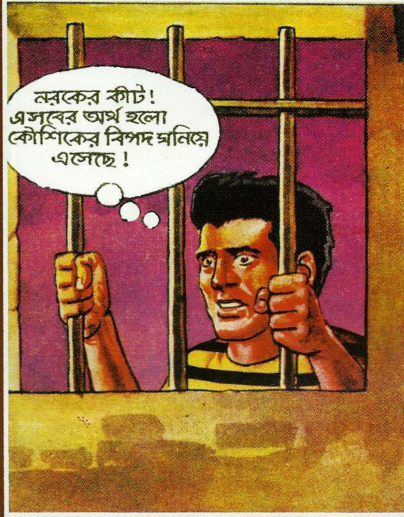
আদিম অস্ত্রের প্রচণ্ড এক আঘাতেই পাহারাদার নিশ্চল হয়ে গেলো...
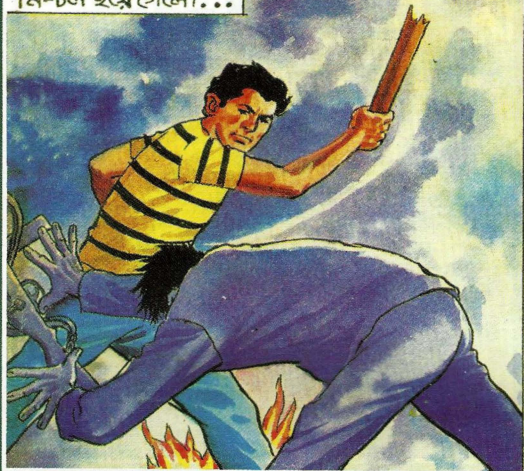
ওদিকে কৌশিক...
আগে বাঁধনটা খোলা দরকার।
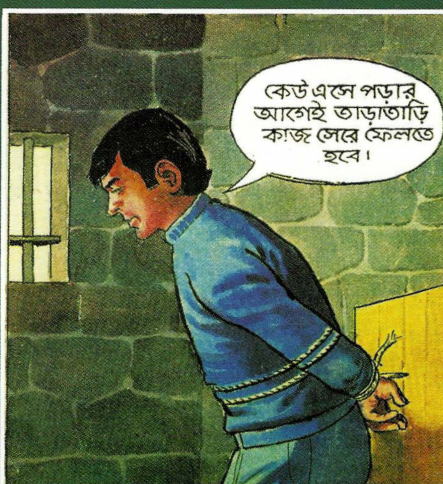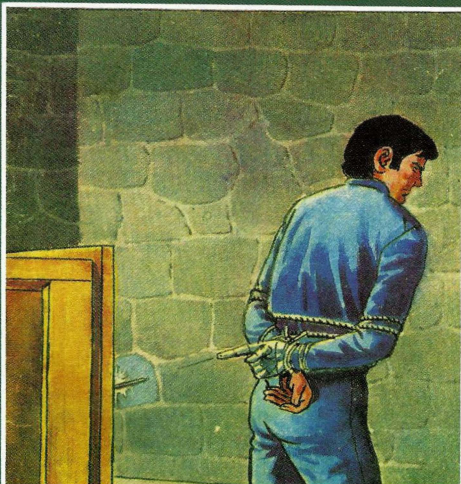
কেউ এসে পড়ার আগেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে হবে।

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

ওদিকে...
নতুন বন্দী ঐ ঘরে মধ্যে বাঁধা অবস্থায় আছে. স্যার!
চমৎকার! তোমার কাজের পুরস্কার তুমি যথা সময়েই পাবে, সার্জেন্ট!

তোমরা এখানে থেকে নজর রাখো। আমি গিয়ে নিজের হাতে গুপ্তচরটাকে খতম করে আসি। তারপর দিবাকরকেও শেষ করবো।

কিন্তু দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই...

ভয়ঙ্করের মুখোমুখি

ওদিকে
দুম
দুম
এবার কৌশিকের সাহায্যের জন্যে যেতে হবে।

দিবাকর দ্রুত বন্দীশালার দিকে ছুটে গেলো...
কৌশিক! আমি দিবাকর!

মনে হলো আমি যেন দিবাকরের গলা শুনলাম... না সে তো অসম্ভব!
কৌশিক! উত্তর দাও! তুমি ঠিক আছো তো?
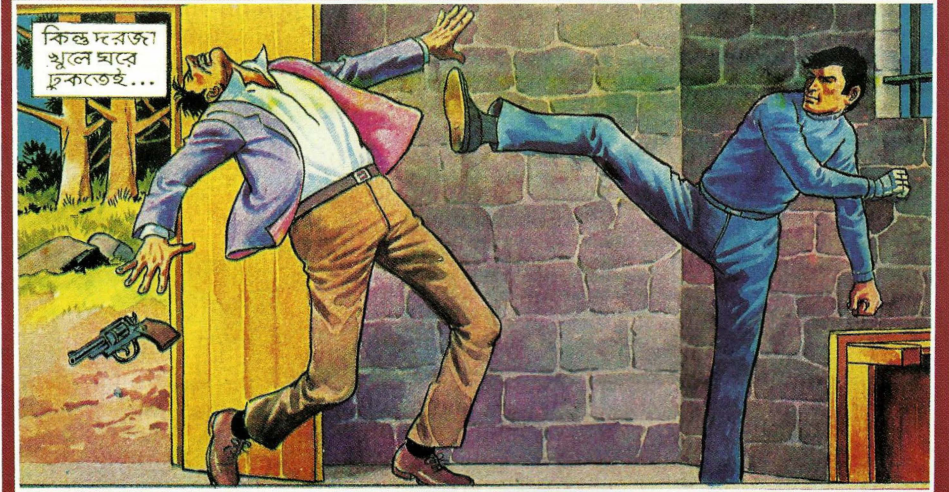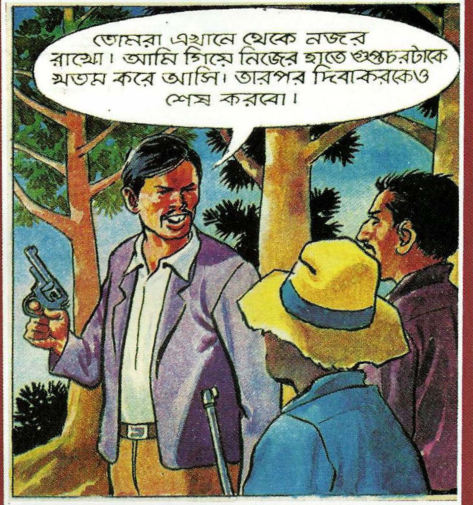
দিবাকর!
কৌশিক!
শেষ
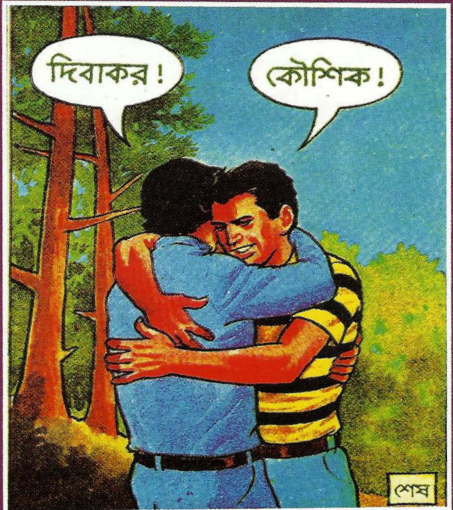
সর্পরাজের দ্বীপে
বোম্বাই এর উপকূল থেকে একটা পুরোনো, বহু সমুদ্র যাত্রায় ক্ষতবিক্ষত জাহাজ বন্দর ছেড়ে আস্তে আস্তে বার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলো। সবাই জানলো ওতে ব্যাঙের মাংস বিদেশে যাচ্ছে কিন্তু আসলে ঐ মাংসের পেটিতে আছে ভারত সরকারের প্রায় দশকোটি টাকা মূল্যের সোনা।
নারায়ণ দেবনাথ

একঘন্টা পরে
দুটো ইঞ্জিনই সামনে আধা স্পীডে চালু করো!
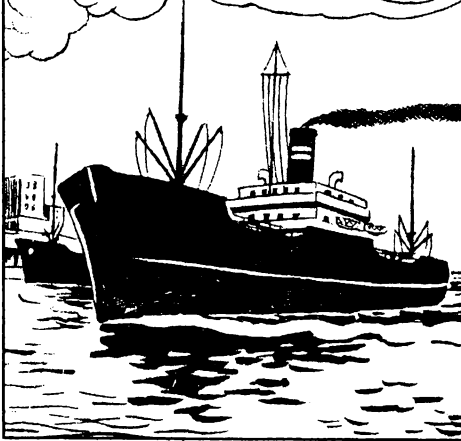
বন্দরের একধারে।
যাক, জাহাজটা নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলো। সবকিছু ঠিক মসৃণভাবে হয়ে গেলো।
হাঃ হাঃ। আপনি কি ভেবেছিলেন--- বিরাট বন্দর ডাকাতি হবে?

ওদিকে
না, সে ভয় নেই। প্রথমত ব্যাপারটা খুবই গোপন রাখা হয়েছে, আর ওই জাহাজের ক্যাপটেন, মাঝি মাল্লা সবাই নৌবিভাগের আর পুলিশের দক্ষ লোক।

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮২, চৈত্র ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩, বৈশাখ ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩ আষাঢ় ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩, শ্রাবণ ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩ ভাদ্র ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

উনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। সোজা ভেতরে চলে যান।

একটা ছায়াচ্ছন্ন ঘরের এক ধারে…
এসো কৌশিক! এখানে আসার সময় তোমায় কি কেউ লক্ষ্য করেছে?
না কেউ করেনি!

এক নম্বর সোজা কাজের কথায় এলো…
ফিলিপাইন থেকে আট নম্বর এই মাত্র একটা মস্ত ঝামেলার খবর পাঠিয়েছে। বম্বে শহরে তার ব্যবসায়িক যাতায়াত আছে। সে জানতে পেরেছে যে বম্বে থেকে ছাড়া একটা জাহাজকে হাই-জ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যার মধ্যে ছিলো ভারত সরকারের দশ কোটি টাকার সোনা!

এই পর্যন্তই যথেষ্ট খারাপ… কিন্তু এর থেকেও সাংঘাতিক ঘটনা হচ্ছে যে—ঐ জাহাজের প্রত্যেক মাঝি মাল্লা ছিলো নৌ বহর আর পুলিশের বাছাই করা লোক… কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে এই ঘটনার কথা কিছুই জানে না বলেছে!

এর চেয়ে বেশী কিছু এখন আমার জানা নেই। কিন্তু সরকার নির্দেশ দিয়েছেন এর হদিশ বের করতে। এখন তোমার ওপর সব নির্ভর করছে!
আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো স্যর।

ঠিক আছে… প্রধান দপ্তরের সঙ্গে সংযোগ রেখো। তোমার যা কিছু প্রয়োজন তারা তোমাকে দেবে! শুভ যাত্রা!
ধন্যবাদ নম্বর এক!

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩ কার্তিক ১৯৭৬

সর্পরাজের দ্বীপে

হলুদ পোষাক পরা মূর্তি এগিয়ে এলো···
দুর্ঘটনা? কিন্তু আমার এখানকার নিয়ম তুমি জানো! দুর্ঘটনা বলে এখানে কিছু চলবে না!
আমার কিছু করার ছিলো না প্রভু··· আমার পা পিছলে গিয়েছিলো···

তোমার মতো অকর্মা অপদার্থ যদি আমার চারপাশে থাকে, তাহলে আমার উচ্চাশা পুরণের প্রত্যাশা করবো কি করে?

সহসা তার গলার স্বর চাবুকের মতো আছড়ে পড়লো!
তোমার মতো অযোগ্য লোকের আর প্রয়োজন নেই! আমার আদেশ অবহেলার যা পরিণাম তাই হবে! ওকে গর্তে ফেলে দাও, মঙ!

তৎক্ষণাৎ এক দানবাকৃতি মূর্তি ভয়ার্ত লোকটির ওপর ছায়া ফেললো।
না···গর্তে নয়! দয়াপ্রভু··গর্তে নয়!

অসহায় লোকটিকে ঐ দানব একটা বেড়ালছানার মতো তুলে নিয়ে চললো···
না··· এটা দুর্ঘটনা! গর্তে নয়···দয়া করে গর্তে ফেলোনা···

সামনের বাড়ির একটা বড় ঘরে, একটা বোতা
টিপতেই ঘরের মেঝে সরে গেলো···

সর্পরাজের দ্বীপে

পরমুহূর্তে…
আঁ আঁ ইইই!

না না, মিনতি করছি আমাকে দয়া করো… আঁ আঁ আঁ আঁ!

কাজ শেষ করে মানুষদৈত্য বাইরে বেরিয়ে এলো…
সব সময়েই তুমি আমার ইচ্ছা পূরণ করো মঙ! তুমি আমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষী তাই না? আমি সব সময় তোমার ওপর নির্ভর করতে পারি। তুমি যেমন শক্তিমান তেমনি সাহসী! তুমি কথা বলতে পারো না এতে আরো সুবিধে হয়েছে।

তোমার এবং আমার চমৎকার পোষ্যদের সাহায্যে আমি পৃথিবীর সেরা ধনী হবো! কারো… কোন মানুষেরই আমাকে থামাবার ক্ষমতা নেই।

সেই একই দিনে, কৌশিক রায় অজানা অভিমা প্লেনে ফিলিপাইন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হলো
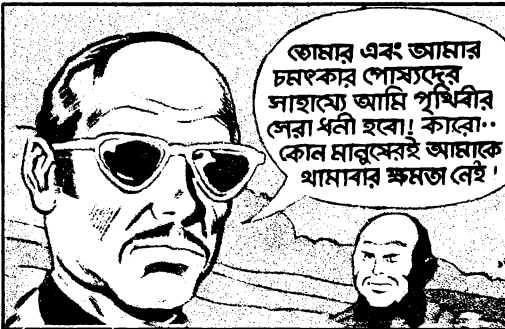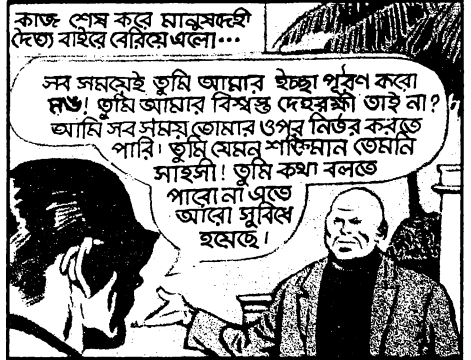
সর্পরাজের দ্বীপে

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিশাল যাত্রীবাহী বিমানটি ভোরবেলা ম্যানিলা বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করলো ...
1

চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ! আট নম্বর যেই হোক, সে সুন্দর জায়গায় ঘাঁটি পেয়েছে!
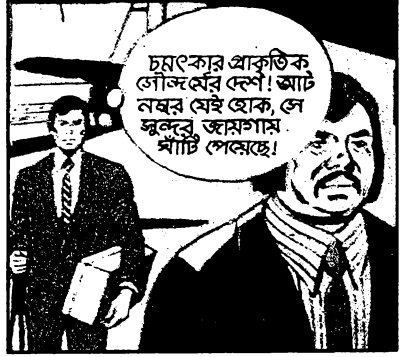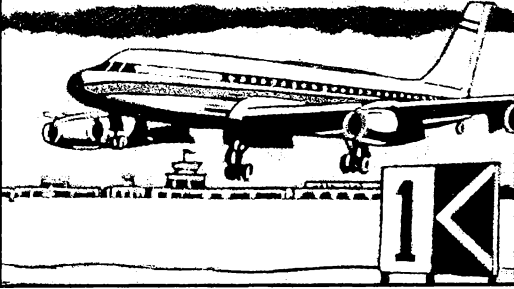
পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কৌশিককে নিতে কেউ বিমান বন্দরে আসেনি ...
ধীবরপল্লীতে আমাকে আট নম্বরের খোঁজ নিতে বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে পৌঁছই কি করে?

একটি চলতি বাস প্রশ্নের উত্তর জোগালো ...
ধীবর পল্লী
আঃ, এইতো পেয়ে গেছি!

প্রাচীন যানটি ধূলি ধূসরিত সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তা দিয়ে সশব্দে ছুটতে লাগলো ...

মাইল পাঁচেক যেতে না যেতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
কী-কী ব্যাপার?
দুড়ুম!

সর্পরাজের দ্বীপে

পুরাতন মানটি কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেলো…
খুব দুঃখিত মশায়রা…কিছু মেরামত করতে হবে! খুবই পুরানো গাড়ি…তবে মাত্র মিনিট কুড়ি লাগবে:
যাক, নেমে পা টা ছাড়িয়ে নি!

শুধু একজন জেলেকে দেখা গেলো…
লোকটা মনে হচ্ছে একটা মরা অক্টোপাস পেয়েছে!

কৌশিক সবে ফিরেছে, এক তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে এলো!
আঁ আঁ আঁ!
কি ব্যাপার..?

বাঁচাও!
বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে কৌশিক রায় কাজে নেমে পড়লো!
ভয় নেই…
আমি আসছি!

লোহ মুষ্টির প্রচণ্ড আঘাত জেলেটিকে মুক্ত করলে..
দূর হ। বিটকেলে শয়তান!

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৩ চৈত্র ১৯৭৭

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ বৈশাখ ১৯৭৭

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৭

সর্পরাজের দ্বীপে

লাফিয়ে উঠলো কৌশিক!
দাঁড়ান! কি যেন বলছিলেন?
ওদের সম্বন্ধে… ওরা প্রাণ ফিরে পেলো? কেন… কি হলো?

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! আপনার গাড়ি আছে?
হ্যাঁ… ওটা ওই বাইরে! কিন্তু…

এখন কিন্তুর সময় নেই! চলুন!

গাড়ি চালাতে চালাতে কৌশিক সব বললো…
এখানে আসার সময় সমুদ্রের ধারে একজন স্থানীয় জেলেকে অক্টোপাসের কবল থেকে রক্ষার জন্য আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিলো! সেই জেলেকে খুঁজে তার সঙ্গে কথা বলতে চাই!
খুঁজে বের করে কথা বলতে হবে? কিসের জন্যে?

কারণ সে ঐ অক্টোপাস সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলেছিলো, আপনি সেই জাহাজের নাবিকদের সম্বন্ধে যা বলেছেন!
সত্যি? রদ্দুরে তোমার মাথা গরম হয়নি তো?

ঘাবড়াবার কিছু নেই… মাথা আমার ঠিকই আছে! আমি ভাবছি অক্টোপাসটা ঐ একই অসুখের শিকার হয়েছিলো… হয়তো কোন দুর্ঘটনায়!
কী? তুমি বলতে চাও ঐ সোনা চুরির জন্যে কাছাকাছি অঞ্চলের লোকেরা দায়ী?

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ শ্রাবণ ১৯৭৭

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ ভাদ্র ১৯৭৭

সর্পরাজের দ্বীপে

আট নম্বর এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপর···
মনে হয় এর ব্যবস্থা করা যাবে! আমার এক বন্ধুকে ফোন করে কিছু খোঁজখবর নেবো।

টেলিফোনে কথাবার্তার শেষে···
সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো তুমি ডাক্তার ত্রিলোক কাপুর একজন হেলথ্ ইনসপেক্টর যে এই অঞ্চলের প্রতিটি দ্বীপের স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সম্পর্কে তদারক করতে যাবে!
তাহলে আমি টোয়াঙ্গায় যাত্রা করছি! চমৎকার!

সুতরাং পরদিন সকালে ভাড়া করা মোটর লঞ্চে ডাঃ ত্রিলোক কাপুর যাত্রা করলো···

ক্রমশঃ টোয়াঙ্গা দ্বীপ আবছা ভাবে দৃষ্টিগোচর হলো···
এ যেন বুনোহাঁসের পেছনে ছোটা, কিন্তু তা যদি না হয় তো দশ কোটি টাকার সোনা এই দ্বীপেই কোথাও লুকানো আছে!

লঞ্চ জেটির কাছাকাছি আসতেই কৌশিক দেখলো দুটো মূর্তি অপেক্ষা করছে···
সঙ্গে কদাকার ময়াল, তাহলে নাগেশ্বর নিজেই এসে দাঁড়িয়ে আছে!

প্রফেসর রাও?
হ্যাঁ··· আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

সর্পরাজের দ্বীপে

সুপ্রভাত! আমার নাম ডাঃ ত্রিলোক কাপুর! এই যে আমার পরিচয় পত্র!
ইন্সপেক্টর অব হেলথ, অ্যাঃ? মনে করি আপনি চারদিকটা দেখতে চান! ওঃ, আপনি দেখেছি স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুব গোঁড়া!

এ হচ্ছে মণ্ড, আমার সুহচর ··· কিন্তু দুঃখের বিষয় বেচারা জন্ম বোবা!

এই সাপ নিয়ে চলতে আপনার ভয় করে না প্রফেসার?
মোটেই না ··· লীমা আমার খুব পোষ মানা। আচ্ছা মণ্ড ওকে রেখে আসুক।

দ্বীপের মালিকের সঙ্গে কৌশিক সবকিছু ঘুরে দেখতে লাগলো ···
চমৎকার জায়গা প্রফেসর ··· এতো প্রচুর টাকার ব্যাপার!
ঠিক ··· কিন্তু আমি সাহায্য পাই! সাপের কামড় বড় সাংঘাতিক ডাক্তার ··· কাউকে তো প্রতিষেধকের জন্যে চেষ্টা করতে হবে!

দেওয়ালে লাগানো একটা কাঁচের ঘরের সামনে দাঁড়ালো ···
ওদের সম্বন্ধে জানলে দেখবেন যে সাপ মোহময় প্রাণী! উদাহরণ স্বরূপ একেই দেখুন আফ্রিকার রাজা গোক্ষুর একটি সুন্দর নমুনা!
হুম! খুব সুন্দর আবার তেমনি মারাত্মক!

ঠিক ডাক্তার ঠিক! এই সাপের কয়েক ফুট দূর থেকে বিষ ছিটিয়ে শিকারের চোখ অন্ধ করে দেবার ক্ষমতা আছে! তারপর ওর শিকার যখন বৃথাই দেখার চেষ্টা করে তখন ও আঘাত হানে।

সর্পরাজের দ্বীপে

কৌশিক তার সঙ্গীর দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো···
আট নম্বর ঠিকই বলেছিলো··· রাও লোকটা অতি উৎসাহী! এ ব্যাপার বাদ দিলে লোকটা মনোহর!

প্রফেসর রাও কৌশিকের চিন্তায় বাধা দিলো···
এই হচ্ছে দেখবার শেষ্র ডাক্তার··· আমাদের ল্যাবোরেটরি!
এই এখানেই আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়··· সাপের মুখ থেকে বিষ নিষ্কাশন!

কিন্তু ল্যাবোরেটরির ভিতরে গিয়ে সহসা কৌশিক অনুভব করলো যে, কোথাও যেন বেশ গোলমাল আছে!
আমি এদের মধ্যে একজনকেও চোখের পলক ফেলতে দেখিনি··· আট নম্বর বলেছিলো জাহাজের লোকেরাও ফেলেনি!

সে একজন কর্মীর ঠিক পিছনে একটা পরীক্ষা করতে মনস্থির করলো···

পরমুহূর্তে একটা প্রচণ্ড শব্দ ঝনঝনিয়ে উঠলো!
ইস···আমি বড় অসাবধানী! আমি খুবই লজ্জিত!
যেতে দিন, ডাক্তার! ও আর একটা বসানো যাবে!

আমি জানি! কারোর চোখেই পলক পড়বে না··· এমনকি শব্দসত্ত্বেও! এরা এক অষুধগ্রস্ত যা সেই মালবাহী জাহাজের নাবিকদের দেওয়া হয়েছিলো!

সর্পরাজের দ্বীপে

কিন্তু হেল্থ ইনসপেকটরের সহাস্য মুখে তার চিন্তার কোন রেখা পড়লো না…
চমৎকার প্রফেসার… মনে করি এই ই সব! আমি ভালোভাবেই সব কিছু ঘুরে দেখেছি এবং খুশির সঙ্গে বলছি আপনার সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!
ধন্যবাদ… আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে আমি খুশি!

পরে ধীবর পল্লীতে ফিরে কৌশিক আট নম্বরের কাছে সব ঘটনা জানালো…
… এই হোলো ব্যাপার! দ্বীপটা আর একবার তদারক হওয়া দরকার — এবং এবার হেল্থ ইনসপেকটর দিয়ে নয়!
সর্বনাশ! তুমি কি বলতে চাও আবার ওখানে তুমি যাবে!

সুতরাং সেই দিনই রাত্রে কৌশিক আবার টোয়াঙ্গার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালো…
শুভ কামনা কৌশিক … কিন্তু সাবধান!
আপনার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ… আমি দেখবো টোয়াঙ্গায় আজ সকালের চেয়ে বেশী কৌতূহলজনক কিছু পাই কিনা… যেমন দশ কোটি টাকার সোনা!

দ্বীপ থেকে মাইলখানেক দূরে…
এই সুযোগ… চাঁদ মেঘের আড়ালে! আমি অলক্ষিতভাবে যেতে পারবো যদি দ্বীপের অন্য দিক দিয়ে বাকি পথটুকু দাঁড় বেয়ে যাই!

দশ মিনিট পরে ছোট বোটটি গুঁড়ে নরম বালিতে উঠে পড়লো…
পেরেছি!

কিন্তু ঝোপের অন্ধকারে সতর্কভাবে কৌশিক যেই কয়েক পা এগিয়েছে…
বিপদ সঙ্কেত জানাবার জন্যে তার! অহলে ঠিকই ধরেছি… নাগেশ্বর রাও এমন কিছু পেয়েছে যা লুকোতে চায়!

আধো অন্ধকারে কৌশিক জানতে পারলো না, যে, আশপাশের কিছু গাছে কৌশল করা রয়েছে … যান্ত্রিক সঙ্কেত পদ্ধতি!

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ মাঘ ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ ফাল্গুন ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ চৈত্র ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

ক্লান্ত কৌশিক স্খলিত চরণে সামনের দিকে এগোলো ...
এদের চোখ এড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় গা ঢাকা দিতে হবে

এইবার।

আ-আহ!

নীচে পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়লো কৌশিক। পড়ার আঘাতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো

ওপরে ভারী দরজা ধাতব আওয়াজ তুলে বন্ধ হয়ে গেলো ... তারপর অন্য একটা শব্দে মাটির নীচের গহ্বর পূর্ণ হয়ে গেলো!
অভিনন্দন, ডাঃ ত্রিলোক কাপুর ... যদিও আমি সুনিশ্চিত যে ওটা আপনার আসল নাম নয়! আমার মনে হয় আপনি একজন ছ্যাঁচড়া এজেন্ট, যে অন্যের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে পারে না!
লাউডস্পীকার!

আপনি আমার দ্বীপে অনধিকার প্রবেশ করেছেন... এটা ভোলবার নয়, বন্ধু!
ঠিক আছে রাও ... তুমি তোমার রসিকতা করেছো! এবার এখান থেকে আমাকে বেরোতে দাও! যদি আমার কিছু হয়, তবে কাল এ জায়গা পুলিশে ছেয়ে যাবে!
সত্যি, ডাক্তার! আপনি আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন! আপনার মোটা মাথা পুলিশ সারা জীবন ধরে এই দ্বীপ খুঁজলেও আপনার দেহের কোন হদিশই পাবে না! আপনি কাল রাতে এখানে আসেনই নি!

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৪ আষাঢ় ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৫ শ্রাবণ ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

প্রচণ্ড ঘুঁসির আঘাত সামলে সিক্রেট এজেন্ট পাক খেয়ে গেলো • • •
মণ্ড • • • সেই বোবা দেহরক্ষী; সে এখন তোমাকে আমার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছে, তাই না • • ?

শুধু দ্রুত সিদ্ধান্তে সে লাথিটা এড়িয়ে গেলো • • •
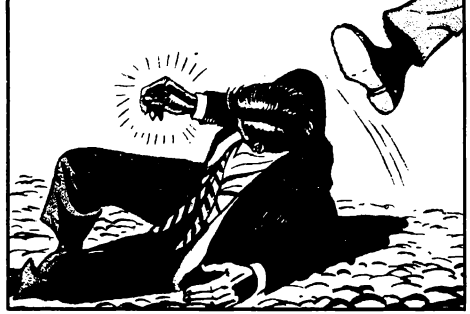
তারপর তড়িৎবেগে কৌশিক উঠে দাঁড়ালো, দৈত্যের কাছে যেন বামন !
আচ্ছা তুমি তাহলে ক্যারাটে বিশারদ এঃ? তোমার মতো লোকের সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়েছে!
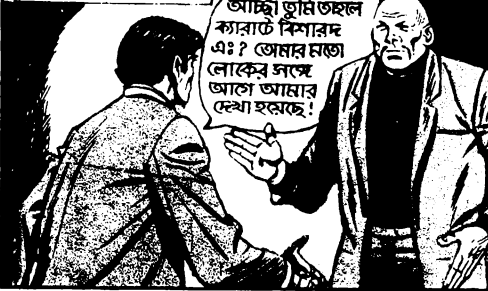
তারপর • • •
ওফ্!

প্রচণ্ড মার খেলো কৌশিক • • • চোখের নিমেষে ঐ বিরাট দেহ তার ওপর এগিয়ে এলো !

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৫ আশ্বিন ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

শক্তিশালী গ্যাস সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ করলো! ভয়ঙ্কর মুস্টি শিথিল হয়ে গেলো আর হতচেতন দানব সশব্দে ধরাশয্যা গ্রহণ করলো···

উঃ··· আমার পাঁজরা! মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা ও ভেঙে দিয়েছে!

কিন্তু টোয়াঙ্গা দ্বীপের শয়তান মালিকের প্রচণ্ড ক্রোধের ফোঁসানি শুনতে পেলো না কৌশিক!
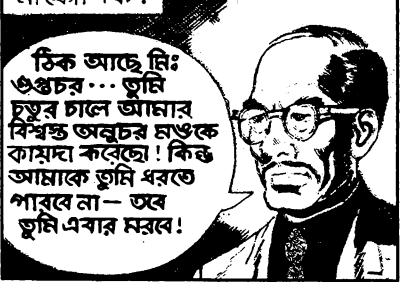
ঠিক আছে মিঃ গুপ্তচর··· তুমি চতুর চালে আমার বিশ্বস্ত অনুচর মণ্ডকে কায়দা করেছো! কিন্তু আমাকে তুমি ধরতে পারবে না— তবে তুমি এবার মরবে!

১৩৮৫ কার্তিক ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৫ অগ্রহায়ণ ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

১৩৮৫ পৌষ ১৯৭৮

সর্পরাজের দ্বীপে

যখন কৌশিক নিজেকে নিরাপদ জায়গায় টেনে তুললো···
এ ওর বদলে আমি হতাম! কিন্তু সোনা কোথায় জমা করা আছে তা এখনো খুঁজে পাই নি!

আমি যদি ও হতাম তাহলে এমন জায়গা পছন্দ করতাম যাতে সকলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়! এটা এমন জায়গায় আছে যেখানটা দেখার কথা লোকে চিন্তাই করবে না! আশ্চর্য···?

কৌশিক দ্রুত এধার থেকে ওপাশে গেলো···
এই দ্বীপের সর্বত্র গুপ্ত দরজা, কামরায় ভর্তি! এই বোতামটা দিয়ে গড়ানে দরজা পরিচালনা করা হয় কিন্তু মনে হয় এটা পুরো অবনত করা হয় নি··· দেখি যদি আরো করা যায়···

এবং বোতামে চাপ দিতেই···
গর্তের··· গর্তের মেঝে পাশে সরে যাচ্ছে···!

তারপর···
সেই সোনা··· সর্পরাজ নাগেশ্বর রাওয়ের ভয়ঙ্কর সাপেরা এগুলি পাহারা দিতো! ও পৃথিবীর সেরা ধনী হতে চেয়েছিলো··· আর তারই জন্যে ওকে প্রাণ দিতে হলো!
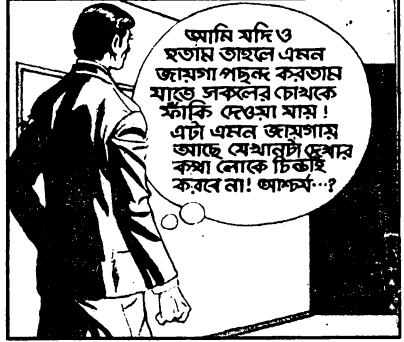
ক্লান্ত পায়ে কৌশিক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো···
মোটর লঞ্চ নিয়ে আমি আট নম্বরের কাছে যাবো···কর্তৃপক্ষ এবার এখানকার দায়িত্ব নেবে! তাঁরা এখান থেকে সোনা সংগ্রহ করবে আর সমস্ত ওষুধগ্রস্ত লোকগুলিকে তুলে নিয়ে যাবে···

অজানা দেশে

ভারতীয় মহাকাশযানে ক'জন অভিযাত্রী চলেছেন মহাশূণ্য অভিযানে। উদ্দেশ্য অন্য গ্রহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন।

সারাদিনে কোন বাসযোগ্য গ্রহ চোখে পড়লনা!

দেখ, দেখ! সেক্টর এক্স ২৮০র ওপর দিয়ে দেখ!

শুকসারী ১৩৭৬ ১৯৬৯
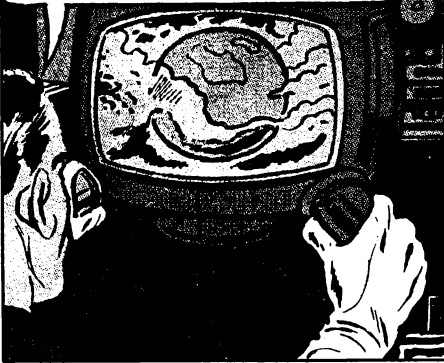
বুঝতে পারছিনা! ভাষা পরিবর্তনের যন্ত্রে কোন গোলমাল হয়েছে! এটা এই খবরটাকে পৃথিবীর ভাষায় পরিবর্তন করতে পারছেনা!

নিশ্চয়ই আমাদের দেখেছে, আর তাই আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে চাইছে!
মনে হচ্ছে বন্ধুত্বের অভিনন্দন জানিয়েছে!
বেশ! তবে নামা যাক!

আমরা কুয়াশার কাছাকাছি এসে গেছি!
নতুন জগতে পা দেওয়া সব সময়েই রোমাঞ্চকর!
হেই! ওগুলো কি আসছে আমাদের দিকে ?!

কী সর্বনাশ! ক্ষেপনাস্ত্র!
গ্রহবাসীরা আমাদের ধ্বংস করতে চাইছে!

মহাকাশযানের মুখ ঘুরিয়ে দাও! তাড়াতাড়ি!! এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!

ওর একটা রকেট যদি আঘাত করে তো আমরা খতম!!

আমরা ওদের পাল্লার বাইরে চলে এসেছি! এখন আমরা নিরাপদ!

বোকা গ্রহবাসীরা! শেষে আমাদের দিকে অস্ত্র ছুঁড়লো!
আমরা ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছিলাম— আর ওরা কিনা অভ্যর্থনা করল ক্ষেপনাস্ত্র ছুঁড়ে!

শুকসারী ১৩৭৬

আমাদের সঙ্গে হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ, আমি চাই ঐ গ্রহে বোমাবর্ষন করতে!
আমিও! তাহলে ঐ শয়তানগুলো কিছু উচিত শিক্ষা পাবে!
না! প্রতিশোধ নিয়ে কি হবে! তার চেয়ে আমরা এখান থেকে চলে যাই!

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছিনা বলে দুঃখিত!
হ্যাঁ! আমরা সবাই প্রতিশোধ নিতে চাই!
INDIAN PLANETS

দাঁড়ান— আমার কথাটা শুনুন—
মাপ করবেন! আপনার কথা আর কেউ শুনবেনা!
আমি বোমা সাজিয়ে রাখতে চললুম!

আপনাদের কাজটা বর্বরের মত হচ্ছে! হয়তো আমরা কিছু ভুল করছি!
যতক্ষণ না আমাদের অভিযান শেষ হচ্ছে, একে আটকে রাখুন! কাপুরুষ কোথাকার!

শুকসারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

দেখুন! ভাষা পরিবর্তনের যন্ত্রটা আবার কাজ করছে! গ্রহবাসীদের পাঠানো বার্তাটা এবার তর্জমা করে দিচ্ছে!
টিক-টিক-টিক

এই যে বাংলায় সেই বার্তা!
ওঃ— না-না!
আমরা··· আমরা ওকে থামাবো!

বড় দেরি হয়ে গেছে! ও কুয়াশার কাছে পৌঁছে গেছে!

ঐ ওর মধ্যে ঢুকে পড়েছে!
সমীর বাবু! থামুন! ফিরে আসুন!

শুকসারী ১৩৭৬ ১৯৬৯

স্বপ্ন, না সত্যি!
নারায়ণ দেবনাথ
গোকুল অত্যন্ত লম্বা চওড়া মানুষ। মহা সমস্যায় পড়ে যায় সে তার জামা কাপড় কিনতে গিয়ে।
আপনার মাপের পাওয়া মুস্কিল। বেঢপ জিনিস বিক্রির দোকানে খোঁজ করে দেখুন যদি পান।

মনঃক্ষুণ্ণ গোকুল বাড়ি ফিরে তার ছোট্ট বাগানটিতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসলো। তাকে দেখে তার পোষা বেড়াল 'টুনি' কাছে এলো।
কি রে টুনি! কি চাই তোর?

একটা কাপে বেড়ালের জন্যে খানিকটা দুধ নিলো সে।
কি হলো? খাবার ইচ্ছে নেই? ঠিক আছে, পরে খেয়ে নিবি।

চা খাওয়া শেষ হবার পরেও চেয়ারে বসেই থাকলো গোকুল।
আমার জিনিস কিনতে যাওয়াটাই ঝকমারি! এমন জিনিস পেতাম যা আমাকে ফিট্ করতো। যদি আমি **ছোট হতাম!**

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২

দৌড়ে সে টেবিলের পায়ার আড়ালে চলে গেলো।
দূর হ-দূর হ হতচ্ছাড়া!

আতঙ্কে পেছনে সরে এসে পাশের দিকে নজর ফেরাতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল তার:
ওঃ, ওঃ, না-না!

নীচের বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচার তাগিদ তাকে ওপরে ওঠার শক্তি যোগায়!
একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতেই হবে!

উঠতে উঠতে একেবারে ওপরে উঠে গেলো গোকুল।
ওই ভয়ঙ্কর জীবটা পেছনে তাড়া করে আসছে না তো?

কিন্তু পরিত্রাণের পরিবর্তে সে এক নতুন বিপদের মুখে গিয়ে পড়লো।
ওঃ!
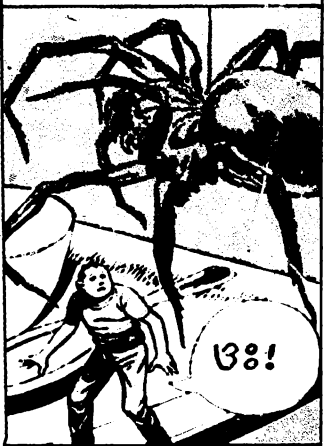
মুহূর্তমাত্র, তারপরই লম্বা লোমশ পা দিয়ে তাকে টেনে তুলে নিল মাকড়সাটা!

ছাড় আমাকে, ছাড় শিগগির!

প্রচণ্ড ভয় শক্তি জোগালো গোকুলকে। ঐ কুৎসিত মাকড়শার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। তারপর নীচে পড়তে লাগলো সে।

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২

কিন্তু স্মৃতি তাকে আর এক বিপদের মুখে নিয়ে এলো!
আমি রে টুনি—আমি!

টুনির চোখে কিন্তু পরিচয়ের কোন চিহ্নই ফুটলো না।

টুনির উদ্যত থাবা থেকে কোনরকমে সরে এলো সে।
না—না টুনি, না!

হঠাৎ চামচটার দিকে চোখ পড়লো গোকুলের। মরীয়া হয়ে সেটাই তুলে নিলো।

পূরবী ১৩৭৯ ১৯৭২
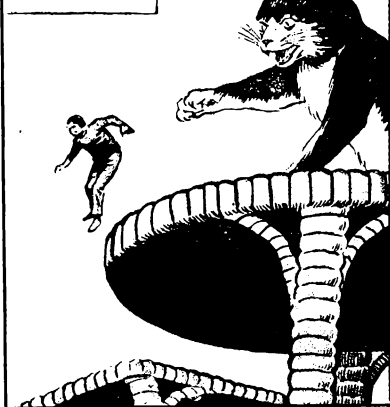
মৃত নগরীর দানব দেবতা
কোন এক প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখিত বিবরণের ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রত্নতাত্ত্বিক তিন বন্ধু শৈলেশ, মিহির আর তাপস এসেছিলো সাহারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালির নীচে লুপ্ত এক মৃত নগরীর সন্ধানে! কিন্তু মরু ঝটিকার কবলে পড়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরে ঝড় থামলে মিহিরের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না! দু' সপ্তাহ নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর ওরা যখন নিরাশ হয়ে ফিরে চলেছিলো, সেই সময় এক আর্তকণ্ঠ ভেসে এলো—
বাঁচাও! বাঁচাও! জল!
নারায়ণ দেবনাথ

ঐ যে! তাড়াতাড়ি পৌঁছোতে পারলে হয় তো ওকে বাঁচানো যেতে পারে!
এখনো বেঁচে আছে! শীগগির জলের বোতলটা দে তাপস!

আঃ!
এ কী! এ যে মিহির!
শীগগির ওকে তাঁবুতে নিয়ে চল!

তপোবন, ১৩৮০ ১৯৭৩
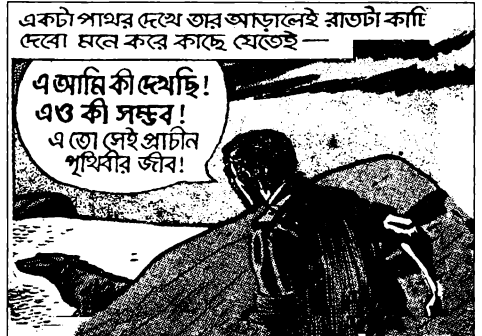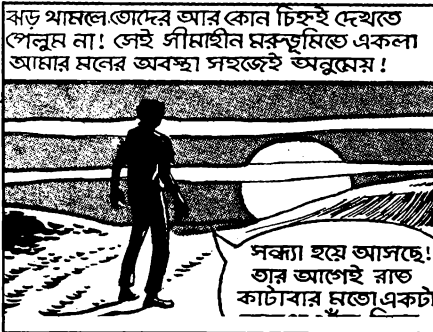
আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করেই সেটা একটা কাছেই একটা গর্তে ঢুকে গেলো।
ওটা এলো কোথা থেকে!

উত্তেজনার বশে এগিয়ে গর্তের কাছে গেলাম জন্তুটা কোথায় গেলো তা দেখার জন্যে।
জন্তুটা কি এই গর্ত থেকেই ওপরে এসেছিলো!

আমার উত্তেজনাই বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এলো! আমার চাপে গর্তের ধারের বালি আলগা হয়ে ভেতরের দিকে ধ্বসে পড়লো! সঙ্গে সঙ্গে আমিও
এ-একী!

সবেগে মাথা দিয়ে পড়লাম পাথরের ওপর! প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হারালাম!
আঃ!

কতক্ষণ অচেতন ছিলাম জানিনা। চেতনা ফিরে পেয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আতঙ্কে চুল খাড়া হয়ে উঠলো!
কী ভয়ানক! এ আমি কোথায় এলাম!

কয়েক কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে যারা বিচরণ করতো, তাদেরই একজন নির্নিমেষ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে!
আশ্চর্য! আমাকে দেখেও ওটা এখনো নিশ্চল রয়েছে!

তপোবন, ১৩৮০ ১৯৭৩

আবিস্কারের আনন্দে সব কিছু ভুলে নগরের তোরনের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম!
এই তাহলে সেই মৃত নগরী, যাতে প্রাণের আর কোন স্পন্দন নেই!

তারপর সেই মৃত নগারীর পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সহসা সামনের বাড়ির আড়াল থেকে মূর্তিমান এক দুঃস্বপ্ন জেগে উঠলো!
লুকোবার আগেই অতীতের ঐ দানব আমায় ধরে ফেলবে!

দুঃসাধ্য জেনেও আমি সেই জীবন্ত বিভীষিকাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলাম।
চেষ্টা করে দেখি যদি বাঁচতে পারি!

চলন্ত পাহাড়ের মতো ছুটে আসতেই—চকিতে পাশে সরে গেলাম!
দড়াম!
ফাঁকি দিতে পেরেছি! কিন্তু ও সামলাবার আগেই নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে!

সহসা চোখে পড়লো ওর ধাক্কাতেই পাথর সরে গিয়ে একটা গুপ্ত পথ বেরিয়ে পড়েছে!
ওই পথেই পালাতে হবে!

ছুটে ঐ পথে ঢুকে পড়লাম।
ওঃ! দানবের হাত থেকে পালাতে পেরেছি!

তপোবন, ১৩৮০ ১৯৭৩

তপোবন, ১৩৮০ ১৯৭৩

তপোবন, ১৩৮০ ১৯৭৩
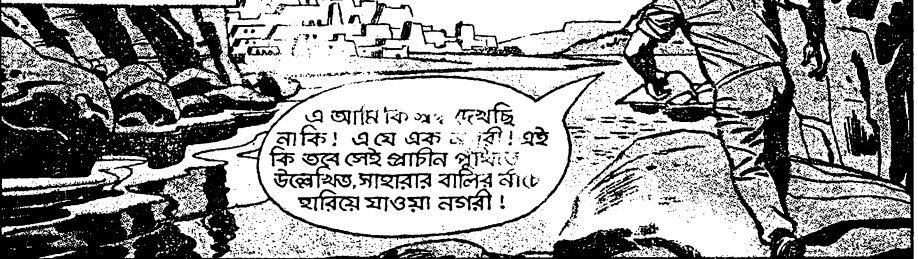
দুঃস্বপ্নের দেশে
নারায়ণ দেবনাথ
যে রহস্যময় স্থান খুঁজে বের করতে সুদূর ভারত থেকে এখানে ছুটে এসেছেন, সে জায়গা কি এতো ওপর থেকে হদিশ করতে পারবেন ডাঃ সান্যাল ?
আফ্রিকার অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্য উপত্যকার নির্জনতাকে খান্ খান্ করে একটা হেলিকপ্টারকে উড়তে দেখা গেলো।

বছর খানেক আগে এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ধাতুর খোঁজে বেরিয়েছিলাম

একদিন একা এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা নিভন্ত আগ্নেয়গিরি দেখে ধাতুর খোঁজ পাওয়া যাবে ভেবে মুখের কাছে পৌঁছোলাম। গহ্বরের চারদিক ঘিরে নানারকম লতাপাতার জঙ্গল। এমনি কৌতূহল বশতঃ ভিতরের দিকে উঁকি দিয়ে চমকে উঠলাম। মনে হলো যেন অনেক তলায় জলের ঝিলিকের সঙ্গে কিছু নড়তে দেখলাম।

ফিরে এসে ও সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলিনি। তারপর এতোদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম — ওই-ওই তো সেই গহ্বরের মুখ !

ওরে বাবা! গহ্বরটার আকৃতি একটা ঢালু চুঙ্গির মতো। কারো ক্ষমতা নেই যে এর গা বেয়ে নামবে।

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

নীচে আসার সময় আমি মানুষ দেখেছিলাম ডাঃ সান্যাল!
আশ্চর্য! এখানে মানুষ! কিন্তু এখন তো কাউকে দেখছি না। ঠিক আছে এখানেই নামাও।

অদ্ভুত! গাছপালার দিকে দেখো জয়ন্ত— সমস্তই ভিন্ন উদ্ভিদ যুগের!

অতীত যুগে হয়তো কোন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বাইরের জগৎ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এভাবে আটকা পড়ে যায়। কিন্তু এরা জীবনধারণ করে কি ভাবে! এরা খায় কি?

দেখুন ডাঃ সান্যাল জাল। মনে হয় এরা এই লেক থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে।
মাছের জাল! তার মানে এই গহ্বরের লেকে মাছ আছে। অবিশ্বাস্য!

হাঁটা পথে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর।
এতোদূর এলাম, কিন্তু কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই!
মনে হয় আড়াল থেকে তারা আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখছে

পথ আরো কিছু দূরে দুটো বিরাট পাথরের কাছে গিয়ে শেষ হলো।
চলো জয়ন্ত! এই পাথর দুটোর ওপাশে কি আছে দেখি।

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

মাছ ধরার বর্শা দিয়ে আমাদের গেথে ফেলবার মতলবে ছিলো।

হেলিকপ্টারের কোন ক্ষতি করার আগে চলুন শিগগির ওটাতে ফিরে যাই।
ঠিক বলেছো জয়ন্ত! তাড়াতাড়ি চলো।

হেলিকপ্টারকে ওরা যদি ঠেলে জলে ফেলে দেয় তাহলেই আমরা গেছি।

ঐ তো আমাদের হেলিকপ্টার। ওটা ঠিকই আছে মনে হয় ডাঃ সান্ন্যাল!

আরে! এখানে একটা মাছ পড়ে আছে। আমি বলছি জয়ন্ত, এটা এখনি ধরা
যেতে দিন ডাঃ সান্ন্যাল! এটা আমাদের জন্য একটা ফাঁদ হতে পারে।

নিশ্চয় কেউ মাছ ধরছিলো, কিন্তু আমাদের সাড়া পেয়ে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু দেখো, এ মাছ অন্যান্য লেকের মাছেরই জাত। তলা দিয়ে নিশ্চয় যোগাযোগ আছে—

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

দেখুন!

পকেটে একটা ছোট ছুরি আছে। চেষ্টা করে দেখুন বার করতে পারেন কিনা?
পেরেছি!

কিছুক্ষণের চেষ্টাতেই হাতের বাঁধন কাটা গেলো।

তারপর দুজনে জালের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এলো।
কোন লাভ হলো না জয়ন্ত! অনেক দেরী হয়ে গেছে।
যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশা আছে।

একবার তো দেখেছো। পিস্তলের গুলিতে ওর কি হবে?
তখন হয়নি কিন্তু এখন হবে।

জয়ন্ত অব্যর্থ নিশানায় প্রথমে জলদানবের ডান. পরক্ষণেই বাঁ চোখ বিদ্ধ করলো।
দুম দুম

বলাকা ১৩৮২ ১৯৭৫

অন্ধকারের হাতছানি

নারায়ণ দেবনাথ

মানুষ জন্ম অপরাধী নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ, লোভ মানুষকে অপরাধী করে তোলে। আমাদের কাহিনীর নায়ক রজত ও এমনই অবস্থার শিকার।

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

ঠিক আছে রজত! চলো তোমাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। সে তোমাকে সহজে বেশী টাকা রোজগারের পথ বাতলে দেবে!
সত্যি, সামান্য টাকায় চলেনা! বাড়তি পয়সা পেতেই হবে।

পরদিন রাত্রে রজত তার বন্ধুর সঙ্গে জুয়ার আড্ডায় গেলো এবং সেখানে অন্ধকার জগতের কারবারী জীৎপাল কাপুরের সঙ্গে পরিচিত হলো...
আপনি হাসপাতালের ডাক্তার! আপনি তো ইচ্ছে করলে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজগার করতে পারেন। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?
পেরেছি। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে ওরা...
ঘাবড়াচ্ছো কেন? পারলেই তো মোটা টাকা!

সেই দিনই রাত্রে দেরীতে ডিউটিতে এসে....
জীৎপাল যা চেয়েছে এই সেই জিনিস! মর্ফিন, আফিম, মাদক ওষুধ! ও ঠিকই বলেছে! এই হচ্ছে টাকা পাবার সহজ রাস্তা!

মনে হলো সংজ্ঞালোপক ওষুধের তলে কারো সাড়া পেলাম, রজত! তুমি এখন এখানে কি করছো?
কিছু না, স্যার! আ আমি শুধু...

আমাকে ধোঁকা দেবার চেস্টা করোনা রজত! আমি কিছুদিন থেকে তোমার ওপর লক্ষ্য রাখছিলাম। আজ আমি তোমার ওষুধ চুরি ধরে ফেলেছি! এর অর্থ হলো তোমার ডাক্তারি জীবনের শেষ— এবং জেলে বন্দীজীবন!

রজত ঐ ডাক্তারকে তার বিরুদ্ধে কিছু না বলার জন্যে অনুরোধ করলো, কিন্তু তার আবেদনে যখন কোন ফল হলো না তখন প্রচণ্ড রাগ তাকে ঘিরে ধরলো!
আপনি বেশ কিছুদিন আমার পেছনে লেগেছেন ডাক্তার মজুমদার, বুড়ো শকুনি কোথাকার! কিন্তু আমি আপনাকে আমার সব কিছু নষ্ট করতে দেবো না! কিছু বলার সুযোগই আপনি পাবেন না!
রজত থামো! ঐ ছুরি দিয়ে তুমি কি করতে চাইছো?

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

অন্য কয়েদীরা রজতের কাহিনী শুনলো এবং ওদের মধ্যে শিগগিরই ওর চলতি নাম হলো ডাক্তার! একদিন---
এই যে ডাক্তার! তুমি একজন সত্যিকার চালাক ও করিৎকর্মার কাজ দেখতে চেয়েছিলে?

দেখ ও আঙুলের মাথা অপারেশন করেছে! পুরোনো চামড়া তুলে নতুন জুড়ে দিয়েছে! নেহাত্ত আমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে তাই।– পুলিশ যাকে খুঁজছে তেমন লোকের মুখের চেহারা পালটে দিতে পারে! তুমি এই দিকটায় নজর দাও না!
হুমমম!

রজত খুব সামনে থেকে অন্যান্যদের ছেদন করা আঙুলের দাগ পরীক্ষা করতে লাগলো। তার মস্তিস্কে একটা মতলব দানা বাঁধতে লাগলো---

এই, তোমরা দুজন! তফাৎ, আলাদা হয়ে যাও!
আসলে এরা আমার উন্নতির পথ নষ্ট করতে পারে নি! এখনো আমি একজন সফল সার্জন!
যদি এরা আমাকে সোজা রাস্তায় চলতে না দেয়—বাঁকা রাস্তাতেই আমি চলবো!

উচ্চ সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা বন্দী রজতের মনে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ধিকি ধিকি জ্বলছিলো। ছাড়া পাবার পর জেলে যাদের সংস্পর্শে এসেছিলো তাদেরই নির্দেশিত একজনের সঙ্গে দেখা করলো---
---সুতরাং ওরা আমাকে বলেছিলো আপনার সঙ্গে দেখা করলে আপনি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাই আমি এসেছি!
হ্যাঁ, ন্যাপা আমাকে জানিয়েছিলো তুমি কাজের লোক – অবশ্য পুরোপুরি ডাক্তার হবার মুখেই তুমি ধাক্কা খেয়েছো! ঠিক আছে, তোমাকে কাজে লাগবে!
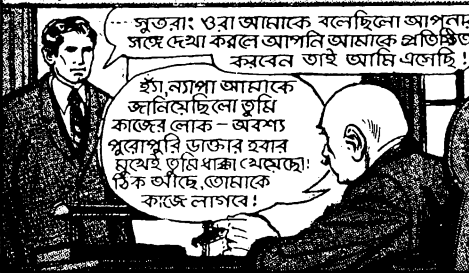
আমি দুজন ছোকরাকে জানি তারা সব সময় তেতে আছে! ওরা একেবারে মরিয়া! তারা তাদের ওপর তোমাকে পরীক্ষা করতে দিতে পারে যদি ভালো কাজ দেখাও তবে তোমাকে আরো বড় কাজ দেওয়া যাবে!

মহেন্দ্র সিং-এর অর্থ সাহায্যে রজত অন্ধকার জগতের জন্যে সর্ব বিষয়ে ওস্তাদ ডাক্তার হিসেবে তার জীবন শুরু করলো। তার প্রথম কাজ হলো পুলিশ খুঁজছে এমন একজন লোকের প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা বদলে দেওয়া···

আরো কিছু কাজ করার পর— অস্ত্রচিকিৎসায় রজতের নিপুণ হাতের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। এবং সে কাজের জন্যে এবার বিপুল পরিমান অর্থ দেবার হুকুম করতে লাগলো····

তিন বছর ধরে রজত অন্ধকার জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতিমান হলো, এবং খুনী আসামীদের আঙুলের রেখা আর মুখের চেহারা পালটে দেওয়ার বিপুল ফি-এর টাকায় প্রচুর বিলাসিতায় জীবন যাপন করলো। তারপর একদিন তার বাড়িতে কয়েকজন দর্শনার্থী এলো····

গ্রেপ্তার করছেন? কি অভিযোগে?

বিনা লাইসেন্সে ডাক্তারী আর চেনা দাগী আসামীদের পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে। গোলমাল করোনা রজত! আমাদের সঙ্গে এসো!

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

ও পালিয়ে যাচ্ছে!
আমি এখনো মুক্ত! আমি আবার ওসব করবো!

কিন্তু রজত মুক্ত নয়! পুলিশের প্রচণ্ড তাড়া খেয়ে সে ইঁদুরের গর্তের মতো, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খুব অল্প টাকার বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হলো! প্রকৃত পক্ষে সে এখন আইনের বদলে বে-আইন জগতের বন্দী!
পাঁচ হাজার টাকা— শুধু আঙুলের রেখা তুলতে? তোমার মাথা খারাপ ডাক্তার! তুমি আর আগের অবস্থায় নেই, যে ইচ্ছে মতো আমাদের দুয়ে নেবে! আমি পঞ্চাশটি টাকা দেবো! যদি না করো তবে একটি মাত্র খবর আমি জানাবো আর....
না! না! পঞ্চাশ টাকাই নেবো!

অনবরত ছুটোছুটি, আইনের ভেতর আর বাইরের দুদিকের চাপ, রজতের উপর প্রভাব বিস্তার করলো ফলে কাজ হলো অস্বাভাবিক....
হাতের মধ্যে কেমন অদ্ভুত লাগছে ডাক্তার! তুমি নিশ্চিত যে ঠিক হয়েছে? যদি কোন গণ্ডগোল হয়, আমি তাহলে—
উদ্বিগ্ন হয়োনা! ওসব ঠিক সেরে যাবে!
মনে হচ্ছে, আমার হাত বশে ছিলোনা! স্নায়ুতেও জোর পাই নি!

কয়েক সপ্তাহ পরে....
অপদার্থ জোচ্চোর! তুমি আর মোটেই কাজের নও! দেখ, আমার হাতের অবস্থা কি হয়েছে! শক্ত! বাঁকা! এ আঙুল দিয়ে কিছু করতে পারবো না! ওকে এবার ভালো করে সমঝে দাওতো হে!
দাঁড়াও! আমি বুঝিয়ে বলছি! আমি—

বুদ্ধুটাকে ভালো করে রগড়ে দাও! তাহলে সার্জিক্যাল ছুরি হাতে নিয়ে আর কখনো অসাবধান হবে না!
আহ্!

মারের আতঙ্কে রজত তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো! পকেট থেকে রিভলবার বার করে খুনের উন্মাদনায় গুলি চালাতে লাগলো!
তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, পৃথিবীর সব থেকে সেরা অস্ত্র চিকিৎসকের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা চলে না!
ও খুন পাগলা হয়ে গেছে! আহ্!

মন্দিরা ১৩৮৪ ১৯৭৭

ইতিহাসে দ্বৈরথ

দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ছিলো দুর্জয় যোদ্ধা।
জিমের হাতের ছোরা আবার ঝলসে উঠলো।
না-না!
তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার চতুষ্পদ প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর।
এবার হয় তুই থাকবি নয় আমি।
মধ্যস্থের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যোদ্ধাদের পিস্তল গর্জে উঠলো।
যখনকার কথা বলছি সেই সময় ইউরোপের মানুষ, বিশেষ করে ফরাসীরা, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়তেন।

ইতিহাসে দ্বৈরথ

ডুয়েল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে একটি পরিচিত এবং ভয়ংকর শব্দ। ঝগড়া বিবাদের সমাধানের খোঁজে বিচার বিভাগের দারস্থ হবার বদলে অনেক মানুষই হাতে তুলে নিতেন অস্ত্র। সেই সব সত্যি ঘটনাকে অবলম্বন করেই নারায়ণ দেবনাথ এঁকেছিলেন এই চিত্রকাহিনি। ইতিহাসে দ্বৈরথ শিরোনামে এই চিত্র কাহিনিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল কিশোর ভারতী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৮১ থেকে আষাঢ় ১৩৮২ পর্যন্ত, অক্টোবর ১৯৭৪ থেকে জুলাই ১৯৭৫)। ইউরোপের সম্ভ্রান্ত পরিকারের মানুষজনের এই দ্বৈরথের সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে মেক্সিকোর একটি ঘটনা, এক জলদস্যুর সঙ্গে এক লেফটেন্যান্টের লড়াই এবং আমেরিকার রকি মাউন্টেনে এক গ্রিজলি ভালুকের সঙ্গে জনৈক সীমান্তরক্ষীর দ্বৈরথও।

নারায়ণ দেবনাথ রূপায়িত
ইতিহাসে দ্বৈরথ
বোম্বেটে ব্ল্যাকবেয়ার্ড ও রবার্ট মেনার্ড
সাত সাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে যে সব জলদস্যু ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তাক্ত করে তুলেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর, হিংস্র ও ভয়ঙ্কর মানুষ হচ্ছে বোম্বেটে-সর্দার এডওয়ার্ড টিচ ওরফে এডওয়ার্ড ব্ল্যাকবেয়ার্ড।

সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, দুর্ধর্ষ জলদস্যুরাও নিষ্ঠুরতার জন্যে তাদের দলপতি ব্ল্যাকবেয়ার্ডকে যমের মতোই ভয় করতো।

দল পরিচালনা করতো কঠোর হাতে।
এতো সাহস, আমার কথার অবাধ্য! ওকে হাঙরের মুখে ফেলে দাও।

না না,— বাঁচাও বাঁচাও!

ওঁ-ওঁ-ওঁঃ!

অসাধারণ ছিলো তার দৈহিক শক্তি।
বছরের পর বছর ধরে সমুদ্রের বুকে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্ব চালিয়েছিলো বোম্বেটে ব্ল্যাকবেয়ার্ড।
মারো, কেউ যেন জীবন্ত না থাকে।
হাঃ হাঃ হাঃ! ব্ল্যাকবেয়ার্ড কাউকে জ্যান্ত ফিরতে দেয় না।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে ছিলো দুর্জয় যোদ্ধা।

আহ্!

একদিন রাজকীয় নৌবহরের দুটি জাহাজ বোম্বেটে ব্ল্যাকবেয়ার্ডের জাহাজকে আক্রমণ করলো।
রাজকীয় জাহাজ আসছে। আক্রমণ মোকাবিলার জন্যে সবাই তৈরী হও।

বোম্বেটে ব্ল্যাকবেয়ার্ডের দলকে ধ্বংস করা চাই। আক্রমণ করো।

প্রচণ্ড হট্টগোল আর মারামারির মধ্যেও এই অভিযানের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট রবার্ট মেনার্ডের সন্ধানী দৃষ্টি ব্ল্যাকবেয়ার্ডকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি বোম্বেটে দলপতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন।
ব্ল্যাকবেয়ার্ড! তোমাকে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি।

সে আহ্বানে সাড়া দিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করলো না বোম্বেটে ব্ল্যাকবেয়ার্ড। তারপর সুরু হলো দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্ল্যাকবেয়ার্ড বুঝলো যে, এ শত্রু সহজ নয়।

অনেকক্ষণ ধরে লড়াইয়ের ফলে দুজনেরই শরীর তখন ক্ষতবিক্ষত।

অবশেষে মেনার্ডের তরবারির এক দ্রুত সঞ্চালনে লুটিয়ে পড়লো মরণাহত দস্যুদলপতি ব্ল্যাকবেয়ার্ড।

ইতিহাসে দ্বৈরথ
হিউজ গ্লাস ও গ্রিজলি ভালুক
যে সব দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেই ঘটনার নায়করা যে সবসময় যুদ্ধের রীতিনীতি পালন করেছে একথা বলা যায় না, কারণ মানুষের বিরুদ্ধে মানুষই যে সবসময় দ্বৈরথে অবতীর্ণ হয়েছে এমন নয়, পশু ও মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধও ইতিহাসে একাধিকবার খ্যাতিলাভ করেছে।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হিউজ গ্লাস নামে এক সীমান্তরক্ষী ও অভিযাত্রী আমেরিকার রকি মাউন্টেন অঞ্চলে নয় ফিট লম্বা বিশালকায় এক গ্রিজলি ভালুকের সম্মুখীন হয়েছিলো! হিউজ বন্দুক ব্যবহারের চেষ্টা করলো।
জায়গা মতো গুলি করতে না পারলে উপায় নেই।

গুলি লাগতেই ভালুকটা ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এলো।

ঠিক মতো বোধহয় লাগেনি। আচ্ছা এবার দেখাচ্ছি!

কিন্তু দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার সুযোগ পেলোনা হিউজ।
আহ্!

ভাল্লুকের থাবার পরবর্তী আঘাত হিউজকে ধরাশায়ী করলো।
আহ্‌-আহ্‌ !

রক্তাক্ত অবসন্ন দেহে হিউজ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই ভাল্লুক আবার তেড়ে এলো।
ধরতে পারলে আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে!

ভালুক ঝাঁপিয়ে পড়তেই একপাশে সরে গেলো হিউজ।

বিফল হয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়লো বিশাল ভাল্লুক দানব।
গররর!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আবার পরস্পরকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে থাকে।

ওটার পিঠে উঠতে পারলে ওকে হয়তো ঘায়েল করা যায়, কিন্তু সে সুযোগ কি পাবো?

হঠাৎ চোখ পড়লো হস্তচ্যুত আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে।
এতো বন্দুকটা ওখানে। ওটা কোন রকমে আবার হাতে পাওয়া যেতো। দেখি তো চেষ্টা করে।

আস্তে আস্তে বন্দুকের দিকে এগোয় হিউজ।
আর একটু – আর একটু এগোতে পারলেই বন্দুকটা তুলে নিতে পারবো।

গাঁ-আঁ-আঁ-ক!
কিন্তু বন্দুকে হাত দেবার আগেই প্রচণ্ড চপেটাঘাতে আবার ছিটকে পড়ে গেলো।

এই ছুরি নিয়েই ওর সঙ্গে লড়তে হবে।

তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার চতুষ্পদ প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর।
এবার হয় তুই থাকবি নয় আমি।

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বীও তাকে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো।
উঃ! আহ্!

সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালুকটাকে আঘাত করতে থাকে হিউজ।
গাঁ-আঁ-ক!

হঠাৎ শিথিল হয়ে গেলো ভালুকের ভয়াবহ আলিঙ্গন। ধীরে ধীরে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো শ্বাপদের প্রাণহীন বিশাল দেহ।

ইতিহাসে দ্বৈরথ

বেন ষ্টারডিভ্যান্ট ও জিম বোয়ি

১৮২৬ খৃস্টাব্দ। টেক্সাস অঞ্চলের একটি পানাগারের ভিতরে বসে তাসের জুয়া খেলছে একটি অল্পবয়সী কিশোর ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। পুরুষটি ঐ অঞ্চলের এক কুখ্যাত জুয়াড়ী ও দুর্ধর্ষ গুণ্ডা— নাম, বেন ষ্টারডিভ্যান্ট। কিশোরটির নাম—ল্যাটিমোর।

খেলা চলছে, ছেলেটি হেরে যাচ্ছে বার বার। তীব্র উত্তেজনায় তার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।

বার বার বাজী হারছে, কিন্তু খেলা ছেড়ে ওঠার নাম করছে না।

শাবাস! এই তো মরদের মতো কথা!

আবার খেলা চলছে, এমন সময় হঠাৎ পানাগারের দরজা ঠেলে একটি লোক প্রবেশ করলো।

ভেতরে ঢুকে খেলোয়াড়দের ওপর চোখ বুলিয়েই একটু চমকে উঠলো।
ছেলেটিকে যেন খুব চেনা বলে মনে হচ্ছে!

একি! এতো দেখছি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে।

ছেলেটাকে সর্বস্বান্ত করছে দেখি তো ভালো করে ব্যাপারখানা!

ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো আগন্তুক।
এতো দেখছি অসৎভাবে ঠকিয়ে লোকটা টাকাগুলো জিতে নিচ্ছে, বেচারা ছেলেটা বুঝতেও পারছে না।

আগন্তুক আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখলো।

তারপর এগিয়ে এসে ল্যাটিমোরের কাঁধে হাত রাখলো।
আপনি আপনাকে তো—

তুমি আমাকে ঠিক চিনতে পারবে না, কিন্তু তোমার বাবা পারবেন। আমি তোমার বাবার বন্ধু।

শোন, তোমার তাস নিয়ে আমাকে ওর সঙ্গে একটু খেলতে দাও।

ল্যাটিমোর সম্মত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলো।
নিন এবারে আবার খেলা শুরু করুন।
ঠিক আছে।

আপনার কেরামতিটা এবার দেখা যাক মশাই।

কিছুক্ষণ খেলা চলার পর।
এ বাজীটাও তাহলে আমিই জিতলুম। কেরামতিটা কেমন লাগছে?

তারপর যে টাকাগুলো বেন জুয়াচুরি করে ল্যাটিমোরের কাছ থেকে জিতে নিয়েছিলো, সেই টাকা আবার নবাগত মানুষটি জিতে নিয়েছে
তাহলে যে টাকাগুলো আপনি জুয়াচুরি করে ছেলেটির কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তা আমি জিতে নিয়েছি।

এই লোকটা অনভিজ্ঞ এক কিশোরের কাছ থেকে তার টাকা অসৎ উপায়ে ঠকিয়ে নিচ্ছিলো। দৈবাৎ আমার চোখে পড়ায় তা রক্ষা পেয়েছে।

জিতে নেওয়া টাকাগুলো আবার ল্যাটিমোরকে ফিরিয়ে দিলো আগন্তুক।
এই নাও তোমার টাকা। বাড়ি যাও, কিন্তু সাবধান! কখনও আর জুয়া খেলো না।

কার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছো তা তুমি জানো না চাঁদ! তোমার ওস্তাদি ভাঙছি!

আরে, আরে এতো তাড়াতাড়ি চললেন কোথা ?
কি বলতে চান আপনি ?

চাই এই— হাঃ !

তারপর পাল্টা আঘাত হানলো আগন্তুক।
আহ্ !

আশা করি এতেই শিক্ষা হবে।

আগন্তুকের কাছে নানাভাবে অপদস্থ হয়ে বেন স্টারডিভ্যান্ট আহত বাঘের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।
যদি সাহস থাকে তো ছুরি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়ো।

বেচারা স্টারডিভ্যান্ট ! সে কল্পনাও করতে পারে নি যে লোকটিকে সে ছোরার লড়াইতে আহ্বান করেছে, সেই লোকটি হচ্ছে সে সময়ের ছুরির লড়াইয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা জিম বোয়ি !
আচ্ছা— আমি রাজী !

জিম আত্মপরিচয় দিলো না। ভয়ঙ্কর মেক্সিকান ডুয়েল নামক রীতি অনুসারে দ্বন্দ্বযুদ্ধের উদ্‌যোগ হলো।

তারপর নির্দেশ পাওয়ামাত্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে আক্রমণ করলো।

কিছুক্ষণ লড়াই চললো। কয়েকবার প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করলো জিম। তারপর হঠাৎ।
আহ্‌!

জিমের হাতের ছোরা আবার ঝলসে উঠলো।
না-না!

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে নয়—দুই যোদ্ধার বাঁ হাত বাঁধা দড়িটাকে আঘাত করলো জিমের ছোরা।

বেন স্টারডিভ্যান্ট একমাত্র ভাগ্যবান, যে জিমের সঙ্গে ছোরার দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরও জীবিত ছিলো।

ইতিহাসে দ্বৈরথ
হনারেবল সমারসেট বাটলার ও
মিঃ পিটার বারোজ
১৮০০ সালে কিলকেনি ফ্রেল্যাণ্ড নামক স্থানের নিকটবর্তী এক উন্মুক্ত প্রান্তরে পিস্তল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলেন দুটি ভদ্রলোক। ঐ ভদ্রলোক দুটির নাম হনারেবল সমারসেট বাটলার ও মিঃ পিটার বারোজ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন ব্যারিস্টার। তবে বাটলার সাহেবের সঙ্গে বিরোধ মেটাতে আদালতের আশ্রয় না নিয়ে পিস্তলের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন—অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধ।
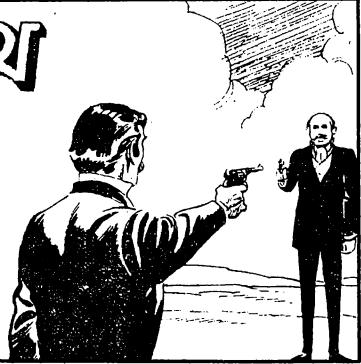
মধ্যস্থের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই যোদ্ধাদের পিস্তল গর্জে উঠলো।
বারোজ সাহেব পড়ে গেলেন

আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বাটলার অক্ষতদেহে নিয়ে দ্রুতবেগে স্থানত্যাগ করলেন।
আহ্! উঃ!

একজন চিকিৎসক তাড়াতাড়ি ধরাশায়ী বারোজকে পরীক্ষা করলেন।
নাঃ, আহত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু কয়েক মিনিট তো দূরের কথা, প্রায় একঘন্টা পরেও অনিবার্য মৃত্যুর কোন লক্ষণই তাঁর দেহে দেখা দিলো না। তিনি শুধু আর্তনাদই করতে থাকলেন।
ওঃ! আহ্ আহ্!

বিস্মিত চিকিৎসক আবার ভালো করে বারোজকে পরীক্ষা শুরু করলেন।
আরে, একি কাণ্ড! এসব কি?

এবং 'মরণোন্মুখ' বারোজ সাহেবের ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একগাদা বাদামের সঙ্গে মারাত্মক গুলিটাকেও বার করে ফেললেন।
এসবের মধ্যে গুলিটা আটকে যাওয়াতেই বারোজ সাহেব বেঁচে গেছেন।

চিকিৎসকের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে আর্তনাদ থামিয়ে ফেললেন এবং একলাফে উঠে দাঁড়ালেন।
আমি তাহলে এখন মরছি না!

হাঃ হাঃ হাঃ!
হোঃ হোঃ হোঃ!
এ স্থান এখন তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করাই ভালো।

ইতিহাসে দ্বৈরথ

উইং কম্যাণ্ডার সি. আর. স্যামসন ও জার্মান বৈমানিক

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত চার বৎসর ব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে আকাশপথে যে সব বিমানযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই যুদ্ধগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বিমানচালক যোদ্ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত রীতি অনুসারে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' এই নীতির অনুসরণ করেন নি— মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো বীরত্ব ও উদারতার জন্য তদানীন্তন আকাশযুদ্ধগুলি ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছে। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে যুযুধান বিমানগুলি কার্যসাধন করার চেষ্টা তো করতোই না, বরং বিরোধীপক্ষ যাতে ভালোভাবে দেখে-শুনে বিরোধীপক্ষের স্বরূপনির্ণয় করতে পারে সেইজন্য উভয়পক্ষই তাদের বিমানপোতগুলিকে বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তুলতো। নীল আকাশের বুকে রঙ্গীন দেহ মেলে সগর্বে টহল দিতো বিমানগুলি এবং সুযোগ পেলেই প্রাচীন যুগের যোদ্ধাদের মতো দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো মৃত্যুপণ করে। যে মানুষটি সর্বপ্রথম আকাশ পথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস তৈরী করেছিলেন, তিনি একজন বৃটিশ পাইলট — উইং কম্যাণ্ডার সি. আর. স্যামসন।

একজন বৃটিশ পাইলট আমাদের যে কোন একজন বৈমানিককে শূন্যপথে পিস্তলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছে।

আজকের দিন হলে নিশ্চয়ই একঝাঁক প্লেন উড়ে গিয়ে শত্রু বিমানকে বেষ্টন করে বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা করে দিতো, কিন্তু সেদিনের মানুষ ছিলো অন্যরকম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জার্মানীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একটি জার্মান প্লেন আকাশে উড়লো।

শুরু হলো যুদ্ধ — শূন্যে সাঁতার কাটতে কাটতে উভয়পক্ষ পরস্পরকে লক্ষ্য করে পিস্তল চালাতে লাগলো।

লড়াই চললো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। কেউ কাউকে ঘায়েল করতে পারলো না।

অবশেষে যখন দুজনেরই গুলি ফুরিয়ে গেলো, তখন পরস্পরকে অভিবাদন জানিয়ে দুই যোদ্ধা আবার প্রত্যাবর্তন করলো তাদের নিজস্ব শিবিরে।
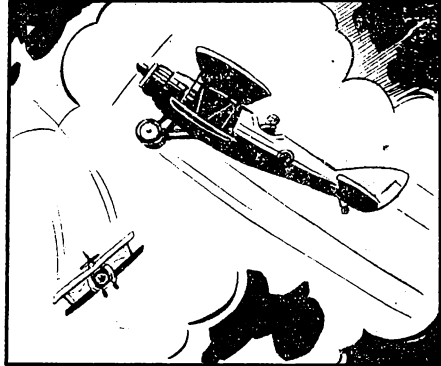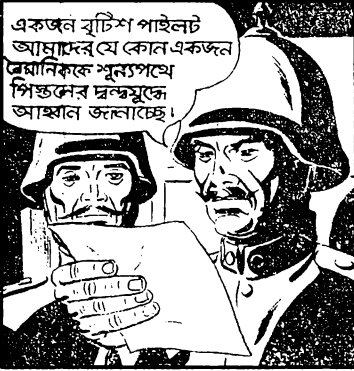
ইতিহাসে দ্বৈরথ
জেফারি হাডসন ও অফিসার ক্রফ্‌ট্‌স্‌
জেফারি হাডসন ছিল ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। অতি ক্ষুদ্রকায় বামন হলেও জেফারি ছিল অতিশয় সাহসী মানুষ।

একবার রাজার বাগানে কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশুকে একটা অতিকায় টার্কি পাখি আক্রমন করেছিলো-

বাঁচাও! বাঁচাও!

সেই সময়ে-
বাঁচাও! বাঁচাও!

ভয় নেই, আমি আসছি!

শয়তান! তোর আর নিস্তার নেই।

পাখির আয়তন জেফারির চাইতে বড়।

কিন্তু নিপুণ হাতে তরবারি চালিয়ে—

পাখিটাকে হত্যা করে হাডসন সেদিন শাণিত নখ চঞ্চুর আক্রমণ থেকে শিশুদের রক্ষা করেছিল।

এটুকু লোকের কি সাহস দেখেছিস!
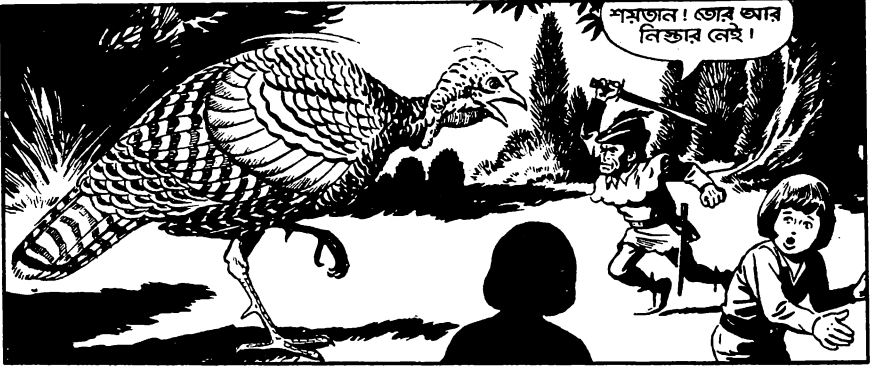
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মতোই মর্যাদাবোধ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলো জেফারি হাডসন। একদিন ক্রফটস্ নামক জনৈক অফিসার হাডসনকে নিয়ে একটু মজা করার চেষ্টা করলো।

হাডসন ক্ষেপে গেলো—
কী! আমাকে নিয়ে মস্করা। আমি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি।

হাঃ হাঃ হাঃ! এত্তোটুকু একটা পুঁচকে—যে রাজার খাওয়ার বাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে, তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ? হোঃ হোঃ হোঃ!

আমি কি তাহলে মনে করবো যে, আপনি আমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভয় পাচ্ছেন?
হাঃ হাঃ হাঃ! আপনাকে ভয়! ঠিক আছে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি রাজি।

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টস্থানে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোগ দিতে এলো জেফারি হাডসন।

ক্রফটস্ ও এসেছিলো, তবে তার সঙ্গে তলোয়ার কিংবা পিস্তল ছিলো না—অস্ত্র হিসাবে সে বাগিয়ে ধরেছিলো একটা জল দেবার পিচকারি।
এই যুদ্ধে এই অস্ত্রই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

দ্বিতীয়বারের অপমানে হাডসন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।
আমার কাছে দুটো পিস্তল। একটা আপনাকে নিতে অনুরোধ করছি।

এবারে অশ্বপৃষ্ঠে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল হাতে পরস্পরের সম্মুখীন হলো।

নির্দেশ পাওয়া মাত্র দুজনেই গুলি ছুড়লো।

আহ্!
বামন জেফারি হাডসনের পিস্তল থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি যখন ক্রফ্‌টসের বক্ষভেদ করলো তখনও তার মুখ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়নি— হাসতে হাসতেই মৃত্যুবরণ করলো অফিসার ক্রফ্‌টস্‌!

গিল্‌স্‌ বোথাম
ও
টম ব্র্যাস

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঠিক এক মাসের আগে লণ্ডনের একটি ক্লাবে গিল্‌স্‌ বোথাম ও টম ব্র্যাস নামক দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ভীষণ তর্ক শুরু হোলো। তর্কের বিষয়বস্তু খুবই তুচ্ছ, কিন্তু শ্লেষতিক্ত কণ্ঠের বাদানুবাদের ফল হোলো অতিশয় মারাত্মক। বোথামের ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চ্যালেঞ্জ তর্কযুদ্ধকে টেনে আনলো 'পিস্তল-ডুয়েল' নামক ভয়াবহ দ্বৈরথের প্রাণঘাতী সম্ভাবনার মধ্যে।

মধ্যস্থের নির্দেশ পাওয়া মাত্র গুলি ছুঁড়লেন বোথাম।

কিন্তু তার লক্ষ্য ব্যর্থ হোলো। এবার পিস্তল তুললেন টম ব্র্যাস।

টম ব্র্যাস ছিলেন 'ক্র্যাকশট',— তার গুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন বোথাম। গুলি চালাতে যাবেন টম ব্র্যাস— আর ঠিক সেই মুহূর্তে
আহা, কি মধুর সঙ্গীত। পরস্পরকে স্নেহপরায়ণ হতে অনুরোধ জানাচ্ছে।

অদ্ভুত ভাবে সেই সঙ্গীত টমের হৃদয়কে পরিবর্তিত করলো।
আর কোনো বিবাদ নয় মিঃ বোথাম! চলুন আবার ক্লাবে যাওয়া যাক।

আবার সেই ক্লাবঘরে দুই যুযুধানকে দেখা গেলো পিস্তলের বদলে কাঁচের পানপাত্রে দুজনে দুই বিভিন্ন জাতের সুরা নিয়ে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করছেন— যাদের উৎকর্ষ নিয়ে প্রথমে বাক্‌যুদ্ধ ও পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইতিহাসে দ্বৈরথ
মসিয়ে দ্য গ্র্যাণ্ড প্রী ও মসিয়ে লে পিক
১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যান্সের প্যারিস নগরীর আকাশে এক আশ্চর্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে যোগদানকারী দুই যোদ্ধার নাম হচ্ছে যথাক্রমে মসিয়ে দ্য গ্র্যাণ্ড প্রী ও মসিয়ে লে পিক। কোন কারণে পূর্বোক্ত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে মতান্তর ঘটেছিল, যার ফলে তাঁরা স্থির করলেন বেলুনে উঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে তাঁরা কলহের মীমাংসা করবেন।
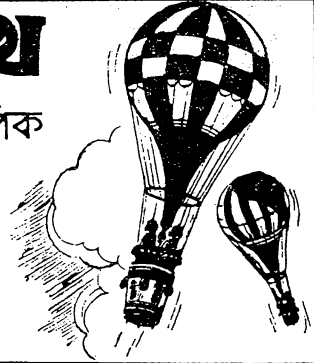
খবরটা আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।
শুনেছেন, মসিয়ে প্রী ও মসিয়ে পিক নাকি বেলুনে চড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন।

যখনকার কথা বলছি সেইসময় ইউরোপের মানুষ, বিশেষ করে ফরাসীরা, কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়তেন।

কাজেই পূর্বোক্ত দুই ভদ্রলোকের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনব ছিলো না। কিন্তু আকাশে বেলুন উড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কারও মাথায় আসে নি। অতএব নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে সেই চমকপ্রদ দ্বৈরথ দর্শন করার জন্য ভীড় করলো এক বিপুল জনতা।
ঐ যে মসিয়ে পিক আর মসিয়ে প্রী যে যার বেলুনের কাছে এসে গেছেন।

এবার বেলুনের বাঁধন খুলে দিন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যোদ্ধাদের নিয়ে আকাশে উড়লো দুটি বেলুন।
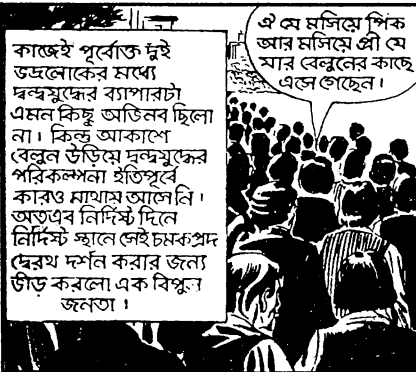
মাটি ছাড়িয়ে প্রায় আধমাইল উপরে যখন বেলুনরা উড়ছে, সেই সময় মসিয়ে লে পিক তার ব্লাণ্ডার ব্যাস থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে অগ্নিবর্ষণ করলেন।
কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হলো।
এবার গুলি ছুড়লেন মসিয়ে গ্র্যাণ্ডপ্রী।

তার গুলি মসিয়ে লে পিকের শরীরে লাগলো না বটে, কিন্তু বেলুনটাকে ফাটিয়ে দিলো।
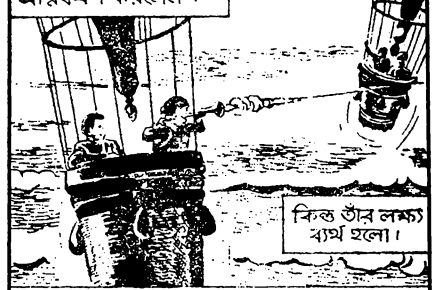
হতভাগ্য লে পিক ও তাঁর সঙ্গী মধ্যস্থকে নিয়ে বিদীর্ণ বেলুনটা সবেগে আছড়ে একটা বাড়ির ছাদের উপর পড়ে।
আর সেই আঘাতেই দুটি মানুষ ঢলে পড়লেন মরণের কোলে।

প্রেতাত্মার প্রতিশোধ
নারায়ণ দেবনাথ
কুয়াশা ঘেরা এক রাতের অন্ধকারে এই কাহিনীর শুরু
টাকা নিয়েছো, এই বুড়ো মানুষটাকে আর প্রাণে মেরোনা দোহাই তোমার— আঁ আঁ আঁ!
দুষ্কর্মের সাক্ষী আমি রাখি না।

বুড়োর লাশটা এই জলায় ডুবিয়ে দিই। তাহলে কেউ আর কিছুর হদিশ পাবে না। পরে ওর গাড়ি নিয়েই পালাবো!

ঝপ্পাস!

চোরা কাদার মধ্যে ওর লাশটা ডুবে যাচ্ছে। ভেসে ওঠার ভয় নেই।
যাও বুড়ো! কাদার তলায় গিয়ে শুয়ে থাকো।

তারপর খুনের জায়গা -- কুয়াশাবৃত রাস্তা দিয়ে দুরন্ত বেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো . . .
একি! হুইল... এ আমার সঙ্গে যেন লড়াই করছে! এটা আয়ত্তে রাখতে পারছি না।

এটা... আমার হাত থেকে জোর করে ঘুরে যাচ্ছে... আমি ধাক্কা লাগাতে যাচ্ছি!

ধড়াম!
ওঃ, খুব জোর বেঁচে গেছি। বরাত জোরে সামান্য চোট ও লাগেনি।
এর আগে কোন গাড়ির হুইল আমার সঙ্গে এরকম করে নি!

আমাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবে-- এবং যতো তাড়াতাড়ি!
স্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছাড়ছে এই তো চমৎকার সুযোগ!

উঠেছি... আর যেদিক থেকে এসেছি, এই ট্রেন তার উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তরে দিকে যাচ্ছে!
এখন আমি নিশ্চিন্ত! ট্রেন এখন আমার এবং ঐ জলার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করুক!

কিন্তু ভবিষ্যৎ অজানা রহস্যে সমাচ্ছন্ন · · ·
ক্রিক্‌ ··· ক্র্যাক !

এ-একি ! আমরা মেন লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি — ট্রেন যে আবার দিকবদল করেছে !
নিশ্চয় সুইচের গোলমালে এটা হয়েছে — তবে ভাববেন না · · ·

· · · এই লাইন জলার পাশ দিয়ে ঘুরে আবার মেন লাইনে আসবে · ·
জলা ! না ওটা আমি আবার দেখতে চাই না · · ·

ক্র্যাঅ্যাচ্‌ !
জলার চিন্তাটাই আমার মনে শিহরণ জাগিয়েছে · · ·
অন্য চলন্ত গাড়ির সাহায্যে সেই জলাভূমি আর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করবো · · ·

আমি এবার যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা বেরিয়ে যাবো · · · কি বরাত !
একটা লরি উল্টোদিকে যাচ্ছে · · · হাঃ, হাঃ · · ·
কিন্তু মুদ্রার মতন — ভাগ্যেরও দুটো দিক আছে · · · ভালো আর মন্দ !

কিন্তু হত্যাকারী লরিতে উঠতেই···
কি-কি হলো?
হাঃ আহ্?
ভটাস্!
দুম্!
দুম্!
ফটাস্!

চারটে টায়ারই এক সঙ্গে ফেটেছে! কিন্তু এতো অসম্ভব ব্যাপার!
আপনি এর কিছু করতে পারেন?
আমি···? কি করে করবো?

দেখি, টেলিফোন পেলে সারাবার লোক ডাকবো! বেশ কয়েক ঘণ্টা এখানে আটক থাকতে হবে···
কয়েক ঘণ্টা নষ্ট করার সময় আমার নেই আমি এখুণি এই তল্লাট থেকে বেরিয়ে যেতে চাই!

ছুটতে ছুটতেই একটা চিন্তা খুনীর হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করলো···
প্রথমে ছিলো মোটর গাড়ি··· তারপর ট্রেন··· আর এখন এই লরি··· অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে!

এই হচ্ছে আমার পালাবার একমাত্র সঠিক উপায়···হেলিকপ্টার··· সহজে না যেতে চাইলে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাবো!

আমি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত! আমাকে আপনার হেলিকপ্টারে একটু অন্যত্র পৌঁছে দিন।
ভেতরে যান। আমি এক জায়গায় কিছু জিনিস পৌঁছে দিতে যাচ্ছি,– সেখানেই নেমে যাবেন।
মাটি ছেড়ে খুনী এই প্রথম শান্তির আস্বাদ অনুভব করলো··· কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে!
ওঃ, আমি এই শেষবার ওই ভয়ানক জলাটাকে দেখলাম! যেন দুঃস্বপ্ন···
অ্যাই, একি? কি হচ্ছে··?

আমরা শুধু ধীরে ধীরে জলাটার ওপর পাক খাচ্ছি! পাইলট নিশ্চয় চোখ বুঁজে চালাচ্ছে···
আমাকে এখনই কিছু করতে হবে··· তাড়াতাড়ি!

অ্যাই, পাইলট·· মস্করা ছেড়ে সোজা উড়ে চলো– নয়তো গুলি করবো!
কি-কিন্তু পারছি না·· কন্ট্রোল কোন কাজ করছে না!
মনে হচ্ছে··· হেলিকপ্টর নিজে থেকেই উড়ছে!

ঠিক আছে? আমি এই অবাধ্য খোকাকে ঠিক মতো চলতে শেখাবো·· আমি চালাবার ভার নিচ্ছি!
না! তুমি সব শুদ্ধু মারতে চাও নাকি?

আমার সামনে থেকে সরে যাও, পাইলট!
আমরা আছড়ে পড়তে যাচ্ছি··· পেছনে গিয়ে বসুন ···
কয়েক মুহূর্ত··· তারপরই সংঘর্ষ
আ-ই ই ই ই!
ধড়াম!
প্রচণ্ড ধাক্কায় হত্যাকারী চালকের আসন থেকে সোজা বাইরে ছিটকে পড়লো···
আর পড়লো প্রায় সেইখানে—যেখানে জলা কিছু আগে এক বৃদ্ধকে গ্রাস করেছিলো···
চো-চোরাকাদা··· আমাকে নীচে টেনে নিচ্ছে! বাঁচাও! বাঁচাও!
দৈবক্রমে রক্ষা পাওয়া হেলিকপ্টর চালক ছুটে এলে এক বীভৎস দৃশ্য অবলোকন করতে··
বাঁচাও··· আহ্, আহ্!
কোন উপায় নেই! ওখানে যাওয়ার অর্থ আত্মহত্যা করা·· অনেক দেরী হয়ে গেছে!
মৃতের আত্মা তার হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিলো!
নদে

আশ্চর্য মুখোশ
আমাদের এই কাহিনীর নায়ক এক অতি কুৎসিত দর্শন যুবক, নাম চন্দ্রকুমার।
নারায়ণ দেবনাথ

রাস্তায় তাকে দেখলেই ফচকে ছেলেরা তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো।
এই যে আমাদের হুলোমুখোদাদা আসছে!
পাজী, বদমাইস সব। দূর হ আমার সামনে থেকে!

তার সারা জীবনে তার অসুন্দর মুখ তাকে মন্ত্রনা ছাড়া কিছুই দেয় নি। সে একা নিঃসঙ্গ অসুখী জীবন যাপন করতো।
প্রত্যেকে আমাকে ঘৃণা করে...

আয়নায় তার প্রতিবিম্বের দিকে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো।
...আর প্রতিদানে আমার মনেও লোকের প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে।

তারপর একদিন পথ চলতে এক বৃদ্ধা তার হাত ধরলো— আর অদ্ভুত ভাবে তার জীবনের পরিবর্তন হয়ে গেলো।
বাবা—দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করো!
অ্যাঁঃ? হয়েছেটা কি?

ঠোঁটের আগায় আসা রূঢ় কথাকে সে সংযত করলো।
আমি রাস্তা পার হতে পারছি না। আমি অন্ধ।

সাবধানে বৃদ্ধাকে রাস্তার অন্য পারে নিয়ে চললো সে…
আস্তে আস্তে চলুন। কোন ভয় নেই।

রাস্তা পার হয়ে…
তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা — এতো আগ্রহের সঙ্গে এক দরিদ্র বৃদ্ধার সাহায্য করার লোক খুব কমই আছে!
না, না, এটা এমন কিছুই নয়।

বৃদ্ধার পরের কথা তাকে বেশ ভাবনার মধ্যে নিক্ষেপ করলো।
যদি তোমার মুখখানা দেখার ক্ষমতা থাকতো বাবা— আমি নিশ্চিত জানি তা সুন্দর এবং করুণা মাখানো।
যদি এটা সত্যি হতো!

সেদিন রাত্রে চন্দ্রকুমার আয়নায় তার প্রতিবিম্ব আবার ভালো করে দেখলো আর একটা নতুন চিন্তা তার মনের কোনে উঁকি দিলো…
যারা আমাকে দেখে তারা সবাই আমার এই কুৎসিত মুখের জন্যে ঘৃণা করে, কিন্তু একজন অন্ধ বৃদ্ধা, যে এ মুখ দেখে নি, আমাকে আশীর্বাদ করলো দয়ালু বললো। শুধু যদি কেউ আমার এ মুখ না দেখতে পেতো…

একটা অদ্ভুত চিন্তা তার মনে এলো এবং একটা অদম্য কৌতুহল তাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে চললো। দীর্ঘ সময় ধরে সে হাঁটলো। হঠাৎ সে নির্জন পথের ধারে এক ভগ্নপ্রায় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো।
ম্যাজিকের দোকান

দোকানের মালিক বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে তাকে দেখলো তারপর সবজান্তার মৃদু হাসি হাসলো।
আপনি একটা মুখোস খুঁজছেন। আপনার মতো অনেকে আগে এসেছে। তা কি রকম মুখোস আপনার পছন্দ?
একটা সুন্দর মুখোস— দয়ালু— এই রকম। ছোট ছেলেরা আমায় দেখে যেন পালাবার কথা না ভাবে।
দোকানদার টেবিলের তলায় নীচু হলো তারপর…
এটা পরখ করে দেখুন, এটা একটা অসাধারণ মুখোস। হ্যাঁ প্রকৃতপক্ষে খুবই অসাধারণ!

কাঁপা আঙুলে ধরে চন্দ্রকুমার মুখোসটা মুখের ওপর লাগালো। ওটা বেশ নরম আর নমনীয় এবং এমন সুন্দর লেগে গেলো যেন মনে হয় ওটা ওর জন্যেই তৈরি। ও আয়নার কাছে গেলো।

সেদিন থেকে চন্দ্রকুমার অন্য মানুষ হয়ে গেলো। যে ছেলেরা তাকে দেখলেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতো এখন খুশী হয়ে ছুটে সামনে আসে।

এখন সকলেই তাকে শুভেচ্ছা জানায়

একদিন চন্দ্রকুমার সকলের অনুরোধে প্রথম পিকনিক পার্টিতে যোগ দিলো।

সেখানেই সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো।

ধীরে ধীরে সে মেয়েটির সামনে এগিয়ে এলো...

মেয়েটির মনে কোন ব্যথা আছে বুঝে সে তাকে তার খেলার সঙ্গী করে নিলো।

সেই দিন থেকে চন্দ্রকুমার মিনুর নিত্যদিনের সঙ্গী।
চলো মিনু, আজ পিং পং খেলি।
তাই চলো। তুমি না এলে আমার একটুও ভালো লাগে না। আমার দাদাও ঠিক তোমার মতো ছিলো। গেল বছর একজনের প্রাণ বাঁচাতে নিজের প্রাণ দিয়েছে। ও ঠিক তোমারই মতো ছিলো। এখন তুমিই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া দাদা।

তার সুখী জীবন জুড়ে আছে শুধু একটা ছায়া।
আমার সব কিছু মিথ্যের ওপর। মিনু যখন আমার আসল মুখ দেখতে পাবে তখন আমার সম্বন্ধে ও কি ভাববে? একজন প্রতারক! না—আমি ওকে সব জানাবো...

পরদিন...
এই তো! তোমার আসতে এতো দেরী হলো যে দাদা?
শোনো মিনু— যে মুখ দেখে তুমি আমাকে দাদার আসনে বসিয়েছো তা আমার নিজের নয়। আমার আসল মুখ দেখলে তোমার ঘৃণা হবে।

মিছামিছি তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো চন্দ্রদাদা।
না মিথ্যে নয়। এবার তবে দেখো মুখোসের আড়ালে আমার আসল মুখ।

উদ্বেগের সঙ্গে সে মিনুর দিকে ফিরলো, দেখলো ওর চোখে ক্ষণিকের বিস্ময়, পরে শুনলো তার উচ্ছল হাসি...
উঃ! তুমি চালাকি করে আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছিলে দাদা।
দেখো— এবার তুমিও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে।

তার হাত ধরে আয়নার সামনে নিয়ে গেলো মিনু...
দেখো, ভালো করে দেখো। আমার এতো ভালো দাদার মুখ কখনো অসুন্দর হতে পারে?
এ-এ আমার নিজের মুখ!
পরে অনেক খুঁজেও সে ঐ দোকানের আর সন্ধান পায় নি চন্দ্রকুমার।

জাতকের গল্প

বহুকাল আগে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে ভগবান বোধিসত্ত্ব সেখানে একজন শ্রেষ্ঠী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশের লোক তাঁকে ভালবেসে উপাধি দিয়েছিলো চুল্লক শ্রেষ্ঠী বা ক্ষুদ্র শ্রেষ্ঠী। এই শ্রেষ্ঠী ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। তাঁর একটা মহাগুণ ছিলো—তিনি কতকগুলি লক্ষণ দেখে ভালমন্দ বলতে পারতেন
নারায়ণ দেবনাথ

একদিন রাজপথে যেতে যেতে বোধিসত্ত্ব একটা মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন।
যদি কোন বুদ্ধিমান ছেলে এখুনি এই মরা ইঁদুর তুলে নিয়ে যায় তবে সে ব্যবসা করে এর সাহায্যে পরিবার পালনে সমর্থ হবে।

তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো এক নিঃস্ব যুবক, কথাটা তার কানে গেলো।
এই শ্রেষ্ঠী তো কখনও বাজে কথা বলেন না। ইঁদুরটা আমি নিয়েই যাই না!
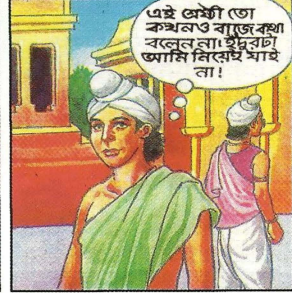
এই ভেবে সে ইঁদুরটা তুলে নিলো।
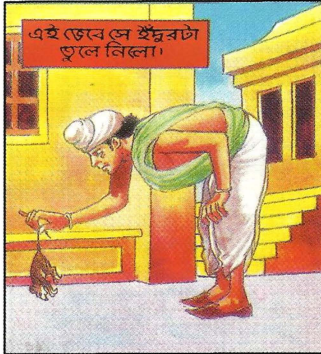
ওদিকে এক দোকানী তখন তার পোষা বিড়ালের জন্যে খাবার খুঁজছিলো।
ক্ষিদে পেয়েছে? দেখি তোর জন্যে কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কিনা।
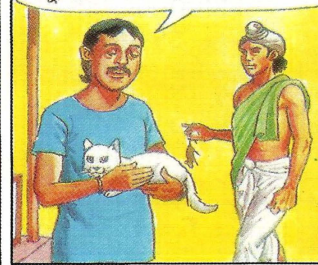
সেই সময় মরা ইঁদুর হাতে যুবককে দেখতে পেলো দোকানী
ওহে, যুবক! আমার বিড়ালটা ক্ষুধার্ত। তুমি তোমার ঐ মরা ইঁদুরটা আমার কাছে বিক্রয় করো।
এই নিন, দাম এক কড়ি দিন।
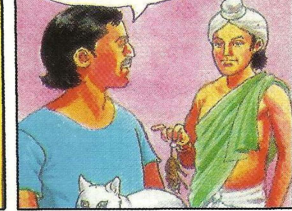
যুবক ঐ কড়িটা দিয়ে কিছুটা গুড় আর এক কলসী জল নিয়ে পথের ধারে বসে রইলো।
ফুল নিয়ে মালাকারেরা এখান দিয়ে ফেরে। ওদের গুড় আর জল খেতে দিয়ে বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে কিছু ফুল নেবো।

হলোও তাই।
তুমি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছো, তাই খুশি হয়ে আমরা তোমাকে কিছু ফুল দিয়ে যাচ্ছি।

যুবক ঐ ফুলগুলি বেচে দিলো।
ফুলগুলি বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেলো এগুলি দিয়ে আরো বেশী করে গুড় কিনবো।
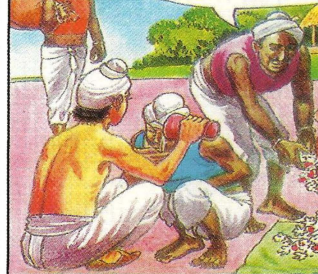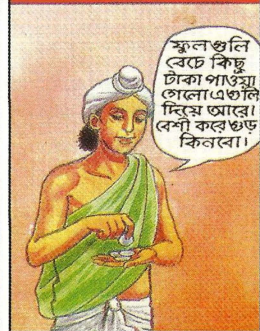
যুবক ঐ ফুলগুলি বেচে যে টাকা পেলো তা দিয়ে আবার বেশী গুড় কিনে আগের দিনের মতোই গুড় আর জল নিয়ে পথে বসে রইল।
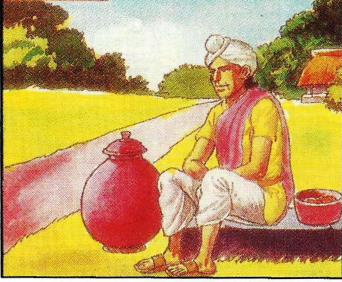
ঐদিন মালাকারেরা গুড় আর জল খেয়ে আগের চেয়ে বেশি ফুল দিলো। ঐ ফুল বেচে যুবক বেশ কিছু টাকা পেলো সেদিন।
আজ অনেক ফুল এনেছো এই নাও অর্থ।
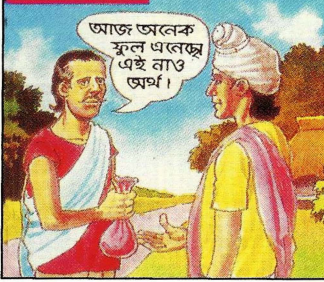
তারপর আরও কিছুদিন ঐভাবে গুড় জল খেতে দিয়ে ফুল সংগ্রহ করে সেই ফুল বিক্রি করে বেশ কিছু পুঁজি তৈরি করলো।
এবার বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়েছে।
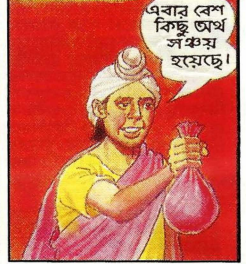
তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে রাজার বাগানের গাছ পালা ভেঙে তছনছ হলো। মালীরা ভেবে অস্থির—
এতো জঞ্জাল সাফ করবো কি করে!
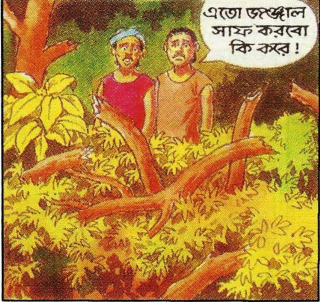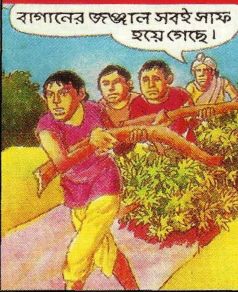
তখন ঐ যুবক পাড়ার ছেলেদের গুড় খেতে দিয়ে বশীভূত করে তাদের সাহায্যে ঐ ডালপালা রাস্তায় সরিয়ে নিয়ে এলো।
বাগানের জঞ্জাল সবই সাফ হয়ে গেছে।
এদিকে নগরের এক কুমোরের ঐ দিন হাড়ি কলসী পোড়ানোর কাঠ ছিলো না। কাঠ কিনতে বাজারে যাবার পথে সে দেখতে পেলো ঐ ডালপালার স্তূপ।
এই তো! এখানেই জ্বালানী কাঠ রয়েছে।
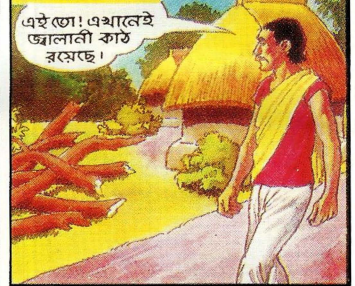
ষোলটি টাকা, কিছু মাটির গামলা ও পাত্র দিয়ে কুমোর ঐ ডালপালাগুলো কিনে নিলো যুবকের কাছ থেকে।
তোমার এই ডালপালা আমি কিনে নিলাম।

এইভাবে যুবকের হাতে জমলো চব্বিশটি টাকা। এই টাকা সম্বল করে সে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করলো।
এই দিয়েই আমাকে পরবর্তী কাজ শুরু করতে হবে।
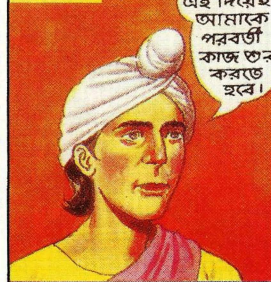
বারাণসীর পাঁচশো ঘেসেড়া প্রতিদিন মাঠে ঘাস কাটতে যেতো। তাদের যাওয়া-আসার পথের ধারে যুবক একজালা জল নিয়ে বসে তৃষ্ণার্ত ঘেসেড়াদের জল দান আরম্ভ করলো।
তুমি আমাদের তৃষ্ণা নিবারন করছো, ভাই! তোমাকে কি দেবো, বলো?
সে যখন দরকার হবে তখন বলবো।
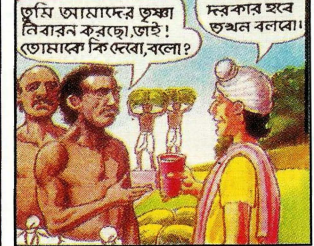
একদিন সেই যুবক তার এক বণিক বন্ধুর কাছে খবর পেলো যে, পরদিন এক অশ্ব-বিক্রেতা পাঁচশো ঘোড়া নিয়ে আসবে নগরে। ঐ খবর পেয়েই যুবক ঘেসেড়াদের কাছে গিয়ে বললো—
'ভাই সব, আজ তোমরা সবাই আমাকে এক আঁটি করে ঘাস দেবে—আর আমার ঐ ঘাস সব বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কেউ ঘাস বেচতে পারবে না।
ঠিক আছে, তাই হবে।
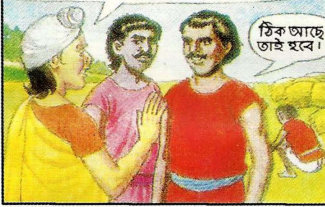
ঘেসেড়ারা রাজী হয়ে প্রত্যেকেই তার বাড়িতে এক আঁটি করে ঘাস রেখে এলো। পরদিন অশ্ববিক্রেতা কোথাও আর ঘাস কিনতে না পেয়ে হাজার টাকা দিয়ে ঐ যুবকের কাছ থেকে সব ঘাস কিনতে বাধ্য হলো।
এই নিন সহস্র মুদ্রা, আমি আপনার সমস্ত ঘাস কিনে নিলুম।

যুবকের হাতে এখন বেশ টাকা এসে গেছে! এই সময় তার এক বণিক বন্ধুর কাছে খবর পেলো যে বন্দরে প্রচুর মাল নিয়ে এক জাহাজ ভিড়েছে। খবর পেয়েই যুবক সেজেগুজে এক ভাড়া গাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো বন্দরে। সেখানে সেই জল-বণিকের সঙ্গে দর-দস্তুর করে জাহাজের সমস্ত মাল কিনে নিলো—
বায়না স্বরূপ নাম লেখা আমার হাতের আংটি দিয়ে গেলাম।
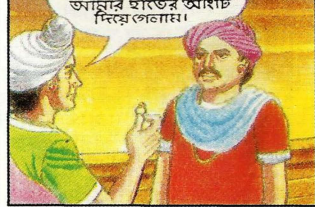
তারপর কিছুটা দূরে এক তাঁবু খাটিয়ে বসলো সেখানে। তারপর তার অনুচরদের বলে দিলো—
যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তবে যেন পর পর তিনজন প্রতিহারী দিয়ে খবর পাঠানো হয়।
আচ্ছা।
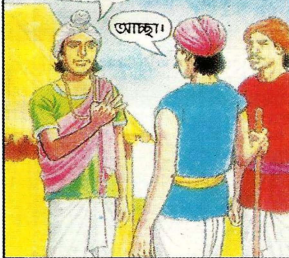
এদিকে বন্দরে প্রচুর মাল নিয়ে জাহাজ এসেছে শুনে বারাণসীর বণিকেরা সবাই ছুটে এলো মাল কিনবার জন্যে। কিন্তু যখন শুনলো যে কোন এক বণিক জাহাজের সব মাল কিনে বায়না করে রেখে গেছে, তখন তারা একে একে দেখা করতে চললো ঐ যুবকের সঙ্গে। এই বণিকের সংখ্যা একশো জন।
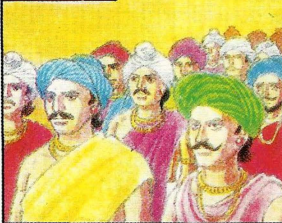
যুবক ঐ একশো জন বণিকের সঙ্গেই কথা বললো, এবং তাদের প্রত্যেকেই মালের এক-একটা অংশ ছেড়ে দিতে রাজী হলো।
কিন্তু শর্ত হলো যে আপনারা প্রত্যেকেই লাভের অংশস্বরূপ আমাকে এক হাজার টাকা অগ্রিম দেবেন।
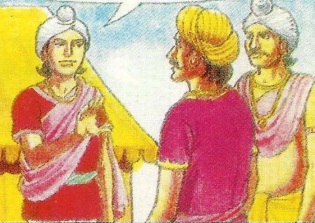
এইভাবে যুবক অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করলো এক লক্ষ টাকা। এছাড়া তার নিজের অংশের মালগুলো বিক্রি করেও সে লাভ করলো আর এক লক্ষ টাকা। এইভাবে জাহাজের মালগুলো বায়না করার ফলে সেই যুবক দুই লক্ষ টাকা লাভ করলো কয়েক দিনের মধ্যেই।
খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি দুই লক্ষ টাকা উপার্জন করেছি।
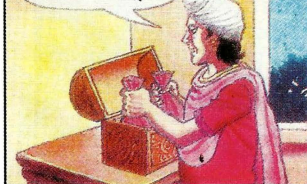
যুবকের তখন মনে পড়লো সেই চুল্লক সেট্‌ঠির কথা। সে তখন একলক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলো।
আপনার কথাতেই আমি আজ ধনী হতে পেরেছি, তাই এই এক লক্ষ টাকা এনেছি আপনাকে উপহার দিতে।
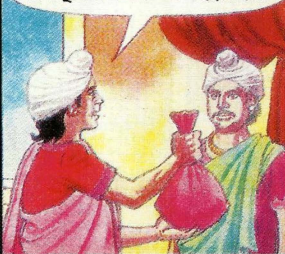
শ্রেষ্ঠী তখন যুবক কি উপায়ে এতো অল্পদিনে এতো অর্থের মালিক হয়েছে সেই কথা জানতে চাইলেন। তারপর যুবকের মুখে সব কথা শুনে তিনি এই বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ যুবকের হাতেই নিজের কন্যাকে সম্প্রদান করলেন। চুল্লক সেট্‌ঠির মৃত্যুর পর ঐ যুবকই হলো বারাণসীর শ্রেষ্ঠী।
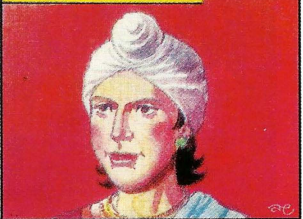
জাতকের গল্প

ব্রহ্মদত্ত যেকালে বারাণসীতে রাজত্ব করতেন, সেকালে কোন গ্রামে 'বেদব্ভ'জ্ঞাতা এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই 'বেদব্ভ' মন্ত্রের এমনই গুণ ছিলো যে, তিথিনক্ষত্রের যোগে যদি আকাশের দিকে তাকিয়ে এই মন্ত্র উচ্চারণ করা যেতো, তবে আকাশ থেকে একসঙ্গে সোনা, রূপা, মণি, বৈদূর্য, হীরক এবং প্রবাল—এই সব রত্ন ঝর ঝর করে পড়তে থাকতো। বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনে সেই 'বেদব্ভ'-মন্ত্র জানা ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

নারায়ণ দেবনাথ

একদিন ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে নিয়ে চেতিয়রাজ্যের দিকে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে 'প্রেষণক' নামে দস্যুদল তাঁদের বন্দী করলো। প্রেষণক দস্যুদলের নিয়ম ছিলো, তারা দুজনকে ধরলে একজনকে আটকে রেখে অপর জনকে পাঠাতো মুক্তি-মূল্য নিয়ে আসবার জন্যে। ঐ ব্রাহ্মণ আর বোধিসত্ত্বকে ধরে প্রেষণক দস্যুরা ব্রাহ্মণকে আটকে রাখলো আর বোধিসত্ত্বকে পাঠালো মুক্তি-মূল্য আনার জন্যে।

বোধিসত্ত্ব দু'একদিনের মধ্যেই অর্থ নিয়ে ফিরে আসবেন গুরুকে এই আশ্বাস দিয়ে গৃহে ফিরে চললেন। কিন্তু যাবার সময় ব্রাহ্মণকে বারবার বলে গেলেন—

এই বলে বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন আর ব্রাহ্মণ দস্যুদলের হাতে বন্দী হয়ে রইলেন। এদিকে সন্ধ্যাকালে আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো, তখন ব্রাহ্মণ ভাবলেন আজ যখন রত্ন-বর্ষণ যোগ আছে তখন রত্ন-বর্ষণ ঘটিয়েই তো দস্যুদলের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি— অনর্থক বন্দীদশা ভোগ করি কেন? এই ভেবে তিনি দস্যুদের বললেন—
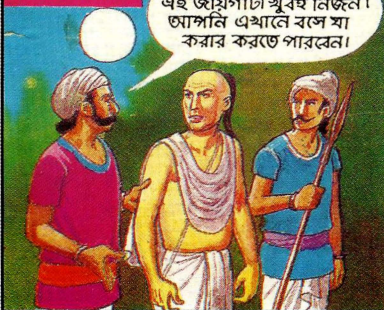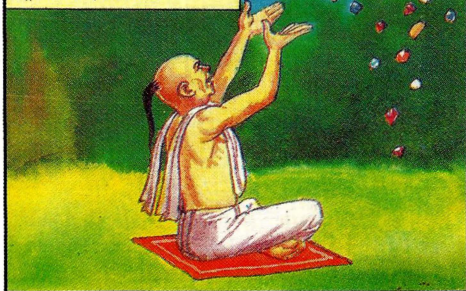
দস্যুরা সেই রত্ন চাদরে পোঁটলা বেঁধে রওনা হলো–
ব্রাহ্মণও তাদের পিছু পিছু চললেন।
এদের সঙ্গেই যাওয়া যাক।
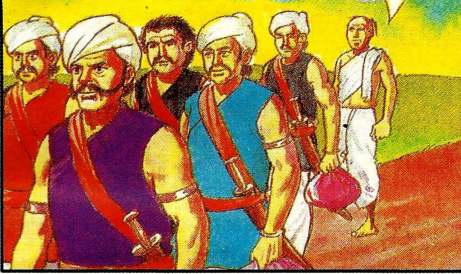
কিছু পথ অতিক্রম করার পর অপর এক দস্যুদল
প্রেষণকদের আক্রমণ করে সব রত্ন দাবি করলো।
তোমাদের ঐ রত্ন আমাদের দিয়ে দাও।

প্রেষণকরা তখন ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বললো–
ধন রত্ন চাও তো ঐ ব্রাহ্মণকে ধর। উনি আকাশের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পাঠ করলেই আকাশ থেকে রত্ন বর্ষণ হয়।
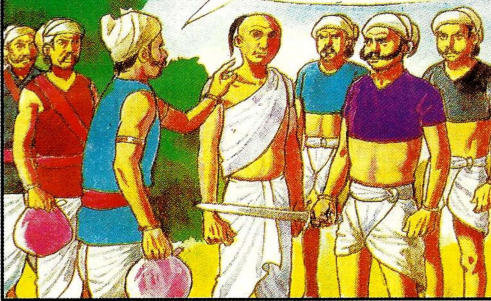
আমাদের রত্ন চাই, রত্ন দাও।
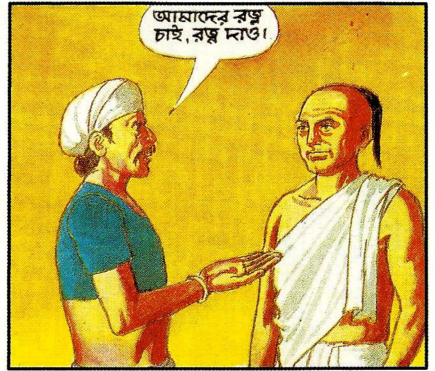
তখন ব্রাহ্মণ তাকে বললেন–
আর এক বৎসর পর রত্ন-বর্ষণ যোগ আসবে ততদিন অপেক্ষা না করলে তো তোমাদের কিছু দিতে পারবো না।

কিন্তু তারা সে কথা মানলো না। ভাবলো ব্রাহ্মণ বুঝি চাতুরী করছেন। তখনই তারা ব্রাহ্মণকে কেটে ফেললো, তারপর প্রেষণকদেরও মেরে কেটে তাদের সমস্ত রত্ন নিয়ে নিলো।
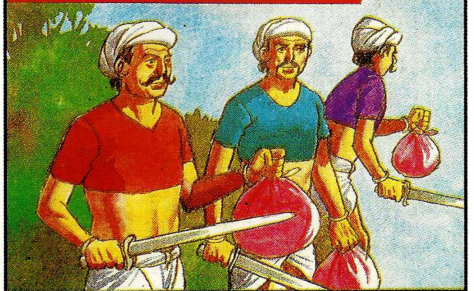
কিন্তু ব্যাপার এখানেই মিটলো না। ধনের ভাগাভাগি নিয়ে দ্বিতীয় দস্যুদলের নিজেদের মধ্যেও মারামারি লেগে গেলো। তারা পাঁচ শো'জন দুই দলে বিভক্ত হয়ে কাটাকাটি করতে লাগলো। দু'জন বাদে ওরা পাঁচ শো' দস্যুও নিহত হলো। তখন অবশিষ্ট দুইজন সমস্ত ধন দখল করে নিকটবর্তী এক গ্রামে লুকিয়ে রাখলো। তাদের একজন ধন রক্ষা করতে লাগলো, আর অপরজন গ্রামে গেলো খাবার আনতে

তুমি পাহারায় থাকো, আমি খাবারের সন্ধানে যাচ্ছি।

যে ধন রক্ষা করছিলো সে ভাবলো-
যদি অপর দস্যুকে হত্যা করে ফেলি তাহলে তো একলাই সমস্ত ধন ভোগ করতে পারবো।
এই ভেবে সে তলোয়ার হাতে করে দ্বিতীয়জনের অপেক্ষা করতে লাগলো।

এদিকে দ্বিতীয়জন খাবার আনতে গিয়ে ভাবলো।--

যদি অপরজনের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করি তাহলে তো আমি একাই সমস্ত ধন ভোগ করতে পারি।

এই ভেবে সে নিজের অংশ খেয়ে বাকী অংশে বিষ মিশিয়ে নিয়ে গেলো।
যা বিষ মিশিয়ে দিয়েছি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। তারপর সব ধন রত্ন আমার।
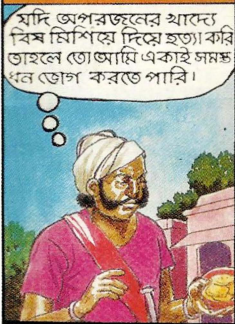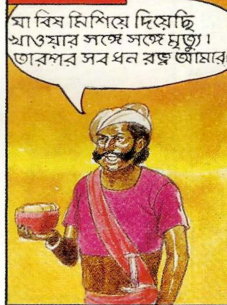
সে খাবার নিয়ে যেতেই প্রথম দস্যু অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলো—তারপর বিষমাখা খাবার খেয়ে সেও প্রাণত্যাগ করলো।
খাবারে বিস মিশিয়ে এনেছিলো। আঁ-আঁ-আঁক!

এইভাবে ব্রাহ্মণ, পাঁচশত প্রেষণক এবং অপর পাঁচশত দস্যুও নিহত হলো। বোধিসত্ত্ব তাঁর কথামতো অর্থ নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন—ধনরত্ন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে। তখনই তিনি ব্যাপার বুঝতে পারলেন। তারপর ব্রাহ্মণের দেহ কুড়িয়ে এনে তার সৎকার করলেন প্রেতপূজা করলেন। পরে বাকী এক হাজার দস্যুর শব দেখতে পেয়ে বললেন –

অন্যায় ভাবে যারা নিজেদের সুবিধা করতে চায় তারা নিজেদেরও সর্বনাশ করে, অপরেরও সর্বনাশ করে।

বোধিসত্ত্ব সমস্ত রত্ন নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন, তারপর সেই সমস্ত ধন দান করে এবং বহুবিধ সৎকার্যে পুণ্যার্জন করে যথাকালে মৃত্যুর পর স্বর্গধামে চলে গেলেন।
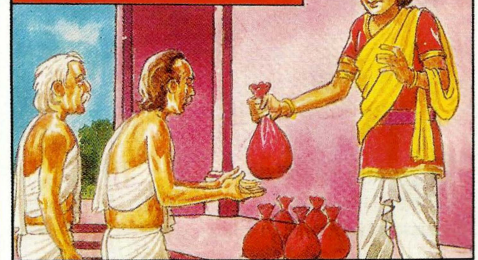
বিভিন্ন প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
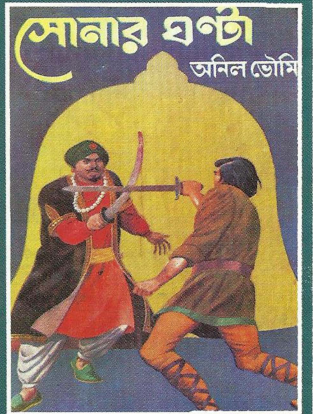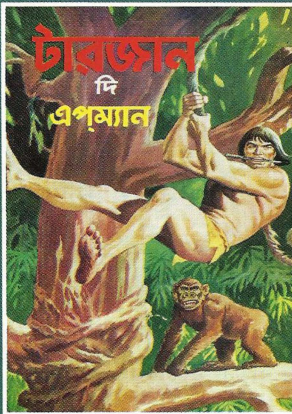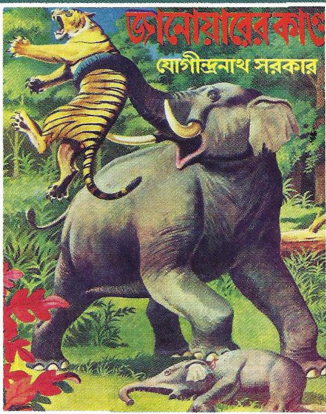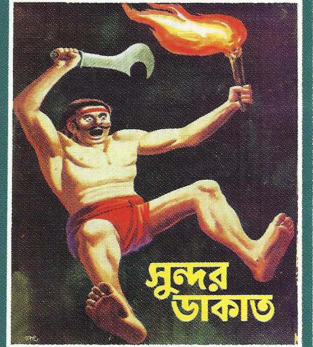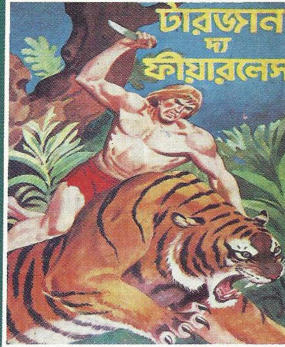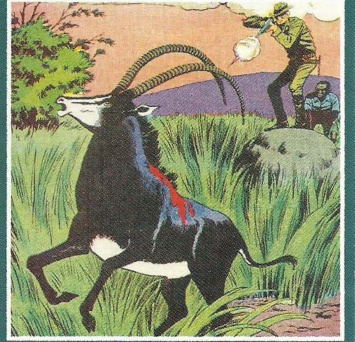
নারায়ণ দেবনাথের ইলাস্ট্রেশনের মূল বৈশিষ্ট্য হল ছবিগুলির রিয়ালিস্টিক নেচার যা বিশ্বমানের। ছবিগুলির অ্যাকশনধর্মিতা দেখার মত।
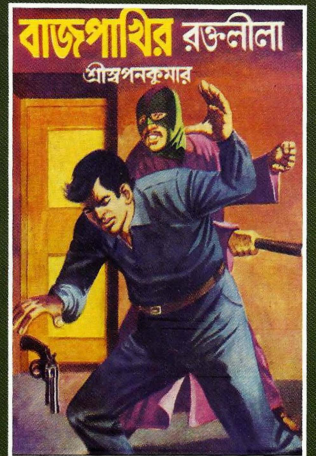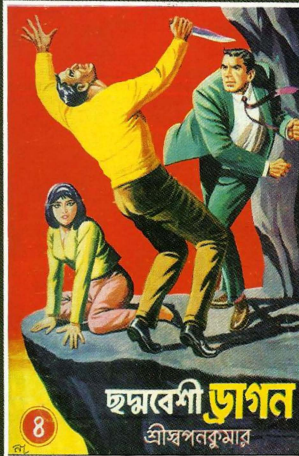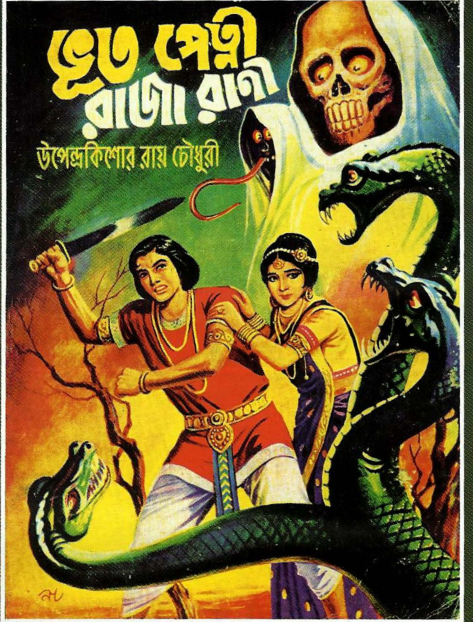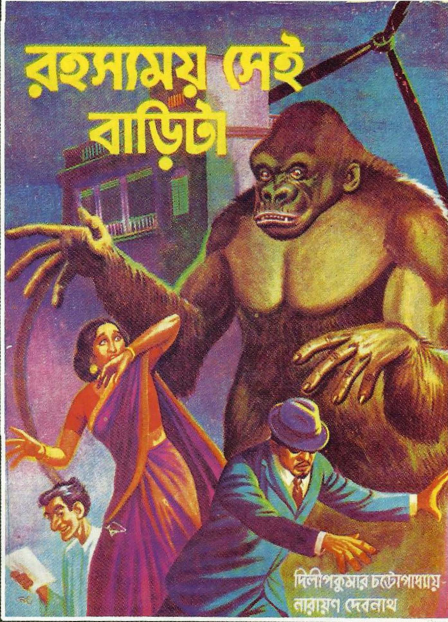
নারায়ণ দেবনাথ বইয়ের প্রচ্ছদে নিজস্ব ঘরানার সৃষ্টি করেন। প্রতিটি ছবিই তিনি আঁকতেন গভীর মমতায়। অযোধ্যা ইন্টার প্রাইজের জন্য এঁকেছেন গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়ের গল্পের প্রচ্ছদ। ভীষণ জনপ্রিয় হয় 'ভূতপেত্নীর রাজারাণী'র প্রচ্ছদ। যা সূচনা করে বইয়ের মলাট ইলাস্ট্রেশনের নতুন অধ্যায়।
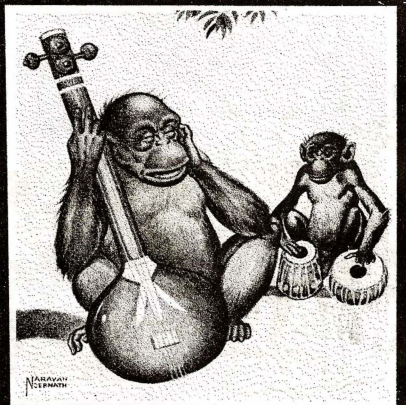
সিরিয়াস থেকে সিরিও-কমিক সব আঁকাতেই নারায়ণ দেবনাথ সমান দক্ষ। এঁকেছেন 'টারজান', 'শিম্পু', শিবরাম চক্রবর্তীর 'হর্ষবর্ধন'।

১৯৪৯ সাল নাগাদ করা নারায়ণবাবুর প্রথম ইলাস্ট্রেশন 'কুমার-সম্ভব'। গোড়ার দিকে প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে ছবি আঁকতেন। পরে নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করেন। পছন্দের বিষয় ছিল বন্যপ্রাণী।
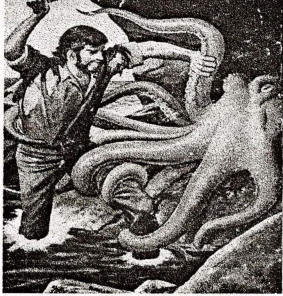
নারায়ণ দেবনাথের আঁকার ভার্সেটাইলিটির কয়েকটি নমুনা। এঁকেছেন ছড়ার ছবি, কমিক্স, বিদেশী অনুবাদ বইয়ের ছবি।

দৃষ্টিহীন

১৯৬২ সাল নাগাদ নবকল্লোল পত্রিকায় করা নারায়ণ দেবনাথের কিছু ব্যতিক্রমী অলংকরণ।
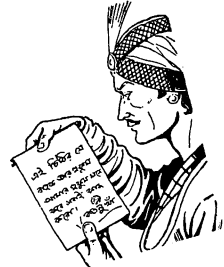
১৯৬২ সালে (১৩৬৯ বৈশাখ) দেবসাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত নবকল্লোল পত্রিকার পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে প্রকাশিত হয় 'চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী' যা বই আকারে অগ্রন্থিত।
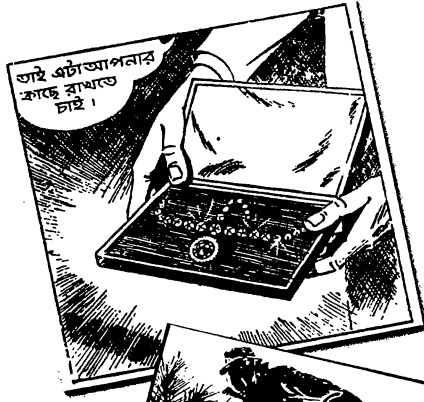
গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত নারায়ণবাবুর করা প্রথম গোয়েন্দা চিত্রোপন্যাস 'হীরের টায়রা'র (১৯৬৫) কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত।

এক নজরে
শিশু সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথ

হাঁদাভোঁদা'র তুমি, নন্টেফন্টে'র তুমি,
বাঁটুল দি গ্রেট দিয়ে যায় চেনা।

জন্ম— ১৯২৫ সাল। কার্তিক মাসে। হাওড়া শিবপুরের পৈতৃক বাড়িতে।
বাড়ি— ৫২/২, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০২। পৈতৃক বাড়িটির বয়স আজ প্রায় দেড়শো।
বাবা-মা— হেমচন্দ্র দেবনাথ এবং রমণসোনা। কাকা আর বাবার সোনার দোকান ছিল শিবপুরে। স্বাধীনতার অনেক আগে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের মুন্সিগঞ্জ থেকে শিবপুরে চলে আসেন।
ভাই-বোন— তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই বড়ো, দু-বোন ছোটো।
বাল্যকাল— এমনিতে খুব মুখচোরা লাজুক স্বভাবের ছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে দলবেঁধে সাঁতার কেটে গঙ্গা পারাপার করতেন। দু-তলা উঁচু জেটি থেকে ঝাঁপ দিতেন গঙ্গার বুকে। বিকাল হলেই বন্ধুদের সঙ্গে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। বাড়ি ফিরে পড়তে বসা। তবে লেখাপড়া করতে চাইতেন না। গল্পের বই বিশেষত অ্যাডভেঞ্চার গল্প পড়তে খুব ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় টারজানকে নকল করে সরকাঠির তির দিয়ে বাড়ির দরজায় লক্ষ্যভেদ করতেন। বাড়ির কাছেই তিনরাস্তার মোড়ে পারিবারিক গয়নার দোকান ছিল। সেখানকার রকে ও বিধু ময়রার দোকানের সামনে বসে দেখতেন এলাকার ছেলেদের নানারকম দুষ্টুমি-মশকরা। পরবর্তীকালে সে-সকল ঘটনা থেকেই জন্ম নিয়েছে হাঁদাভোঁদার কাণ্ডকারখানার গল্প। তখনকার মোনো প্লেন দেখে শখ হয়েছিল প্লেন চালানোর। বডিবিল্ডার হওয়ার স্বপ্নে কাকভোরে উঠে যেতেন 'বাজে শিবপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব'-এর ব্যায়ামাগারে! গানের গলা ছিল অসাধারণ। গান কপি করার ক্ষমতাও ছিল দারুণ। আঁকার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। ভালো ছবি দেখলেই কপি করতে বসতেন। বাড়ির দেওয়ালগুলি ছিল তাঁর পেন্টিং ক্যানভাস! এসব দেখেই বাড়ির সকলে বলত 'আর্ট স্কুলে' ভরতি করতে।
প্রথাগত শিক্ষা— শিক্ষার শুরু হাওড়া শিবপুরের অনিলবাবুর পাঠশালাতে। পরে বি কে পাল ইনস্টিটিউশনে।
আঁকার প্রশিক্ষণ— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪০-এর দশকে) 'ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ' থেকে 'ফাইন আর্টস'-এ পেইন্টিং নিয়ে আঁকার প্রশিক্ষণ নেন। যদিও তৎকালীন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ছ-বছরের কোর্সের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দেওয়া হয়নি।
জীবনের উন্নতির শুরুতে— তখনকার দিনে আর্টিস্টের কাজের তেমন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তাই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে কয়েক বছর স্থানীয় প্রসাধন দ্রব্য নির্মাতাদের জন্য ছোটোখাটো আঁকার কাজ করতেন। যেমন— পাউডার, আলতা, সিঁদুরের বাক্সের ডিজাইন, লেবেল বা লোগো। পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপনের স্লাইড (যা সিনেমা শুরুর আগে বা বিরতিতে দেখানো হত) এবং জীবনতৃষ্ণা, স্বরলিপি, কমললতা প্রভৃতি সিনেমার টাইটেল কার্ডও করেছেন।
ছাপার আকারে প্রথম কাজ— 'কুমারসম্ভবম্'-এর বাংলা অনুবাদ বইয়ের ইলাস্ট্রেশন। পরবর্তীকালে যা নিয়ে গিয়েছিলেন শুকতারা দপ্তরের সম্পাদকের কাছে।
প্রথম সাফল্য— প্রায় পঁচিশ বছর বয়সে, প্রথম সুযোগ আসে ১৯৪৯-৫০ সালে তৎকালীন বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশক সংস্থা 'দেব সাহিত্য কুটির'-এর ইলাস্ট্রেটর হিসাবে। প্রথম ইলাস্ট্রেশন হিসাবে তৎকালীন বিখ্যাত শুকতারা পত্রিকার তিনটি ছবি এঁকে পেয়েছিলেন মোট ৯ টাকা! এর পর একের পর এক গল্পের ছবি, বইয়ের মলাটের ইলাস্ট্রেশনের কাজ। তবে কোনোকালেই চাকরি করেননি কোনো প্রকাশনা সংস্থায়।
আঁকার আদর্শ— প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের অনুপ্রেরণা মানতেন এবং গোড়ার দিকে তিনি প্রতুলবাবুর অনুসরণে ছবি আঁকতেন।
প্রথম জনপ্রিয় কমিক্স— হাঁদা-ভোঁদা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ সালে শুকতারা পত্রিকাতে। (১৩৬৯, আষাঢ়; গল্পের নাম 'হাঁদা ভোঁদার জয়')।
প্রথম কমিক্স বই— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেবেলা নিয়ে সিরিয়াস কমিক্স বই 'রবি-ছবি'। ১৯৬২ সালে বারাণসীর 'সর্বোদয় সাহিত্য প্রকাশন' থেকে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। প্রথম মজার কমিক্স বই আকারে 'নন্টে-ফন্টে' সিরিজ প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে।
নিজের প্রিয় কমিক্স চরিত্র— বাঁটুল দি গ্রেট (তার অসীম ক্ষমতা বলে)।
নিজের প্রিয় সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি— নন্টে আর ফন্টে।
কমিক্সের বৈশিষ্ট্য— চরিত্রগুলি সহজ, সরল যেখানে কোনো বিদ্বেষ, কটাক্ষ, দুঃখ বা রাজনীতি নেই। নিছক ছোটোদের 'অ্যাবসার্ড হিউমারের' মজা। মূলত সুন্দর 'ফানিস' গল্প, তার সঙ্গে 'ছাপা অক্ষরের মতো' ঝরঝরে হাতের লেখায় জোরালো 'সংলাপ' আর

অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁকা। তাঁর কমিক্‌সে অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হয়েছে অদ্ভুত সব মজাদার শব্দে!

নিজেকে পরিচয় দেন— শিশু সাহিত্যিক হিসাবে। কার্টুনিস্ট হিসাবে নয়। তিনি ছবিতে গল্প আঁকেন।

কমিক্‌স ছাড়া অন্য প্রিয় কাজ— গল্পের ছবি, বই-এর মলাটের ইলাস্ট্রেশনের কাজ করেছেন। নিজের পছন্দ অ্যাকশানধর্মী সিরিয়াস ছবি। এ ছাড়াও গল্পের ধরন অনুযায়ী এঁকেছেন সিরিয়াস রিয়ালিস্টিক ছবি (যেমন টারজান) বা সিরিয়ো-কমিক ছবি (যেমন শিম্পু)।

সাংসারিক জীবন— ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিয়ে করেন তারাদেবীকে। এক মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ের নাম নমিতা, তারপর বড়ো ছেলে স্বপন ও ছোটো তাপস।

সেরা স্বীকৃতি— সকলের ভালোবাসা, শ্রদ্ধাই সবচেয়ে বড়ো পাওনা। বিশেষ করে ছোটোদের।

ক্ষোভ— কোনো ক্ষোভ নেই প্রাপ্য স্বীকৃতি সরকারি বেসরকারি কোনো স্তরেই না-পাওয়া নিয়ে। নিজের কাজ নিজে করে চলেন। ছোটোরা বাদে কার কীরকম লাগল, কে তা স্বীকৃতি দিলেন এসব নিয়ে তিনি চিরকাল উদাসীন। তাঁর একটাই আফশোস, এখনকার কার্টুনিস্টরা খুব বেশি রাজনৈতিক কার্টুন আঁকার দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে। বেশি সংখ্যক শিল্পী ছবিতে গল্প করতে এগিয়ে আসছেন না আজকাল।

স্মরণীয় ঘটনা— শিশু সাহিত্যিক হিসাবে ২০০৭ সালের ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে গিয়ে তখনকার রাষ্ট্রপতি আবদুল কালামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারাদেশের নামিদামি শিশুসাহিত্যিকেরা।

মানুষ হিসেবে— শান্ত, নিরহংকার, প্রচারবিমুখ মানুষ। বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। মজা করে কথা বলেন। গল্পের মতো নিজেও খানিকটা রোমাঞ্চপ্রিয়।

হবি— ফোটো তোলা একসময়ের শখ ছিল। খালি গলায় অসাধারণ পুরোনো দিনের গান করতেন এককালে।

মজার তথ্য— কখনো পেনসিল কাটার কল (শার্পনার) ব্যবহার করেননি।

অন্যান্য প্রিয় যা কিছু— **প্রিয় কমিক্‌স**— টারজান ও টম অ্যান্ড জেরি। **প্রিয় বাঙালি শিল্পী**— প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ময়ূখ চৌধুরী (প্রসাদ রায়)। **প্রিয় লেখক**— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও প্রফুল্ল রায়। **প্রিয় সাহিত্য**— দেশি বিদেশি গোয়েন্দা কাহিনি। **প্রিয় গায়ক**— জগন্ময় মিত্র, শ্যামল মিত্র, কে এল সায়গল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মান্না দে। **প্রিয় সিনেমা**— পুরোনো ইংরাজি অ্যাডভেঞ্চারের সিনেমা। কলকাতার 'মেট্রো' ও 'লাইট হাউস' সিনেমা হলে প্রচুর পুরোনো ইংরেজি ছবি দেখতেন। **প্রিয় নায়ক**— রবিনহুডের ভূমিকায় এরলফ্লিন ও টারজানের ভূমিকায় জনি ওয়েসমুলার। অ্যাকশানে ব্রুস লী। **প্রিয় খাবার**— ভোজনরসিক নারায়ণবাবুর পছন্দ খাসির মাংস, চিংড়ি, ইলিশ ও কই মাছ আর মিষ্টির মধ্যে ঘিয়ে ভাজা কালোজাম। এ ছাড়াও ফিশফ্রাই, ফিস কবিরাজি, কাটলেট ভীষণ প্রিয়।

টেলি সিরিয়াল, অ্যানিমেশন ইত্যাদি— উল্লেখযোগ্য টেলি সিরিয়ালগুলি হল– ২০০১ সাল নাগাদ উদয়ন ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'হাঁদা ভোঁদা' টেলি এপিসোড এবং ২০০২ সালে সন্দীপন বর্মনের পরিচালনায় 'নন্টে ফন্টে'। অ্যানিমেশনে বাঁটুল ও হাঁদা-ভোঁদা করেন অজয় সেনশর্মা আর ডানপিটে খাঁদু ও নন্টে-ফন্টে করেন সৌরভ মণ্ডল। নারায়ণবাবুর উপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম ২০০৫ সালে প্রথমে করেন উজ্জ্বলকুমার দাস এবং পরে প্রতীম চট্টোপাধ্যায়। ইন্টারনেটে তাঁর জনপ্রিয় কমিক্‌সের নমুনা দেখতে পাওয়া যায় 'বাংলা লাইভ্ ডট কম' ইত্যাদিতে। ফরিয়াপুকুরের 'স্মরণিকা' থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'বাঁটুল দি গ্রেট'-এর উপর গ্রিটিংস্ কার্ড।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন : শান্তনু ঘোষ

আমার ছবি আর কমিকসের যে সংকলন
হতে চলেছে তাতে শ্রীমান শান্তনুর অক্লান্ত
পরিশ্রমের কোন তুলনা নেই। তাই স্নেহের
শান্তনুকে আমার অন্তরের ভালোবাসা
জানাচ্ছি।

নারায়ণ দেবনাথ
১৩. ৯. ২০১০

এখন আমি বড়ো হয়েছি; তবু মনের ভেতর এখনও যেন সেই ছেলেবেলাটা লুকিয়ে আছে। বোধ হয় সকলেরই থাকে। সেই রকমই এক ভাবনা থেকে মনে পড়েছিল যে ছেলেবেলায় খুব ইচ্ছা হত শ্রীনারায়ণ দেবনাথকে যদি দেখতে পেতাম তবে জানতে চাইতাম যে তিনি কী করে এত সুন্দর ছবি আঁকেন! সেই ছেলেমানুষি ইচ্ছা থেকেই খোঁজ করে শ্রীদেবনাথের বাড়ি যাওয়া ও পরিচয়। ছেলেবেলাতে তাঁর আঁকা অদ্ভুত সুন্দর প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ আর কমিক্‌স অবাক বিস্ময়ে দেখতে দেখতে তাঁর ভক্ত তো ছিলামই; সেই সঙ্গে মহৎ মানুষটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় বাড়ার পর থেকে সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়, কাছে থেকে দেখার সুবাদে জানতে পেরেছি তাঁর সম্পর্কে অনেককিছুই। প্রচারের আলোর আড়ালে থাকা এই মহৎ শিল্পী মানুষটি যে এত সাধারণ আর নিরহংকার হতে পারেন তা ভাবতেও পারিনি! সারাজীবন ধরে পাওয়া ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ছাড়া বাকি অনেককিছুতেই তিনি বঞ্চিত। প্রাপ্য স্বীকৃতির কিছুই পাননি বলা চলে। এটাও বলা ভুল হবে না যে— আর্থিক দিক থেকেও দিনের পর দিন ঠকেছেন অনেকের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি যে 'হাসির রাজা'; তাই সে সব তুচ্ছ 'না পাওয়া' নিয়ে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ বা আফশোস কিছুই নেই। তবু জানতে পেরেছিলাম যে তাঁর অগণিত পাঠকের মতো তিনি নিজেও চান যে তাঁর সারা জীবনের কাজের একটি একত্রীবদ্ধ সংকলন হোক। শ্রীনারায়ণ দেবনাথের এক সামান্য ভক্ত হিসাবে আমারও খুব আফশোস হত এসব নিয়ে।

আত্মমগ্ন এই শিল্পী নিজেকে একজন 'শিশু সাহিত্যিক' হিসাবে ভাবেন। কারণ তাঁকে মাত্র দুই-চারটি পাতার স্বল্প পরিসরে একটি সম্পূর্ণ গল্প ভেবে, রেখায়-লেখায় এঁকে পাঠক মন জয় করতে হয়। এখনও লেখার সময় তিনি ছোটোদের মতো করে ভাবেন। ছোটোদের ছাড়া বড়োদের জন্য কখনও কোনো কমিক্‌স স্ট্রিপ বা রাজনৈতিক কার্টুন করেননি। তাঁকে আমরা 'শিশু সাহিত্যিক' ছাড়া আর কী-বা বলতে পারি?

কিন্তু ক-জন সেসব 'ছেলেমানুষি' কাজকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন তা আমার জানা নেই। আমি সাহিত্য বা বই প্রকাশনা জগতের মানুষ নই। কিন্তু এক ভক্ত হিসাবে নারায়ণবাবুর জন্য দৌড়েছি বিখ্যাত এক প্রকাশনা সংস্থায়... বারবার... আবেদন রেখেছি যে শ্রীনারায়ণ দেবনাথের করা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত কিন্তু বই আকারে অগ্রন্থিত সে সব ছোটো বড়ো কমিক্‌সগুলিকে যদি জড়ো করে তাঁরা সংকলন বই আকারে প্রকাশ করেন। যদি পাঠক সমাজে তাঁকে 'সাহিত্যিক' হিসাবে স্বীকৃতি দেন। বাস্তবিকই, পাতলা চটি কমিক্‌স বইকে 'সাহিত্যকর্ম' হিসাবে কেউ মূল্য দেয় কি? প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে

এই কাজের জন্যে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বেগার খাটা'র আশ্বাসও দিয়েছিলাম তাঁদের। কিন্তু বছর কয়েক ধরে করা এই 'অরণ্যে রোদন'-এ লাভ হয়নি কিছুই!

হতাশায় যখন মন ভেঙে যাওয়ার মুখে তখন পরিচয় হল— 'লালমাটি' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার তরুণ প্রকাশক নিমাই গরাই-এর সঙ্গে।

আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে তিনি নারায়ণ দেবনাথের 'কমিক্সসমগ্র' প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। নিজেও অনেক পরিশ্রম করে বহু দুষ্প্রাপ্য, হারিয়ে যাওয়া ছবি, ছবিসহ গল্প সংগ্রহ করেছেন।

অনেক ঝুঁকি নিয়ে 'লালমাটি' এক নতুন প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে, আমার সেই দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ করলেন। সেই জন্য নিমাইদা আর তাঁর 'লালমাটি'কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই। আমার সৌভাগ্য যে এই '৫০ বছরের সেরা ছোটোদের বই'-এর কাজে যুক্ত হতে পেরেছি।

ধন্যবাদান্তে—
শ্রীনারায়ণ দেবনাথের অনুগত ভক্ত শান্তনু ঘোষ

গ্রন্থ-প্রসঙ্গ
প্রকাশকালানুযায়ী তথ্যপঞ্জি

বাংলা কমিক্স স্ট্রিপের 'জীবন্ত লিজেন্ড', বাঙালির নস্টালজিয়া নারায়ণ দেবনাথের জনপ্রিয়তা মূলত হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট এবং নন্টে আর ফন্টে এই তিনটি কমিক্স দিয়ে হলেও তিনি সৃষ্টি করেছেন আরও অসংখ্য কমিক্স। কমিক্স শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ ভারতবর্ষের তথা এশিয়ার এমন একজন বিরল শিল্পী যিনি গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বিবিধ কমিক্স সৃষ্টি করে চলেছেন। বাংলার 'ডিজনি' নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট ছোটোবড়ো কমিক্স স্ট্রিপের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে! মাত্র কয়েকটি ছাড়া সব কমিক্সের কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও চিত্ররূপ সবই একাধারে তাঁর একার সৃষ্টি! সম্ভবত এমন নজির সারা বিশ্বে বিরল। মজার ও সিরিয়াস এই দুই ধরনের অসংখ্য কমিক্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমিক্সের প্রকাশকাল অনুযায়ী তথ্যপঞ্জি দেওয়া হল—

★ **রবি-ছবি (সাদা-কালো)** : ১৯৬১ সালের মে মাসে সাহিত্যিক বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-লিখিত এবং নারায়ণ দেবনাথ-চিত্রিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর ছেলেবেলা নিয়ে কমিক্স 'রবি-ছবি' প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আনন্দমেলা পত্রিকায়। ৫০ পাতার এই পূর্ণদৈর্ঘ্যের রবিছবি কমিক্স প্রথম বই আকারে ১৯৬২-তে হিন্দি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করেন সর্বোদয় সাহিত্য প্রকাশন, বারাণসী। কমিক্স-এর বই হিসাবে এটিই নারায়ণবাবুর প্রথম প্রকাশ যদিও গল্পটি তাঁর লেখা নয়। বইটি পুনর্মুদ্রণ করে লালমাটি ২০১০ সালে।

★ **রাজার রাজা/ছবিতে বিবেকানন্দ (সাদা-কালো)** : ১৯৬২ সালে সাহিত্যিক বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-লিখিত ও নারায়ণ দেবনাথ-চিত্রিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর জীবনী নিয়ে কমিক্স 'রাজার রাজা' প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আনন্দমেলা পত্রিকায়। দুই বছর ধরে প্রতি সোমবারের সাপ্তাহিক আনন্দমেলা পত্রিকায় চলা এই পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ১০০ পাতার কমিক্স ১৯৬৫ সালে (১৩৭২ ভাদ্র) বই আকারে প্রকাশ করেন আনন্দবাজার প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত শুকতারা মাসিক পত্রিকাতেও সমসাময়িক সময় 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে কমিক্স শুরু হয় জনৈক শিল্পী শিবশংকরের হাতে ১৯৬১ সালে (১৩৬৮ চৈত্র)। ১৯৬২ সালের মাঝপথে (১৩৬৯ আষাঢ়) যার দায়িত্ব দেওয়া হয় নারায়ণ দেবনাথকে। একই সময়ে শুকতারা ও আনন্দমেলায় চলতে থাকে নারায়ণ দেবনাথ চিত্রিত স্বামী বিবেকানন্দ। পরবর্তী কালে শুকতারায় প্রকাশিত ৪৪ পাতার গল্পটি 'ছবিতে বিবেকানন্দ' নামে ১৩৭১ সালে প্রকাশিত করে দেব সাহিত্য কুটীর, যার প্রচ্ছদটি আঁকেন নারায়ণবাবু।

★ **চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী (সাদা-কালো)** : ১৯৬২ সালে (১৩৬৯ বৈশাখ) দেবসাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত নবকল্লোল পত্রিকার পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে প্রকাশিত হয় 'চিত্রে দুর্গেশনন্দিনী' (৩৩ পাতা) যা বই আকারে অগ্রন্থিত।

হাঁদা ও ভোঁদা (সাদা-কালো) : ১৯৬২ সাল (১৩৬৯ আষাঢ়) থেকে নারায়ণ দেবনাথ দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় শুরু করেন স্কুলপড়ুয়া বিচ্ছু মানিকজোড় হাঁদা ভোঁদার কাণ্ডকারখানা। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বাংলা কমিক্স জগতে এক নব অধ্যায় সূচিত করে। লরেল-হার্ডির খুদে সংস্করণ হিসাবে এঁকেছিলেন রোগা হাঁদা ও মোটা ভোঁদা চরিত্র দুটি। নিজের ছোটোবেলার বিভিন্ন ঘটনা, পাড়ার ছেলেদের বিভিন্ন দুষ্টুমির টুকরো স্মৃতি থেকে তৈরি করেছিলেন 'হাঁদা ভোঁদা'র গল্প। হাঁদার অ্যালবোট স্টাইলের চুলটি খুব মজার দেখতে। হাঁদার পুরো নাম হাঁদারাম গড়গড়ি আর ভোঁদার পুরো নাম ভোঁদা পাকড়াশী। সঙ্গে থাকেন পিসেমশাই বেচারাম বকশি। প্রথম গল্পের নাম 'হাঁদা ভোঁদার জয়' যা এক পাতা করে তিনটি মাস ধরে (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৬৯) তিন পাতায় সম্পূর্ণ হয়। বিষয়বস্তু ছিল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচ। গল্পটি কমিক্স-এর বই আকারে অগ্রন্থিত। প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি হাঁদাভোঁদার গল্প একপাতার; যা বই আকারে অগ্রন্থিত। এ ছাড়াও হয়েছে তিন পাতার দুর্লভ হাঁদা-ভোঁদা (১৩৬৯ আষাঢ়–ভাদ্র এবং ১৩৭১ ফাল্গুন)। প্রায় ৫০ বছর ধরে চলতে থাকা এই কমিক্সে... হাঁদা-ভোঁদার এখন যে চেহারা দেখি প্রথম দিকে তা অনেকটাই আলাদা ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৫০-এর দশকে হাঁদা ও ভোঁদা নাম দিয়ে অনিয়মিত ভাবে কিছু ছবিতে গল্প প্রকাশিত হয় শুকতারায় যার চরিত্রের চেহারা ছিল সিরিয়াস। চারটি ছবি নিয়ে একপাতার সেই সিরিয়াস হাঁদা ভোঁদার 'ছবি ও কথা'র স্থানে ছিল বোলতার ছবি । নারায়ণ দেবনাথ জানান সেই 'সিরিয়াস' চেহারার হাঁদা ভোঁদার রচয়িতা 'বোলতা' প্রকৃতপক্ষে তখনকার প্রখ্যাত শিল্পী প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশনার কর্ণধার সুবোধচন্দ্র মজুমদারের ভাই ক্ষীরোদবাবুই নারায়ণ দেবনাথকে উৎসাহিত করেন হাঁদা ভোঁদা নাম দিয়ে এই মজার কমিক্‌স তৈরি করতে। শুকতারা পত্রিকার জনপ্রিয়তা এবং গ্রাহক সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নারায়ণ দেবনাথের 'হাঁদা ও ভোঁদা'র হাত ধরে। একসময় হাঁদা ও ভোঁদা পৌঁছে যেত প্রায় দু-লক্ষ পাঠক-পাঠিকার কাছে!

শুঁটকি আর মুটকি (সাদা-কালো) : ১৯৬৪ সালে (১৩৭১) দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় প্রকাশ পায় শুঁটকি আর মুটকি নামে দুই মানিকজোড় ছোটো মেয়ের মজার কীর্তিকলাপ। দুই-তিন বছর অনিয়মিত ভাবে প্রকাশের পর পত্রিকা দপ্তরে করা মেয়েমহলের আপত্তিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

★ **ছত্রপতি শিবাজী (সাদা-কালো)** : ১৯৬৪-৬৫ সালে সাপ্তাহিক আনন্দমেলার পাতায় বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-রচিত এবং নারায়ণ দেবনাথ-অঙ্কিত ছত্রপতি শিবাজী শুরু হয় যার প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায়।

বাঁটুল দি গ্রেট (লাল-কালো) : ১৯৬৫ সালে (১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ) দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত শুকতারা পত্রিকায় গোলাপি রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি; সঙ্গে কালো রঙের টাইট হাফপ্যান্টে সর্বদা খালি পায়ে আত্মপ্রকাশ করে— বাঁটুল দি গ্রেট। যার বুকের ছাতি ৪০ ইঞ্চি আর পা দুটো লিকলিকে সরু। নারায়ণবাবুর ভাষায় তাঁর 'ফেভারিট সন্তান'। দুর্ধর্ষ শক্তিমান বাঁটুলের সঙ্গে থাকে তার দুই বিচ্ছু ভাগনে ভজা ও গজা। পরবর্তীকালে তারা বাঁটুলকে 'দাদা' হিসাবে সম্বোধন করা শুরু করে। অন্যান্য সঙ্গী হিসাবে দেখা গেছে উচ্চ শ্রবণ-ক্ষমতা সম্পন্ন কিশোর 'লম্বকর্ণ', পোষা উট পাখি 'উটো', পোষা কুকুর 'ভেদো' আর বুড়ি পিসিমাকে। এই দু-রঙা (বাইকালার) কমিক্‌সটি শুকতারার দ্বিতীয় পাতায় ঠাঁই পেলেও প্রথম প্রথম বাঁটুলকে নিয়ে তেমন সাড়া জাগেনি।
তারপর ষাটের দশকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বাঁটুলকে কমিক্‌সে যুদ্ধের কাজে লাগানো হল দেবসাহিত্য কুটীরের অন্যতম কর্ণধার ক্ষীরোদবাবুর উৎসাহে। ছবিতে গল্পে দেশপ্রেমিক বলশালী বাঁটুল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশের) শত্রুসেনার প্লেন, প্যাটন ট্যাঙ্ক সব ধ্বংস করতে লাগল। এই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উপর বাঁটুলের জনপ্রিয় গল্পগুলি প্রকাশিত হয় ১৩৭২ সালের কার্তিক, পৌষ, মাঘ এবং ১৩৭৩ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়। সারল্য ও বীরত্বের সংমিশ্রণে বাঁটুলের এই গল্পগুলি তৎকালীন পাঠক সমাজে খুব সাড়া জাগায় এবং বাঁটুলের জনপ্রিয়তার সেই শুরু যা আজও অম্লান। বাঁটুলের প্রথমদিককার এই দুর্লভ গল্পগুলি বই আকারে অগ্রন্থিত। প্রায় ৪৫ বছর ধরে চলতে থাকা বাঁটুলের চেহারাতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে পরিবর্তন। এখন বাঁটুলের কোমর আর পা আরও সরু হয়েছে; বেড়েছে বুকের ছাতি।
নারায়ণবাবু চিরকাল দু-রঙে বাঁটুলের গল্প করে এসেছেন। যদিও এখন বাঁটুলের কমিক্‌স কমপিউটার দিয়ে, চাররঙে সম্পূর্ণ রঙিন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বয়ং নারায়ণবাবু একবারমাত্র সম্পূর্ণ রঙিন (চার রং দিয়ে) বাঁটুল কমিক্‌স আঁকেন দেবসাহিত্য কুটীরের পূজাবার্ষিকী 'পূরবী'তে (১৩৭৯)। এটিও বই আকারে গ্রন্থিত হয়নি।

★ **হীরের টায়রা (সাদা-কালো)** : ১৯৬৫ সালে (অগ্রহায়ণ, ১৩৭২) নারায়ণ দেবনাথ রচিত ও চিত্রিত পার্থ চৌধুরী ও অজিতের পূর্ণদৈর্ঘ্যের গোয়েন্দা কমিক্‌স 'হীরের টায়রা' প্রথমে মাসিক নবকল্লোল পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং পরবর্তীকালে ১৯৭২ সাল নাগাদ ৪৮ পাতার সম্পূর্ণ বই আকারে প্রকাশিত হয়।

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান (সাদা-কালো এবং লাল-কালো) : ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে (১৩৭৬ কার্তিক) 'পত্রভারতী'র প্রকাশনায় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় পটলচাঁদ দি ম্যাজিশিয়ান। মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশের পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। পরবর্তীকালে যা পত্রভারতী-প্রকাশিত 'হরেকরকম' নামক কমিক্‌স সংগ্রহের দ্বিতীয় সংখ্যায় স্থান পায় (১৯৮৪ সালে)।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর প্রায় ১০ বছর পরে পক্ষিরাজ পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৯৭৮/১৩৮৫) অন্য চেহারায় কিন্তু একই নামে দু-রঙের কমিক্‌সে আত্মপ্রকাশ করে এই চরিত্রটি। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

নন্টে আর ফন্টে (সাদা-কালো এবং লাল-কালো) : ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে (১৩৭৬ অগ্রহায়ণ) 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশ পায় দুই দামাল কিশোরের চিত্রকাহিনি— নন্টে আর ফন্টে। প্রথমদিকের গল্পে হাঁদা আর ভোঁদার গল্পের আদলই ছিল সবচেয়ে বেশি। সেই দুই সহপাঠী বন্ধু। পরবর্তীকালে 'স্কুল স্টোরিজ'কে উপাদান হিসাবে নিয়ে বোর্ডিং স্কুলকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তৈরি হয়েছে গল্প। 'পরিবর্তন' নামে এক দারুণ জনপ্রিয় সিনেমার অনুকরণে বিপুলদেহী সুপারিনটেন্ডেন্ট 'পাতিরাম হাতি'কে জুড়ে দেওয়া হয় নন্টে ফন্টের গল্পে। যুক্ত হয় মজার ভিলেন কেল্টু। কমিক্‌সের বই আকারে প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮১।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মজার কমিক্স হিসাবে এটি নারায়ণবাবুর প্রথম বই। এ বইয়ের জনপ্রিয়তায় পর পর প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর হাঁদাভোঁদা, বাঁটুলের সিরিজগুলিকে নিয়ে আলাদা আলাদা বই। গোড়ার দিকে নন্টে আর ফন্টে সাদাকালোতে আঁকা হলেও পরবর্তীকালে তা দুই রঙে (বাইকালারে) প্রকাশিত হয়। এখন অবশ্য কমপিউটারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রঙিন নন্টে ফন্টে প্রকাশিত হয়েছে।

★ **ইন্দ্রজিৎ রায় ও ব্ল্যাক ডায়মন্ড (সাদা-কালো)** : ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে (১৩৭৬ চৈত্র) কিশোর ভারতী পত্রিকার কর্ণধার দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দিলীপ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ও নারায়ণ দেবনাথ-চিত্রিত গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়-এর রহস্যকাহিনির প্রথম অ্যাডভেঞ্চার 'রহস্যময় সেই বাড়িটা' প্রকাশিত হয় কিশোর ভারতী পত্রিকায়। এর অন্যান্য গল্পগুলি হল 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড', 'তুফান মেলের যাত্রী', 'কাছেই মোহনা', 'স্টেশন মুকুটমণিপুর', 'চাঁদনী রাতে', 'সন্ধ্যার মহুয়ামিলন', 'এই কলকাতায়', 'জীবনদীপ'। ১৯৮১ সালে (১৩৮৮ আশ্বিন) অযোধ্যা এনটারপ্রাইজ তিনটি খণ্ডে এই সাদা-কালো কমিক্সগুলি প্রকাশিত করেন। পরবর্তীকালে প্রকাশনা সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়। বহু পাঠকের মতে বাংলায় এটিই সর্বকালের সেরা গোয়েন্দা কমিক্স। যদিও এক্ষেত্রে অঙ্কিত চিত্র নারায়ণবাবুর হলেও গল্প তাঁর নিজের নয়।

রহস্যময় অভিযাত্রী (রঙিন) : ১৯৭২ সালে (১৩৭৯ ফাল্গুন) শুকতারা পত্রিকার প্রচ্ছদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রহস্যময়ী অভিযাত্রী'-ই নারায়ণ দেবনাথের প্রথম রঙিন গোয়েন্দা কমিক্স, যা বই আকারে অগ্রন্থিত।

ইতিহাসে দ্বৈরথ (সাদা-কালো) : ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে (১৩৮১ আশ্বিন) ধারাবাহিকভাবে ছোটো ছোটো গল্প ইতিহাসে দ্বৈরথ নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় মাসিক কিশোর ভারতী পত্রিকায়। পরবর্তীকালে যার মধ্যে একটি গল্প পত্রভারতী-প্রকাশিত 'হরেকরকম' নামক কমিক্স সংগ্রহে স্থান পায় (১৯৮৩ সালে)।

কৌশিক রায় (রঙিন) : ১৯৭৫ সালে (১৩৮২ ফাল্গুন) শুকতারার প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয় গোয়েন্দা গল্পের ভক্ত নারায়ণ দেবনাথ সৃষ্ট কৌশিক রায়ের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার চিত্রোপন্যাস 'সর্পরাজের দ্বীপে'। পরবর্তীকালে শুকতারার প্রচ্ছদেই প্রকাশ পায় কৌশিক রায়ের 'ড্রাগনের থাবা' (১৩৮৫ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্করের মুখোমুখি' (১৩৮৭ ফাল্গুন), 'অজানা দ্বীপের বিভীষিকা' (১৩৯০ ফাল্গুন), 'মৃত্যুদূতের কালোছায়া' (১৩৯২ ফাল্গুন), 'ভয়ঙ্কর অভিযান' (১৩৯৪ ফাল্গুন), 'স্বর্ণখনির অন্তরালে' (১৩৯৯ আষাঢ়) ইত্যাদি।
কৌশিক রায় ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের ক্ষুরধার গুপ্তচর (সিক্রেট এজেন্ট) যে মার্শাল আর্ট ও বক্সিং-এ সিদ্ধহস্ত। কৌশিকের ডান হাতটি ইস্পাতের যা থেকে গুলি, বেহুঁশ করা গ্যাস, লেসার রশ্মি বেরোয়। ইস্পাতের হাতের নখটি ছুরির মতো; প্রয়োজনে যা ছোঁড়াও যায়। আর গোপন ট্রান্সমিটার লাগানো আছে ওই ইস্পাতের হাতে।
এই রহস্য চিত্রকাহিনির ফ্রেমের ক্লোজ আপ, লং ভিশন থেকে আরম্ভ করে সংলাপের বিভাজনে সিনেমাটিক চরিত্র নিয়ে এসেছেন নারায়ণ দেবনাথ। ছবিগুলির অ্যাকশানধর্মিতা বা রিয়ালিস্টিক নেচার বিশ্বমানের। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

বাহাদুর বেড়াল (রঙিন) : ১৯৮২ সালে (১৩৮৯ ফাল্গুন) শুকতারায় প্রচ্ছদে প্রকাশ পায় অন্য মাত্রার রঙিন কমিক্স বাহাদুর বেড়াল। ১৯৮২ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানে লেবার স্ট্রাইকে বেশ-কিছুদিন শুকতারা বন্ধ থাকে। সেই সময় শুকতারার মলাটে চলছিল কৌশিক রায়ের কাহিনি 'ভয়ঙ্করের মুখোমুখি'। তখন পত্রিকা-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে দিল্লি থেকে পত্রিকা এবং মলাট ছাপিয়ে আনা হয়। সেই সময় কৌশিকের কাহিনির মাঝপথে শুরু হয় 'বাহাদুর বেড়াল'। বছরখানেক পর লক-আউট উঠে গেলে পত্রিকার মলাটে আবার ফিরে এল কৌশিকের কাহিনি এবং বাহাদুর বেড়াল স্থান পেল শুকতারার ভেতরের পাতায়। এটি বই আকারে অগ্রন্থিত।

ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু (সাদা-কালো) : ১৯৮৩ সালে (১৩৯০) সহসম্পাদিকা বেবী মজুমদার ও শুভ্রা রায়ের উদ্যোগে দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত 'ছোটোদের আসর' পত্রিকাতে প্রকাশ পায় ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু। এক-দেড় বছর পর পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে ওই দুই সহসম্পাদিকা একই কমিক্স ১৯৮৪ সালে 'গোল্ডেন কমিক্স' থেকে প্রথম বই আকারে প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য পত্রিকা যথা 'সুখী গৃহকোণ' (জুন ২০০০), 'সোনার বাংলা' এবং 'সাদা মেঘের ভেলা' (২০০০ সাল), 'তথ্যকেন্দ্র' (২০০২ সাল), 'সোনালী উৎসব' প্রভৃতি গল্প সংকলন বইতে ডানপিটে খাঁদু প্রকাশিত হয়। ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাত্র'জ পাবলিকেশন থেকে বই আকারে দ্বিতীয়বার প্রকাশ। যদিও পাত্র'জ-এর এই বইতে দেওয়া সব ছবির গল্প নারায়ণ দেবনাথের নয় এমন বক্তব্য স্বয়ং নারায়ণবাবুর। তাঁর একনিষ্ঠ পাঠকমাত্রই গল্পগুলির হাতের লেখা দেখে সহজেই তা চিনে নিতে পারবেন।

পেটুক মাস্টার বটুকলাল (সাদা-কালো) : ১৯৮৪ সালে পাক্ষিক কিশোর মন পত্রিকার প্রথম বর্ষে প্রকাশিত পেটুক মাস্টার বটুকলাল। ধারাবাহিক চরিত্র হিসাবে এটিই নারায়ণবাবুর সর্বশেষ চরিত্র।

★ **মহাকাশের আজব দেশে (রঙিন)** : ১৯৯৪ সালে (বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৪০১) শুকতারার প্রচ্ছদ কমিক্‌স হিসাবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।

জাতকের গল্প (রঙিন) : ১৯৯৪ সালে (১৪০১, পৌষ) ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে ধারাবাহিক কমিক্‌স শুকতারার প্রচ্ছদে প্রকাশিত যা বই আকারে অগ্রন্থিত।

এছাড়াও তিনি দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত বিভিন্ন পূজাবার্ষিকীতে ২০ বছরের বেশি সময় ধরে (১৩৬৮ থেকে ১৩৯০ সাল পর্যন্ত) প্রায় ২৮টি ভিন্নস্বাদের চিত্রকাহিনি আর অসংখ্য 'পাদপূরণ' (কার্টুন স্ট্রিপ) তৈরি করেছেন। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত 'ছবিতে অ্যাডভেঞ্চার' (১৯৭২) এবং 'রোমাঞ্চকর চিত্রকাহিনী' (১৯৭৩) নামক কমিক্‌স সংগ্রহে মোট ৯টি এমন চিত্রকাহিনি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। তৈরি করেছেন 'কাটুস-কুটুস' ও 'লালুভুলু' নামের মজার কমিক্‌সও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০১ সালে বাংলাদেশের 'শিশুমহল' হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট ও নন্টে-ফন্টে কমিক্‌স প্রকাশের জন্যে নারায়ণবাবুর অনুমতি গ্রহণ করেছেন।
বয়সের ভারে আর প্রতি মাসের চার পাঁচটি নিয়মিত কমিক্‌স জোগান দেওয়ার চাপে ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে গল্পের ইলাস্ট্রেশন এবং নতুন কমিক্‌স চরিত্র সৃষ্টির কাজ।

তথ্যসহায়তা : নারায়ণ দেবনাথ

গবেষণা ও রচনা : শান্তনু ঘোষ

★ **উল্লিখিত বিষয়গুলি পরবর্তী খণ্ডে থাকবে।**

শ্রীনারায়ণ দেবনাথ এমন একজন মানুষ যিনি সারাজীবন ধরে ছোটোদের জন্য চিন্তা করলেন, ছবি আঁকলেন, সংলাপ লিখলেন আর তাদের জন্য মজাদার কমিক্স তৈরি করলেন। গত যাট বছর ধরে, অর্থাৎ ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজারের অধিক কমিক্স সৃষ্টি করেছেন, কেবলমাত্র ছোটোদের খুশির জন্য, তিনি ছাড়া এমন মানুষ পৃথিবীতে আর কে আছেন!

ছোটোদের হাতে সেই সব মনকাড়া ছবির পশরাকে তুলে দেবার জন্য আমরা সাজিয়েছি এই 'সমগ্র'কে। শ্রীনারায়ণ দেবনাথের সেই পুরোনো দিনের বাঁটুল, হাঁদা ভোঁদা, শুঁটকি মুটকি, বাহাদুর বেড়াল, পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান, গুপ্তচর-গোয়েন্দা কৌশিক রায় ইত্যাদি আরও অ-নে-ক মজার গল্প, রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি, পাদপূরণ (কার্টুন স্ট্রিপ) যা আগে গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। এ ছাড়াও আছে অন্যান্য অলংকরণের কিছু দুর্লভ নিদর্শনও। এবং এই প্রথম বার তাঁর সমগ্র কমিক্সের প্রকাশকালানুযায়ী তথ্যপঞ্জি দেওয়া হল।

তাই ৫০০ পাতার অধিক অগ্রন্থিত সিরিয়াস ও মজার কমিক্সসমৃদ্ধ এই বইটি ছোটোদের কাছে অতি আদরণীয়। আর বড়োদের কাছে নস্টালজিক প্রাপ্তি।